নিরীক্ষা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী

২১৬তম সংখ্যা

নিরীক্ষা

২১৬তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
সুভাষ চন্দ্র রায়
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৮

বিনোদন জগৎ নিয়ে যে সাংবাদিকতা, তা-ই বিনোদন সাংবাদিকতা। তবে বিনোদন সাংবাদিকতা না সংস্কৃতি সাংবাদিকতা এ ধরনের একটি বিতর্ক চালু আছে একাডেমিক মহলে। আমাদের দেশে বিনোদন সাংবাদিকতার আওতায় রয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত, চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়। তবে মূলত বিনোদন সাংবাদিকতার সিংহভাগজুড়েই ছিল চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক চিত্রালী, পূর্বাণী, সিনেমা প্রভৃতি বিনোদন পত্রিকা একসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানেও বেশ কিছু বিনোদন ম্যাগাজিন রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সংবাদপত্রগুলোয় এ সংক্রান্ত পাতা। বর্তমান সংখ্যাটিতে বিনোদন সাংবাদিকতার তাত্ত্বিক দিক থেকে শুরু করে বিনোদনের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন লেখা রয়েছে, তেমনি রয়েছে কয়েকজন খ্যাতনামা বিনোদন সাংবাদিক ও গবেষকের সাক্ষাৎকার। তাছাড়া নিয়মিত সাক্ষাৎকার পর্বে এবার রয়েছে প্রবীণ সাংবাদিক রাহাত খানের একটি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার। আশা করি, সংখ্যাটি বিনোদন সাংবাদিকদের কাজে লাগবে। সাধারণ পাঠকরাও এ সংখ্যাটি পাঠ করে জানতে পারবেন বিনোদন মাধ্যম ও বিনোদন সাংবাদিকতা সম্বন্ধে নানান তথ্য। পাঠকদের ভালো লাগলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সূ|চি|প|ত্র

বিনোদন ও সাংবাদিকতা মিনহাজ উদ্দীন	৫	
বিনোদন সাংবাদিকতা: অতীত আর বর্তমানের আয়নায় শামীমা চৌধুরী	৯	
প্রসঙ্গ: বিনোদন ও বিনোদন সাংবাদিকতা ইরানী বিশ্বাস	১২	
বিনোদন সাংবাদিকতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রাধান্য চিন্ময় মুৎসুদ্দী	১৪	
ক্যামেরায় বিনোদন সাংবাদিকতা খালেদ সরকার	১৮	
জহির রায়হান অম্লান সূর্যের বিচ্ছুরিত মন্তাজ অনুপম হায়াৎ	২০	
বিনোদন সাংবাদিকতায় সাক্ষাৎকার ও খবরের উৎস তৌহিদা শিরোপা	২৪	
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অতীত ও বর্তমান কমল চৌধুরী	২৭	
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন মো. আবদুল রকিব খান	৩০	
বিনোদন: গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপনা রীতা ভৌমিক	৩৩	
পাপারাজ্জি বিনোদন সাংবাদিকতা ও নৈতিকতা শুভ কর্মকার	৩৫	
চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার দিকপাল এস এম পারভেজ মাহফুজ সিদ্দিকী	৩৮	
পত্রিকার পাতায় মঞ্চনাটক বোরহান বিশ্বাস	৪১	
যতদিন পৃথিবীতে শোষণ-লুণ্ঠন থাকবে ততদিন গণসংগীত প্রাসঙ্গিক হয়েই থাকবে ..... ফকির আলমগীর	৪৪	
বাংলা গানের মূলধারা ড. শিল্পী ভদ্র দীপা	৪৭	
এখনকার সময়ে সাংবাদিকরা আমাদের চেয়ে অনেক সাহসী রিপোর্ট করছে ..... রাহাত খান	৫৪	
বাংলাদেশে বিনোদন সাংবাদিকদের সংগঠন অদ্বৈত মারুত	৫৮	
দুই দিকপালের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা জাহিদা পারভেজ ছন্দা	৬১	
গণমাধ্যম সংবাদ	৬৫	
পিআইবি সংবাদ	৭০	

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২১৬তম সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

বিশ্ব সভ্যতায় সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্রে বিনোদনের বিষয়টি প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য সান'-এ। ওই সময় সান পত্রিকায় কাজ করতেন বিখ্যাত সাংবাদিক জেমস আর্থার লক। সেসময় লক পত্রিকায় একটি সায়েন্স ফিকশন গল্প ধারাবাহিক লিখতে শুরু করেন। যার শিরোনাম ছিল: 'Great Moon Hoax'. লক চাঁদ ও চাঁদের দেশ নিয়ে 'দ্য সান'-এ ছয়টি কল্পকাহিনীভিত্তিক গল্প লেখেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ৬

একটা সময় ছিল যখন মানুষের অবসর কাটত বিনোদন ম্যাগাজিন পড়ে। তখন চ্যানেল বলতে একটাই ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশন। পরবর্তী সময়ে সেই টেলিভিশনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিশোর্ধ্ব। সেসময় চিত্রজগৎ অর্থাৎ বিনোদনের খবর ছাপা হতো হাতেগোনা কয়েকটা ম্যাগাজিনে। তখনো দৈনিক পত্রিকায় কোনো বিনোদনের খবর ছাপা হতো না।

দেখুন- পৃষ্ঠা ১২

১৯৯২ সালে গোটা ব্রিটেনের পাশাপাশি সেলিব্রেটি দুনিয়া আলোড়িত হয়েছিল প্রিন্সেস ডায়নার ওপর প্রকাশিত এক বই নিয়ে। ব্রিটিশ সাংবাদিক অ্যান্ড্রু মর্টন 'ডায়না: হার ট্রু স্টোরি' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যা কাঁপিয়ে দেয় পুরো ব্রিটেনকে। প্রিন্সেস ডায়নার দাম্পত্য বিরহ, প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কথা প্রকাশিত হয় বইয়ে। বই প্রকাশের পরের দিন ব্রিটিশ রাজপরিবারের কেনসিংটন প্যালেস বইটির সব তথ্যকে অস্বীকার করে।

দেখুন- পৃষ্ঠা ২৫

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উৎসকাল ৮ম থেকে ১২ শতাব্দী। এ সময়েই চর্যাগীতিকা রচিত হয়েছিল। তবে তারপরেও ২০০-৩০০ বছর গোপনে চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল। শশীভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে এ ধরনের শতাধিক পদ উদ্ধার করেন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'নব চর্যাপদ' নামে তা সংকলিত ও প্রকাশিত হয়।

দেখুন- পৃষ্ঠা ৪৮

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র প্রকাশনা

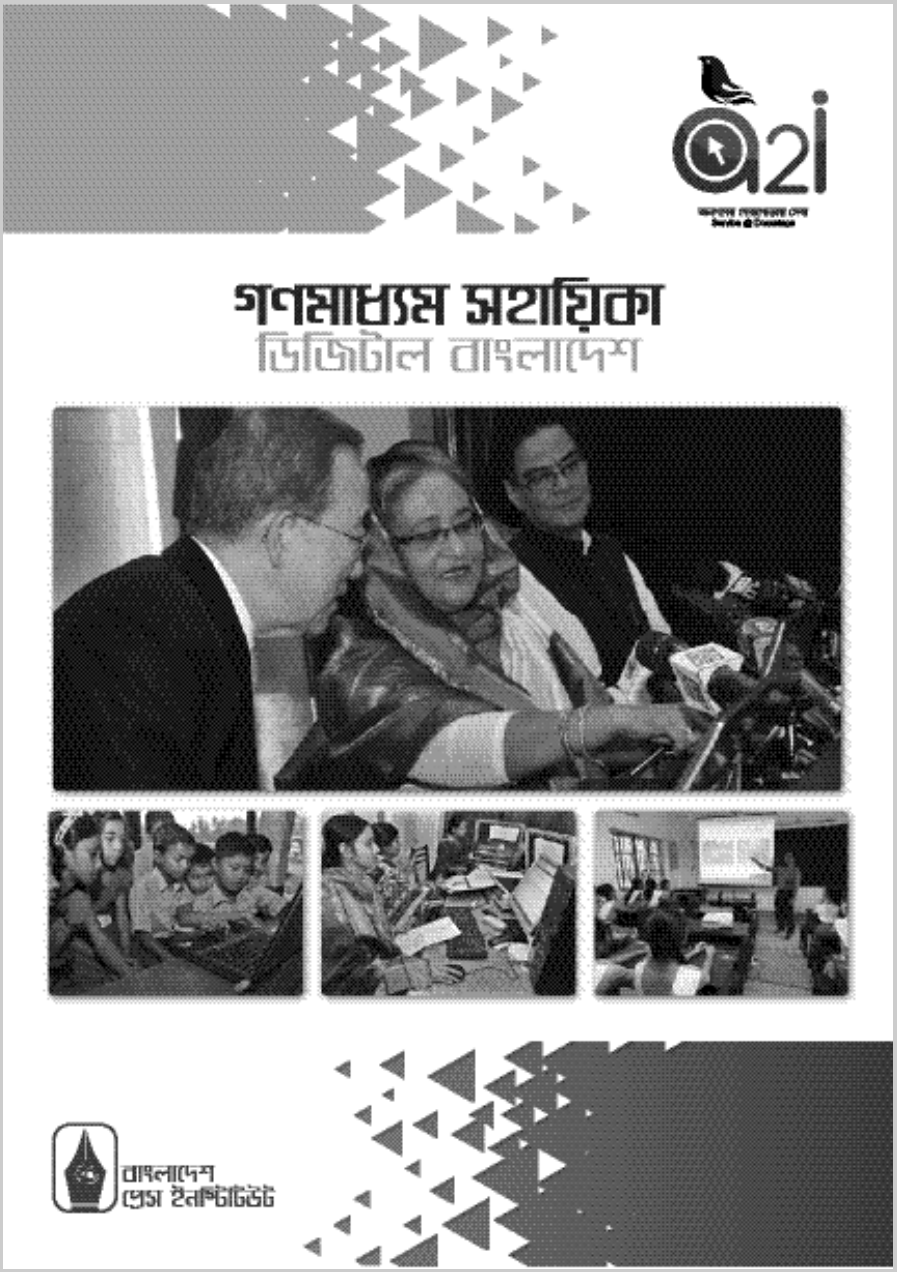

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বিনোদন ও সাংবাদিকতা

মিনহাজ উদ্দীন

সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বহুমুখী। অনেক তাত্ত্বিক এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তত চারটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। পাঠককে তথ্য জানানো (To inform), শিক্ষিত করা (To educate), প্রভাবিত করা (To pursue) ও বিনোদিত করা (To entertain). এ চারটি লক্ষ্য সামনে রেখেই মূলত সাংবাদিকতার বিকাশ। প্রযুক্তি বিকাশের ফলে বর্তমান সময়ে সাংবাদিকতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। তবে আজও ওই চারটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বজায় আছে। আজও সংবাদের অন্যতম লক্ষ্য পাঠক ও দর্শক-শ্রোতাকে বিনোদিত করা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে নানাভাবে সাংবাদিকতা বিকশিত হয়েছে স্বমহিমায়।

সাংবাদিকতার মূল উপাদান তথ্য (Information)। সাধারণত তথ্য খুবই নীরস প্রকৃতির। তথ্য কাঠখোট্টা। তবে মনে রাখা ভালো, তথ্যের উপাদান বা উৎস সব সময় নীরস প্রকৃতির না-ও হতে পারে। তথ্যেও মানুষ বিনোদন পেতে পারে। তথ্যের উৎস হতে পারে বিনোদনজগৎ। তথ্যের মাধ্যমে মানুষের চিত্ত প্রশান্ত হতে পারে। তথ্যের মাধ্যমেই মানুষ বিনোদিত হতে পারে।

বিনোদনজগৎ (Entertainment World) নিয়ে যে সাংবাদিকতা, তা-ই বিনোদন সাংবাদিকতা। বিনোদন সাংবাদিকতা এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের কিছু নয়। সনাতন সাংবাদিকতার নিয়মকানুন মেনেই পরিচালিত হয় বিনোদন সাংবাদিকতা

বিনোদন সাংবাদিকতা

সহজ করে বলা যায়, বিনোদনজগৎ (Entertainment World) নিয়ে যে সাংবাদিকতা, তা-ই বিনোদন সাংবাদিকতা। বিনোদন সাংবাদিকতা এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের কিছু নয়। সনাতন সাংবাদিকতার নিয়মকানুন মেনেই পরিচালিত হয় বিনোদন সাংবাদিকতা। অন্যান্য ক্ষেত্রে

যেমন– ষড়-ক পদ্ধতি মেনে সংবাদ তৈরি করা হয়, বিনোদন সাংবাদিকতাও ঠিক তাই। তবে মনে রাখতে হবে, বিনোদন সাংবাদিকতায় শুধু সময় উপযোগিতায় (Immediacy) কিছু পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ সংবাদে সময় উপযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত যে তথ্যের সময় উপযোগিতা বেশি থাকে, তা মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। তবে বিনোদন সাংবাদিকতায় অনেক ক্ষেত্রে সময় উপযোগিতা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সময় উপযোগিতা ছাড়াও সংবাদ হয়। ধরা যাক, কোনো এক শিল্পীর একটি গান নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এ প্রতিবেদন আজ প্রকাশিত হতে পারে আবার কালও হতে পারে। অনেক সময় এক্ষেত্রে সময় উপযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। তবে ঘটনার কোনো ক্ষেত্রে এ রকম অপেক্ষা বা পরে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ নেই। যেমন– চিত্রনায়ক শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসের বিয়ে ও সন্তানের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর এ সংক্রান্ত সংবাদ সংবাদপত্রে পরদিনই প্রকাশ বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এ ঘটনায় পাঠক-শ্রোতাদের আগ্রহ আছে। এক্ষেত্রে বিলম্ব মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। (Wareen, 1959).

বিনোদন সাংবাদিকতা: কল্পকথা-কার্টুন-চলচ্চিত্র

বিশ্ব সভ্যতায় সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্রে বিনোদনের বিষয়টি প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য সান'-এ। ওই সময় সান পত্রিকায় কাজ করতেন বিখ্যাত সাংবাদিক জেমস আর্থার লক। সে সময় লক পত্রিকায় একটি সাইন্স ফিকশন গল্প ধারাবাহিক লিখতে শুরু করেন। যার শিরোনাম ছিল– 'Great Moon Hoax'. লক চাঁদ ও চাঁদের দেশ নিয়ে 'দ্য সান'-এ ছয়টি কল্পকাহিনীভিত্তিক গল্প লেখেন। এতে সান পত্রিকার কাটতি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দ্য সান একটি লাভজনক প্রভাবশালী পত্রিকায় পরিণত হয়। এতে ওই সময়ের সম্পাদক খুবই খুশি হন এবং বিনোদন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পত্রিকায় আরও যুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (Fraser,1961)।

এরপর সাংবাদিকতায় বিনোদন বা আনন্দদায়ক বিষয়গুলোর সংযুক্তি হয় কার্টুনের মাধ্যমে। শুরুর দিকে নিউইয়র্ক জার্নালে (প্রকাশকাল ১৯৩৬-১৯৬৬) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিল দ্য কাটজিনজামার কিডস (The Katzenjammer Kids). এ চরিত্রের রূপায়ক ছিলেন রুডফ ডিকস Rudolph Dirks). দীর্ঘদিন ধরে রুডফ ডিকস তার কার্টুন চরিত্রগুলোর প্রতি আমেরিকানদের আগ্রহ ধরে রেখেছিলেন। কার্টুন চরিত্রের সঙ্গে বেলুনের নকশায় বক্তব্য প্রচারিত হতো, যা আমেরিকানদের খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থায়ীভাবে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে অন্যান্য পত্রিকায় এ ধরনের কার্টুন প্রকাশিত হতে থাকে। কার্টুনের এ ধারা আজও অব্যাহত আছে। তা এখনো বেশ জনপ্রিয়ও বটে।

বিশ্বে বিনোদন সাংবাদিকতার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল মার্কিন সাময়িকী 'দ্য হলিউড রিপোর্টার' (The Hollywood Reporter বা THR)। পত্রিকাটি যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা শুরু করে ১৯৩০ সালে। এর মূল লক্ষ্য ছিল হলিউডের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র। মোদ্দাকথা, বিনোদননির্ভর সবকিছুই ছিল এ পত্রিকার উপাদান। পত্রিকাটি প্রকাশ হতো লস এঞ্জেলস থেকে। পত্রিকাটির মালিকানা ছিল হলিউড রিপোর্টার বিলবোর্ড মিডিয়া গ্রুপ। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ছিলেন ইউলিয়াম আর বিলি উইকারসন। এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম চিত্রজগৎ সম্পর্কিত পত্রিকা, যার প্রভাব বা আদলেই ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল স্টারডাস্ট ও আনন্দলোকের মতো সিনে ম্যাগাজিন।

ইনফোটেইনমেন্ট ও বিনোদন সাংবাদিকতা

Information শব্দের শাব্দিক অর্থ তথ্য। Entertainment অর্থ বিনোদন। এ দুই শব্দ মিলেই তৈরি হয়েছে Infotainment. ইনফোটেইনমেন্টের ব্যাখ্যায় Encyclopedia Britannica বলছে, 'Infotainment, television program that presents information (as news) in a manner intended to be entertaining. Infotainment came about through the blurring of the line between information and entertainment in news and current affairs programming, whether in the selection of news stories (e.g. more emphasis on celebrity gossip, crime stories and human-interest pieces) or in their presentation (stylistically, through flashy graphics, fast-paced editing, music and sound effects, as well as in terms of tone and approach, through the use sensationalism or satire).

মোদ্দাকথা হলো, টেলিভিশনে তথ্য যখন নাটকীয় ঢঙে দর্শক-শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে দেওয়া হয়, তখনই চলে আসে ইনফোটেইনমেন্ট প্রত্যয়টি। Infotainment-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন Doug Underwood তার Reporting and the Push for Market-oriented Journalism গ্রন্থে। তাতে তিনি বলেছেন, 'the tabloid techniques adopted by ratings-fixated local television stations and the network television newsmagazines… the embrace of splashy visual techniques and news-you-can-use items by newspapers desperate to stem a four decade long readership slide… the explosion of salacious copy and scandal coverage in traditional media outlets and on the Internet… the mixing of entertainment, crime, and gossip with the news by television organizations trying to hold onto their audience; and the 'synergy' of relentlessly expanding media conglomerates eager to treat the news as a 'product' to be recast for the publicity, promotional, and marketing purposes of their integrated media holdings. (Underwood 2001, 100)।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, ট্যাবলয়েড পত্রিকার আদলে যখন খবর প্রচার করা হয়, তা-ই ইনফোটেইনমেন্ট। তবে ইনফোটেইনমেন্ট কোনো অবস্থাতেই বিনোদন সাংবাদিকতা নয়। বিনোদন সাংবাদিকতামূলক বিনোদনজগতের খবর নিয়ে, যার মূল উপজীব্য চলচ্চিত্র, নাটক, গান, সিনেমা পর্যালোচনাসহ আরও অনেক কিছু।

মনে রাখা ভালো, সাংবাদিকতা মানেই সবসময় গুরুগম্ভীর, সিরিয়াস সব বিষয় নয়। সাংবাদ বা সাংবাদিকতায়ও আনন্দ আছে। আছে বিনোদন উপাদান। আর যেহেতু বিনোদনপ্রত্যাশী মানুষ এসব বিষয়ে সবসময়ই আনন্দ খোঁজেন, তাই প্রিন্ট মিডিয়াগুলোও পাঠকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখেন। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রকাশিত মূলধারার সব সংবাদপত্রেই আলাদা বিনোদন পাতা আছে। আবার সপ্তাহান্তে প্রকাশিত হয় আলাদা বিশেষ ক্রোড়পত্র। যেগুলোর মূল উপাদান বিনোদনজগৎ। এছাড়া টেলিভিশনগুলোয় বিনোদনজগতের সংবাদ নিয়ে আলাদা বুলেটিন বা অনুষ্ঠান চালু রয়েছে। ৭১ টিভি, যমুনা টেলিভিশন, সময় টিভি, নিউজ টোয়েন্টিফোর, এটিএন নিউজ, নিউজ টোয়েন্টিফোর– সব চ্যানেলই এ ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে। যেগুলো প্রকৃতপক্ষেই বিনোদনমূলক সাংবাতিকতা। কোনো অবস্থাতেই ইনফোটেইনমেন্ট নয়।

বিনোদন সংক্রান্ত সংবাদের আওতা

১. চলচ্চিত্র
২. নাটক
৩. মঞ্চনাটক
৪. সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
৫. সংগীত (রবীন্দ্র-নজরুলসংগীত, লোকগীতি, আধুনিক বিভিন্ন ধারার সংগীত)
৬. যন্ত্রসংগীত
৭. সংগীত উৎসব বা আয়োজন (ফোক ফেস্ট, ক্লাসিক্যাল সংগীত উৎসব, লোকগীতি উৎসব ও অন্যান্য)
৮. চলচ্চিত্র সমালোচনা
৯. চলচ্চিত্র পর্যালোচনা (রিভিউ)
১০. তারকা বা বিশেষ ব্যক্তিত্বদের জীবন

সাপ্তাহিক চিত্রালী: বিনোদন সাংবাদিকতার পথিকৃৎ

বাংলাদেশের বিনোদন সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বলা যায় চিত্রালীকে। সাপ্তাহিক এই পত্রিকা একসময় ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। দীর্ঘকাল পত্রিকাটি টিকে ছিল স্বমহিমায়। পত্রিকাটির যাত্রা শুরু ১৯৫২ সালে। এর প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় হেলাল গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স থেকে। পরে পত্রিকাটির মালিকানা চলে যায় সেই সময়ের প্রতাপশালী 'অবজারভার হাউস'-এর তত্ত্বাবধায়নে। এ হাউসের মালিকানা

ছিল হামিদুল হক চৌধুরীর। হামিদুল হক চৌধুরী একসময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তার মালিকানায় প্রকাশিত হতো দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার, চিত্রালী ও পল্লীবার্তা নামের পত্রিকা। হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে কুখ্যাতি অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দেশে-বিদেশে ঘুরে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করে বেড়ান।

চিত্রালী পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো শুক্রবার। খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক এ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রিকায়ই কাজ করতেন শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী। দেশের পত্রিকার ইতিহাসে প্রথমবার এ পত্রিকায়ই পাঠক-পাঠিকাদের সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যার নাম ছিল 'চিপাচস'। চিত্রালীর প্রতিষ্ঠাকালীন অফিস ছিল পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায়, যা একসময় ভিক্টোরিয়াপার্ক নামে পরিচিত ছিল। প্রথম থেকেই এ পত্রিকার আধেয় ছিল চলচ্চিত্র, শিল্প-সংস্কৃতি। তবে পরের দিকে পত্রিকাটিতে গল্প প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। ১৯৬২ সালে চিত্রালীতে গল্প প্রকাশ শুরু হয়।

সাপ্তাহিক চিত্রালী, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

কেমন ছিল চিত্রালীর উপাদান। তা জানতে চোখ মেলানো যেতে পারে ১৯৭৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির চিত্রালী সংখ্যার দিকে। ওই সপ্তাহে চিত্রালীর প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল চিত্রনায়িকা শাবানাকে নিয়ে। পত্রিকার প্রথম পাতায়ই ছাপা হয় নায়িকা শাবানার বিশাল ছবি। অন্যান্য খবরের মধ্যে ছিল 'বঙ্গবন্ধুর আশ্বাস: পুরনো ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা অমূলক', 'বিদেশে বাংলাদেশী ছবির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে', 'জহির রায়হানের স্মৃতির ওপর মাকড়সার জাল', 'ববিতা দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন' এই শিরোনামের সংবাদগুলো।

'বঙ্গবন্ধুর আশ্বাস: পুরনো ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা অমূলক' প্রধান এ শিরোনামের খবরে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রীর দুস্থ সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে ছয়টি ভারতীয় ছবি প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত হয়েছে সে কয়েকটি ছবি ছাড়া সাবেক পাকিস্তানি আমলে আমদানীকৃত অন্যান্য ভারতীয় ছবিগুলোর প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আশঙ্কা অমূলক বলে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আশ্বাস দিয়েছেন। উপরোক্ত তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জে একটি ভারতীয় ছবি মুক্তি পাওয়ার পর অতীতে আমদানীকৃত সকল ভারতীয় ছবি অবাধ প্রদর্শনী শুরু হতে পারে বলে চিত্র নির্মাতা ও কলাকুশলীর মনে আশঙ্কা দেখা দেয়। এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করার জন্য গত সোমবার সকালে চিত্র নির্মাতা শিল্পী ও কলাকুশলীদের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সাথে ঘরোয়া আলোচনায় বঙ্গবন্ধু উপরোক্ত আশ্বাস প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন দেশের চলচ্চিত্রের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছুই হতে দেওয়া হবে না।....'

'জহির রায়হানের স্মৃতির ওপর মাকড়সার জাল' শীর্ষক শিরোনামের সংবাদে বলা হয়, 'জহির রায়হানের স্মৃতির ওপর মাকড়সার জাল, জহির রায়হানের স্মৃতির উপর এক রাজ্যের ধূলো। অবশেষে এই ইনট্রো হয়তো অনেককেই চমকে দেবে। কিন্তু ব্যাপারটি মিথ্যা নয়। অত্যন্ত দুঃখজনক একটি সত্য। মাকড়সার জাল আর ধূলোর আস্তরনে ঢাকা পড়ে ধাঁধা ভাগ্য নিয়ে জহির রায়হান এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি যদি কখনও এফডিসি'র দুই নম্বর ফ্লোরে যান তাহলে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন জহির রায়হানের এই ভাগ্যকে। দু'নম্বর ফ্লোরের উত্তর পূর্বে টাঙ্গানো যীশুখ্রিষ্ট, বুদ্ধদেব ও অযত্নে রেখে ফেলা আরও কতগুলো স্মৃতি জীবনের সবশেষ এবং অসমাপ্ত ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট' এর।'

১৯৭৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির চিত্রালী সংখ্যায় অন্যান্য পাতায়ও জহির রায়হানকে নিয়ে বেশিকিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। যেগুলোর শিরোনাম ছিল অনেকটা এ রকম– 'কালের ভেলায় এসো লক্ষিন্দর', 'জহির রায়হান ও কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবনা', 'বঙ্গবন্ধু জহির রায়হান সম্পর্কে যা বললেন', 'শুভ্র পাতার একটি কালো অক্ষর জহির রায়হান', 'রাজ্জাক বললেন আমরা এতিম হয়ে গেছি', 'জহির রায়হানের দ্বিতীয় মৃতুবার্ষিকী উদযাপিত', 'এফডিসিতে জহির রায়হান স্মৃতি দিবস পালিত', 'জহির রায়হানের অনেক ছবি তৃতীয় শ্রেণীর' ইত্যাদি। আর ওই দিন চিত্রালীতে সম্পাদকীয় (সম্পাদকের দফতর থেকে শিরোনামে) ছাপা হয় 'একদা জহির রায়হান' শিরোনামের বিশাল সম্পাদকীয়।

চিত্রালীর একদিনের আধেয় বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ওই সময়ে এটা ছিল অগ্রসর একটি পত্রিকা। চিত্রালীতে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত প্রায় সব সংবাদই থাকত। সঙ্গে পাওয়া যেত জাতীয় পর্যায়ের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সব খবরাখবর। এছাড়া চিত্রালীর ছবি ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। কে চিত্রালীর প্রচ্ছদ হলেন, তা

> *বিশ্ব সভ্যতায় সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্রে বিনোদনের বিষয়টি প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য সান'-এ। ওই সময় সান পত্রিকায় কাজ করতেন বিখ্যাত সাংবাদিক জেমস আর্থার লক। সে সময় লক পত্রিকায় একটি সাইন্স ফিকশন গল্প ধারাবাহিক লিখতে শুরু করেন। যার শিরোনাম ছিল– 'Great Moon Hoax'. লক চাঁদ ও চাঁদের দেশ নিয়ে 'দ্য সান'-এ ছয়টি কল্পকাহিনীভিত্তিক গল্প লেখেন। এতে সান পত্রিকার কাটতি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়*

নিয়ে চলত ব্যাপক আলোচনা, জল্পনাকল্পনা। এককথায় বলা যায়, চিত্রালী ছিল সেই সময়ের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত খবরাখবরে প্রধানতম, আদর্শ মাধ্যম।

পাপারাজ্জি ও বিনোদন সাংবাদিকতা

বিনোদন সাংবাদিকতা বা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড নিয়ে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পাপারাজ্জি শব্দটি। ১৯৯৭ সালের ৩১শে আগস্টের পর এ ধরনের ফটো সাংবাদিকতা নিয়ে বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়। ১৯৯৭ সালের ওই দিন প্যারিসের একটি টানেলে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন ব্রিটিশ রাজবধূ প্রিন্সেস ডায়না। এ মৃত্যু নিয়ে শুরু হয় নানা গুঞ্জন। সামনে চলে আসে পাপারাজ্জিরা। প্রিন্সেস ডায়না ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে ফটোগ্রাফড নারী। বিয়ে থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ক্যামেরার লেন্স তাকে খুঁজেছে। ব্রিটিশ পত্রিকা মিরর, মেইল, সানসহ অন্য বড় বড় সাময়িকী দিনের পর দিন ছেপে গেছে ডায়নার প্রচুর গোপন ছবি। যাতে বিরক্ত ডায়না একবার চিৎকার করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার জীবনকে নরকে পরিণত করেছ।' ডায়ানার মৃত্যুর পর তার ভাই চার্লস স্পেনসার বলেছিলেন 'প্রিন্সেস ডায়না ছিলেন আধুনিক যুগে ফটো সাংবাদিকদের সবচেয়ে পছন্দের শিকার।' ডায়ানার মৃত্যুর জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী, তা নিয়ে বিশ্বখ্যাত জরিপ সংস্থা গেলাপ (Gallup poll) একটি জরিপ করেছিল। যাতে ৪৩ শতাংশ মানুষ নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছিলেন এ মৃত্যুর জন্য দায়ী চিত্রজগতের ফটো সাংবাদিকরা। ওই ঘটনার পর বিশ্বে পাপারাজ্জি সাংবাদিকতার প্রবণতা বেশ কমে গেছে। তবে তা শেষ হয়নি।

মূলত পাপারাজ্জি হলো স্বাধীন আলোকচিত্রী, যারা বিখ্যাত ব্যক্তি বিশেষ করে চলচ্চিত্রাভিনেতা বা তারকা, রাজনীতিবিদদের মতো নামকরা

ব্যক্তির ছবি তুলে সেগুলো বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন– ট্যাবলয়েড, সেনসেশনালিজম বা গসিপ ম্যাগাজিনে প্রকাশ করে থাকেন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তারকাখ্যাতিসম্পন্নদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের আলোকচিত্র তাদের অনিচ্ছায় অগোচরে তুলে সেসব আলোকচিত্র গণমাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে প্রকাশ করা একশ্রেণির পেশাদার স্বাধীন আলোকচিত্রীকেই পাপারাজ্জি নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন– সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের জনপ্রিয় অভিনেতা শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসকে নিয়ে যদি গোপনীয় বা ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটানোর ছবি কেউ তুলে প্রকাশ করে অথবা তাদের বহুল আলোচিত বিয়ের ছবি যদি কেউ গোপনে ধারণ করে প্রকাশ করে থাকে বা করত, তাহলে তাকে পাপারাজ্জি সাংবাদিকতা বলা যেত। পাপারাজ্জিদের এমন নামকরণের কারণ কী, পাপারাজ্জির অর্থই বা কী? পাপারাজ্জিদের এই নামকরণের পেছনে একটি গল্প আছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি চলচ্চিত্র এবং এর চলচ্চিত্রকারের নাম। তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভক্তদের আগ্রহের কথা কারো অজানা নয়। একজন তারকা ব্যক্তিজীবনে কেমন? তার ব্যক্তি সম্পর্ক, তার পছন্দ কী? কিইবা তার অপছন্দের বিষয়? ভক্তদের এমন হাজারো প্রশ্ন থাকে তারকাদের জীবন নিয়ে, প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ভক্তরা দ্বারস্থ হন গণমাধ্যমের, গণমাধ্যমও তাই প্রতিনিয়ত খুঁজে ফেরে তারকাদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিষয়। গণমাধ্যম এবং ভক্তদের এহেন জিজ্ঞাসুর সমাধানে নানা সময় কাজ করে স্বাধীন কিছু আলোকচিত্রী তারাই বর্তমানে পাপারাজ্জি হিসেবে পরিচিত। পাপারাজ্জিদের এই নামকরণ ও পেশার সম্পর্কে যে চলচ্চিত্রকারের কথা আগে বলা হয়েছে, তিনি হলেন বিখ্যাত ইতালিয়ান চলচ্চিত্রকার ফেদেরিকো ফেল্লিনি। ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তার সে চলচ্চিত্রটি হলো 'লা ডলসে ভিটা'। চলচ্চিত্রটির পটভূমি ছিল ইতালির রোম শহরে ম্যাগাজিনের জন্য গসিপ লেখক মার্সেলো রুবিনি (মার্সেলো মারসোয়ান্নি অভিনীত) নামে একজন সাংবাদিককে ঘিরে, যে কিনা জীবনযাত্রার মানে হঠাৎ বিপুল পরিবর্তন হতে থাকা বিপথগামী আধুনিক রোম শহরে সাংবাদিকতা করে। তার চারপাশের শহরের অবক্ষয়ে আচ্ছন্ন অবস্থা এবং ব্যক্তিগত জীবন তাকে বিষণ্ন করে তোলে। এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে উদগ্রীব মার্সেলোকে তখন পেশাগত কারণেই সাক্ষাৎকার নিতে যেতে হয় জমকালো বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের তারকা অভিনেত্রী সেলিভয়ার (আনিতা একবার্গ) কাছে। মার্সেলোর সঙ্গে ছিলেন ফটো সাংবাদিক সহকর্মী পাপারাজ্জি (ওয়াল্টার সান্টেসসো)। ঘটনাক্রমে সাংবাদিক মার্সেলো ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন সেলিভয়ার সঙ্গে। তাদের মধ্যকার বিভিন্ন অন্তরঙ্গ স্থিরচিত্র অগোচরে এ পাপারাজ্জি ধার করেন, যা পরে প্রকাশ হয় পত্রিকায়। সাংবাদিক মার্সেলো নিজেই খবর হয়ে উঠেন। তৈরি হয় এক বিব্রতকর পরিস্থিতির। চলচ্চিত্রটি মুক্তির পরপর পাপারাজ্জো চরিত্রটি ইউরোপের গণমাধ্যমগুলোয় বেশ আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। চলচ্চিত্রকার ফেলিনিকেও চরিত্র পাপারাজ্জো নিয়ে তখন বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। পেশাদার ফটো সাংবাদিকদের এক অংশকে তখন থেকেই পাপারাজ্জি নামে আখ্যায়িত করা হতে থাকে। পাপারাজ্জো (paparazzo/ paparazza) একটি ইতালীয় শব্দ, যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'গুণগুণ করা পতঙ্গ'। পাপারাজ্জো পুংপতঙ্গ এবং পাপারাজ্জা স্ত্রীপতঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পাপারাজ্জির অর্থগত মিলে হিব্রু, চাইনিজ ও রাশিয়ান ভাষায় বিবিধ শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইতালীয় শব্দ 'পাপারাজ্জো' থেকে ইংরেজি গণমাধ্যম 'পাপারাজ্জি' শব্দটির প্রচলন করে। ১৯৬১ সালে আমেরিকায় 'লা ডলসে ভিটা' মুক্তি পেলে বেশ আলোচনার সৃষ্টি হয়। আমেরিকার গণমাধ্যম এই পাপারাজ্জি চরিত্রটিকে বিশেষায়িত করে গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠিত বিষয় করে তুলে। 'লা ডলসে ভিটা'র মুক্তির সালেই বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে 'Paparazzi on the Prowl' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। চলচ্চিত্রে পাপারাজ্জিদের গাড়ি আটকে ক্যামেরায় ছবি তোলার দৃশ্যটির একটি স্থিরচিত্রও প্রকাশ হয়। এ প্রবন্ধে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরাকে ফ্ল্যাশগান হিসেবে বর্ণনা করা হয়। প্রবন্ধটি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই গণমাধ্যমে পাপারাজ্জি শব্দটি বহুলভাবে চর্চিত হতে থাকে। সে সময়ে পাপারাজ্জিদের ধারণকৃত স্থিরচিত্রগুলো পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ খবরের পাশাপাশি প্রকাশিত হয় বিনোদন সংবাদের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠে পাপ-রাজ্জিরা। তারকাদের ব্যক্তিজীবন নিয়েও গণমাধ্যম পূর্বের চেয়ে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। পাপারাজ্জি এক বিশেষায়িত ফটো সাংবাদিকতা পেশায় রূপ লাভ করে।

সর্বপ্রথম পাপারাজ্জি কে ছিলেন, এই প্রশ্নে ইলিও সরচি'র নাম আসবে সবার আগে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সোফিয়া লরেন, চলচ্চিত্র পরিচালক রোমান পোলনাস্কি, রবার্তো রোসালিনিসহ তৎকালীন জনপ্রিয় তারকাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ছবি তুলে বেশ সারা জাগিয়েছিলেন ইলিও সরচি। গণমাধ্যমে পাপারাজ্জিদের পেশাদারি কাঠামো তৈরিতে ইলিও সরচির অনস্বীকার্য অবদান আছে। ইলিও সরচি ১৯৬৩ সালের হায়েস্ট পেইড ফটো সাংবাদিক ছিলেন। রিনো বারিল্লারি অন্যতম আলোচিত এবং সমালোচিত আরেকজন পাপারাজ্জি যাকে 'কিং অফ পাপারাজ্জি' বলা হয়। ১৯৭২ সালে সাবেক ইউএস ফার্স্ট লেডি জ্যাকুলিন কেনেডির আদেশে তার সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট রিনো বারিল্লারির ক্যামেরা ভেঙে দেয় এবং তার বিরুদ্ধে হয়রানি করার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। উল্লেখযোগ্য আরেকজন পুরোধা পাপারাজ্জি হলেন রোনাল্ড গালেল্লা, দ্য গডফাদার খ্যাত অভিনেতা মার্লন ব্রান্দো একবার পাপারাজ্জি হয়রানির কারণে রোনাল্ড গালেল্লাকে প্রহার করতে উদ্যত হন। এ ঘটনার পর টাইম ম্যাগাজিনে রোনাল্ড গালেল্লা ও পাপারাজ্জি পেশা নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। তাতে রোনাল্ড গালেল্লাকে 'গডফাদার অব ইউএস পাপারাজ্জি কালচার' বলে আভিহিত করা হয়। ইতিহাসে পাপারাজ্জি ও তারকাদের মধ্যকার সম্পর্ক ভীষণ তিক্ত হলেও তার ভিন্নও হয়েছে, তারকাখ্যাতি বৃদ্ধি ও আলোচনায় থাকতে তারকারা ইচ্ছাকৃত সমালোচনার জন্ম দিতেও পাপারাজ্জিদের জন্য অনুকূল পরিবেশ দিয়ে গেছেন সময়ে সময়ে।

তবে চলচ্চিত্র বা গ্ল্যামার্স ওয়ার্ডে সাংবাদিকতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এ পাপারাজ্জি পেশা থাকবে কি না, তা নিয়ে ভীষণ বিতর্ক হয়েছে। ১৯৯৭ সালে প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যু হয়। ওই বছরের আগস্টে প্যারিসের একটি টানেলে গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হন প্রিন্সেস ডায়ানা। ওই সময় ব্রিটিশ গণমাধ্যম দায়ী করেছিল প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যুতে অন্তত ৩০ শতাংশ দায় ছিল পাপারাজ্জি সাংবাদিকদের। কারণ প্যারিসে যখন তার গাড়ি বিপজ্জনক গতিতে টানেলে প্রবেশ করেছিল তখন তাঁকে ধাওয়া করছিলেন পাপারাজ্জি সাংবাদিকরা।

রণবীর কাপুর-মাহিরা খান ও পাপারাজ্জি

উপমহাদেশ তথা এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ বলিউড। এ জগতের তারকাদের নিয়ে সারা বিশ্বে অগণিত ভক্ত নানা খবরের অপেক্ষায় থাকেন। সবশেষ অভিনেতা রণবীর কাপুর শিকার হয়েছেন পাপারাজ্জি ফেটো সাংবাদিকতার, যা নিয়ে হয়েছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। রেইস' চলচ্চিত্রের পাকিস্তানি নায়িকা মাহিরা খানকে দেখা গেছে রণবীর কাপুরের সঙ্গে। বিভিন্ন সিনে ম্যাগাজিন ছবি প্রকাশ করে– রণবীর কাপুর ও মাহিরা খান নিউইয়র্কের একটা হোটেলে একসঙ্গে হাঁটছেন। মাহিরা খান স্বল্প পরিসরের আটপৌরে পোশাক পরা। আবার তারা একসঙ্গে ধূমপান করছিলেন। পাপারাজ্জিদের তোলা এ ছবি নিয়েই শুরু হয় তোলপাড়। কয়েক সপ্তাহ ধরে সিনে ম্যাগাজিন এমনকী মূল ধারার পত্রপত্রিকায় আলোচনার বিষয় ছিল এ ছবি দুটি।

তথ্যসূত্র

1. Fraser, Bond F. (1961), An Introduction to journalism. New York: Macmillan.
2. Wareen, Carl. (1959), Third Edition. *Modern News Reporting. Harper & ROW : NewYork and Evanston.*
3. http://www1.hollywoodreporter.com/hr/about_us/histor
4. সাপ্তাহিক চিত্রালী, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সংখ্যা।
5. https://www.britannica.com
6. Underwood, Doug. "Reporting and the Push for Market-oriented Journalism: Media Organizations as Businesses." In Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy, edited by W. Lance Bennett and Robert M. Entman, 99-116. New York: Cambridge University Press, 2001.
7. http://time.com/4914324/princess-diana-anniversary-paparazzi-tabloid-media/ (16.02.2018)

লেখক: প্রভাষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

বিনোদন সাংবাদিকতা
অতীত আর বর্তমানের আয়নায়

শামীমা চৌধুরী

ভূমিকা

বিনোদন বা সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানতে হলে সবার আগে চলে যেতে হয় সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে। সংস্কৃতির মূলে রয়েছে জীবজগৎ, প্রকৃতি ও সমাজ নিয়ে মানুষের উৎকৃষ্ট ভাবনা। যাকে বলা যায় সুন্দরের ধ্যান। চিন্তাবিদ আহমেদ শরীফ তাই বলেছেন, 'মানুষের পরিশীলিত ও পরিশ্রম জীবন চেতনাই হচ্ছে সংস্কৃতি।' রাশিয়ান চিন্তাবিদ টি ভি টি রবাটের মতে, 'সংস্কৃতি হলো অনুমানগত ও ফলিত সব চিন্তাধারা জ্ঞানের সমষ্টি।' আসলে সুর-ছন্দ, নাটক, নৃত্যকলা, চলচ্চিত্র, ঐতিহ্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প, চারুশিল্প, উপস্থাপনা, বাচনিক শিল্প– এসব কিছু নিয়ে গড়ে উঠেছে সংস্কৃতির বিশাল বলয়। আর তাই ভারতীয় চিন্তাবিদ অচিন্তেশ ঘোষ বলেছেন, 'সংস্কৃতির জোরেই আজ মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে নিজের কাজে লাগাচ্ছে। মানুষের সাথে পশুর পার্থক্য সংস্কৃতির জোরেই।'

সংস্কৃতি একটি বিশাল বলয়। একে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বটি পালন করছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের সবচেয়ে প্রাচীনতম ধাপ হচ্ছে লোকজ মাধ্যম। এরপর সংবাদপত্র। এর বেশ অনেক পরে বেতার ও টেলিভিশনের অবস্থান। গণমাধ্যমের এই সীমাবদ্ধতার ভেতরে দীর্ঘদিন সংস্কৃতি সাংবাদিকতায় পৃথক ধারা বিকাশের সুযোগ ছিল না। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে বিবিসি ও সিএনএন চালুর মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ প্রবেশ করে গণমাধ্যমের নতুন ভুবনে। যাকে বলা যায় আন্তর্জাতিক রূপ। আর এখন হাজারো স্যাটেলাইটের কল্যাণে পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষ একে-অপরের পরমাত্মীয়, অতিচেনা, অতিপরিচিত। বিশ্বের প্রতিটি ঘটনার সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা।

উপমহাদেশে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার সূচনা ঘটে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে প্রথম প্রদর্শিত লুমিয়ের ব্রাদার্সের ৬টি ছবির বিজ্ঞাপন সর্বপ্রথম ছাপা হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ৭ জুলাই 'The Times of India' পত্রিকায়

আধুনিক প্রযুক্তি ইমেইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, অনলাইন, ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশা বিকাশের প্রায় সর্বশীর্ষ ধাপটি এখন হাতের মুঠোয়। এই পেশায় এসেছে আধুনিকতা, নতুনত্ব, অভিনবত্ব। মূলধারার সাংবাদিকতার পাশাপাশি স্পেশালাইজড সাংবাদিকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ সাংবাদিকতা, কূটনৈতিক সাংবাদিকতা, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা, সংসদবিষয়ক সাংবাদিকতা, জ্বালানিবিষয়ক সাংবাদিকতা, নারী সাংবাদিকতা, অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা, সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা ইত্যাদি।

সাংবাদিকতার এ বিশাল সমুদ্রে সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা আপন মহিমায় উদ্ভাসিত ও জনপ্রিয়। মাত্র কয়েক বছর আগে শুধু সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক একটি পাতার মধ্যে যে সাংবাদিকতার সীমাবদ্ধতা ছিল, চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র সমালোচনা, টেলিভিশন অনুষ্ঠানের সমালোচনা ছিল যে পাতার প্রধান বিষয়, তা এখন বহুমাত্রিক, বহুধাবিভক্ত। এবিসি সূত্রমতে, (ডিসেম্বর ২০১৫) রাজধানী ঢাকা থেকে ৩৮৭টি এবং ঢাকার বাইরে থেকে ৬৫৯টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রগুলোয় প্রতিদিন সংস্কৃতি নিয়ে একটি পাতা অথবা কর্নার থাকে। সংস্কৃতি বা বিনোদন সাংবাদিকতা এখন অন্যতম জনপ্রিয় বিষয় পাঠকের কাছে। বিশেষ করে প্রতিটি দৈনিকে প্রতিদিন বিনোদন বিভাগ থাকায় সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা আরও বৈচিত্র্যময় ও জনপ্রিয় হয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া একে করে তুলেছে আরো জনপ্রিয়।

সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা : অতীতের আয়নায়

সংস্কৃতি বা বিনোদন সাংবাদিকতার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে হলে আমাদের অতীতের দিকে নজর দিতে হয়, যা বিশ্বে শুরু হয় সিনে জার্নালিজমের মধ্য দিয়ে। সিনেমা এমন একটি গণমাধ্যম, যেখানে সংস্কৃতির সব উপাদানের উপস্থিতি থাকে। নৃত্য, সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্যকলা, নাটক এসব কিছুর মেলবন্ধনই সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা। তাই সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতার স্বরূপ খুঁজতে হলে সিনে জার্নালিজমের অতলে ডুব দিতে হয়।

সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতার শুরু খুব বেশিদিন আগে নয়। সময়টা ১৯১৩ সাল। হলিউডের ভিটাগ্রাফ কোম্পানি চলচ্চিত্রবিষয়ক একটি হাউস বুলেটিন প্রকাশ করে। সম্ভবত এটিই হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন ফান ম্যাগাজিন। পাঠকদের কাছে বুলেটিনটিতে চিত্রতারকাদের নানা ধরনের খবরাখবর থাকায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

১৯৫০ সালে ফ্রান্সে প্রকাশিত হয় বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্র পত্রিকা 'কাইয়ে দু সিনেমা'। চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মানোন্নয়নসহ এ শিল্পে সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার ভূমিকা যে কত ব্যাপক ও অসামান্য, তা প্রতিভাত হয় এ পত্রিকায়। বিখ্যাত 'নুভেল ভাগ' আন্দোলনের জন্মদাতা হচ্ছে এই পত্রিকা। 'নিউ ওয়েভ'-এর আধ্যাত্মিক গুরু এবং প্রখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক অঁদ্রে বাজাঁ ছাড়াও জন্মলগ্নে এই পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এরিক রোমান, জাঁ লুক গদার, ফ্রাসোয়াঁ ত্রুফো, আন্দ্রে তেশিন, জাঁ রিভেত, শ্যাব্রল, আস্ত্রক, লুই মাল, অ্যালা রেনে প্রমুখ। সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক রচনাসহ চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে মননশীল আলোচনা ছাড়াও পরে এই সাংবাদিকরা যুক্ত হয়েছিলেন শৈল্পিক মানের ধ্রুপদি চলচ্চিত্র নির্মাণে। চলচ্চিত্রবিষয়ক এ পত্রিকাটি সম্পর্কে নুভেল ভাগ ধারার অন্যতম প্রধান পুরুষ জাঁ লুক গদার বলেন, কাইয়ে দু সিনেমার লেখা ছিল প্রায় একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করার শামিল। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রেও পত্রিকাটি পালন করেছে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। অনুরূপভাবে যুক্তরাজ্যের ফ্রি সিনেমা মুভমেন্টের জন্ম ও বিকাশে 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটির সাথে জড়িত লিন্ডসে এন্ডারসন এবং টনি রিচার্ডসনের নাম চলচ্চিত্রের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। এভাবে যুক্তরাজ্যে চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী জন্ম দিয়েছে বিশ্বখ্যাত বহু চলচ্চিত্র নির্মাতার, চলচ্চিত্রবিষয়ক তত্ত্বের চলচ্চিত্র বোদ্ধা, চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচকের।

উপমহাদেশে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার সূচনা ঘটে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে প্রথম প্রদর্শিত লুমিয়ের ব্রাদার্সের ৬টি ছবির বিজ্ঞাপন সর্বপ্রথম ছাপা হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ৭ জুলাই 'The Times of India' পত্রিকায়। এরপর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বৃদ্ধি পেলে এবং ভারতে প্রেক্ষাগৃহ, স্টুডিও ও ছবির নির্মাণকাজ আরম্ভ হলে চলচ্চিত্র সম্পর্কে মানুষের আগ্রহও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু চলচ্চিত্রই নয়, চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা, কলাকুশলী এবং অন্যান্য বিষয়েও জানার কৌতূহল সৃষ্টি হয়। ফলে সংবাদপত্রের পাতায় ঠাঁই পেতে শুরু করে চিত্রজগতের বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর। কিন্তু পাঠকের আগ্রহ এবং চাহিদা দিন দিন আরও বাড়তে থাকে। একান্তভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রপত্রিকার পয়োজন দেখা দিল। এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেন উপমহাদেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার অগ্রদূত বাবু রাও প্যাটেল। ১৯৩৩ সালে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ফিল্ম ইন্ডিয়া' পত্রিকা। এ পত্রিকা ছিল সম্পূর্ণরূপে চলচ্চিত্রবিষয়ক। বাবু রাও প্যাটেল পত্রিকাটির মাধ্যমে ভারতে চলচ্চিত্রবিরোধী প্রচারণা প্রতিহত করেন। পত্রিকাটির জনপ্রিয় কলাম ছিল 'Questions and Answer' এবং প্রায় অনুরূপ আরেকটি কলাম 'You will hardly believe'.

ফিল্ম ইন্ডিয়ার পরে অবিভক্ত ভারতে প্রকাশিত হয় আরো বহুসংখ্যক চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রপত্রিকা। এসব পত্রপত্রিকা এবং সাময়িকীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : নাচঘর, বায়োস্কোপ, চিত্রপঞ্জী, বাতায়ন, সাহানা, খেয়ালী, দিপাল, রূপমঞ্চ, ফিল্মল্যান্ড, নাট্যমন্দির, বংগালয়, বিজলী, ফিল্ম ফেয়ার, স্টার ডাস্ট, ক্লোজআপ, সিনে ব্লিটজ, চিত্রাভাস, আনন্দলোক, ঘরোয়া, মৌসুমী, উল্টোরথ, প্রসাদ, মুভি মনতাজ, চিত্রকল্প, সিনে টেকনিক, অভিনয়, সিনেমা জগৎ প্রভৃতি বাংলা ও ইংরেজি পত্রপত্রিকা। এসব পত্রপত্রিকার আত্মপ্রকাশ এবং চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা দেখে ১৯৩৩ সালের ৯ ডিসেম্বর তদানীন্তন দেশ পত্রিকায় খগেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন– *'বাংলাদেশে সাধারণের অবগতির অন্তরালে যে ধীরে ধীরে এক সিনেমা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের প্রয়োজন নেই। দিনের পর দিন একটির পর একটি করে চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হচ্ছে। বাঙালি দর্শক সিনেমা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা সাহিত্য পাঠের লিপ্সাও কিছু পরিমাণ বোধ করতে আরম্ভ করেছে, তার অকাট্য প্রমাণ এই পত্রিকাগুলোর দায়িত্ব ও উত্তরোত্তর আত্মপ্রতিষ্ঠা।'*

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতার শুরুর কথা

এদেশে সংস্কৃতি বা বিনোদন সাংবাদিকতার যিনি অগ্রপথিক, তিনি হলেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক আবু তাহের মোহাম্মদ ফজলুল হক। ১৯৫০ সালে বগুড়া শহর থেকে তিনি 'মাসিক সিনেমা' নামে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। দু'-তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি মনোবল হারাননি। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকায় এসে নতুনভাবে জাঁকজমকের সাথে পত্রিকাটি আবারো প্রকাশ করেন। প্রথমে ২নং এসি রায় রোড এবং পরে ৪নং একে সেন লেন থেকে প্রকাশ হতো পত্রিকাটি। সিনেমা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিল বেগম নাসিম বানুর। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সুরেন রায়, জেব-ইন-নেসা খানম, ফজলুল হক ও ফজলুল করিম।

এর মধ্যে আরো সম্পৃক্ত ছিলেন রাবেয়া খাতুন, ইফতেখারুল আলম, জহির রায়হান, অফজাল চৌধুরী, ফজলুল করিম, সন্তোষ কুমার বসাক, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ। সিনেমা ছিল একটি পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল পত্রিকা। চলচ্চিত্র পত্রিকার ক্ষেত্রে এটির নাম অত্যন্ত স্মরণীয়। পত্রিকাটির সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে বিপ্লব দিবস উপলক্ষে। মাসিক সিনেমার সম্পাদক ফজলুল হক পরে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৫৩ সালে চিত্রালী প্রকাশ হলে সাংবাদিকতায় এ শাখাটি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ এখানে ছিল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। চলচ্চিত্র ছাড়াও নৃত্য, সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্যকলা, নাটক, সমালোচনা, পাঠক মতামত, রেডিও, টেলিভিশন সবকিছুর সমন্বয়ে প্রকাশিত হতো চিত্রালী। সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ। ১৯৫৯ সালে হামিদুল হক চৌধুরী চিত্রালীর মালিকানাস্বত্ব ক্রয় করেন। পত্রিকাটির প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য উত্তরণ ঘটে ১৯৬৬ সালে। এই বছর পত্রিকাটি সর্বপ্রথম স্বচ্ছচিত্র ব্যবহার করে এবং চার রঙা অফসেটে মুদ্রিত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে সম্পাদনায় দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আহমদ জামান চৌধুরী। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হীরন দে।

পরবর্তী সময়ে এদেশে চলচ্চিত্রবিষয়ক অর্ধশতাধিক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ লেখায় এ দেশের কয়েকটি সাংস্কৃতিক পত্রিকা এবং সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হলো :

সিনেমাবিষয়ক রম্য ম্যাগাজিন হিসেবে মাসিক 'উদয়ন' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রুহুল আমিন। পরে পত্রিকাটি সোভিয়েত দূতাবাস কিনে নেয়। মাসিক 'ছায়াবাণী'র (১৯৫০) সম্পাদক ছিলেন খালেদ সিদ্দিকী। 'রূপছায়া' (১৯৫১) সম্পাদক মিজানুর রহমান। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এবং প্রকাশক ছিলেন রুহুল। এহতেশাম হায়দার চৌধুরী সম্পাদিত আরেকটি চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা পূর্ববাণী (১৯৫৬)। এটি ইত্তেফাক গ্রুপের একটি পত্রিকা। ১৯৭৫ সালে সরকারি রোষানলের শিকার হয় ইত্তেফাক। ওই বছরই পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক খোন্দকার শাহাদত হোসেন। নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন বর্তমান সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার। রঙিন ও জনপ্রিয় এ পত্রিকাটি সাপ্তাহিক চিত্রালীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিগণিত হয়। 'প্রবাহ' (১৯৫৬) সম্পাদনা করেন জহির রায়হান। প্রধান সম্পাদক ছিলেন আহসান হাবীব। 'সচিত্র সন্ধানী' (১৯৫৬) সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ। 'রমনা' (১৯৫৬) সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ।

'মৃদঙ্গ' (১৯৫৬) সম্পাদক মোস্তফা মেহমুদ। চিত্রাকাশ (১৯৫৬) সম্পাদক সাইফুদ্দিন সিদ্দিক। পরবর্তী সময়ে সম্পাদনা করেন আজিজ মিসির। 'চলন্তিকা' (১৯৫৬) সম্পাদক আজিজ মিসির। 'সাজঘর' (১৯৬২) সম্পাদক কাজী সিরাজ। 'ঝিনুক' (১৯৬৬) ও 'মালঞ্চ' (১৯৬৬) সম্পাদক আসিরউদ্দিন আহমদ। 'জোনাকী' (১৯৬৯) সম্পাদক আবদুল মতিন। 'চিত্রিতা' (১৯৭০) সম্পাদনা করেন লায়লা সামাদ। প্রকাশক ছিলেন চিত্রনায়ক হারুন। সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' (১৯৭২) সম্পাদক ফজল শাহাবুদ্দিন। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন হাসান হাফিজুর রহমান। পরে সম্পাদক হন খোন্দকার শাহাদৎ হোসেন। পরবর্তী সময়ে পত্রিকাটি কিনে নেন শেখ রেহানা। বর্তমানে তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক। সাপ্তাহিক রূপসী (১৯৭২) সম্পাদক শহীদুল হক খান, পরে লিপিকা, 'সাতরং' এবং 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' (১৯৯২) সম্পাদনা করেন। রঙিন সাপ্তাহিক সিনেমা (১৯৭৩) সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম ববি। প্রকাশক শেখ ফজলুল হক মনি। পরে সম্পাদক আখতারুজ্জামান। 'বিনোদন' (১৯৭৪) সম্পাদক ফজল শাহাবুদ্দিন। 'চিত্রকল্প' (১৯৭৫) সম্পাদক সৈয়দ শাহাজাহান পরে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন আসিরউদ্দিন আহমদ। 'নিপুণ' (১৯৭৫) সম্পাদক শাহজাহান চৌধুরী। 'চিত্রবাংলা' (১৯৮১) সম্পাদক ফুলুরা বেগম ফ্লোরা। স্ক্রীন লাইফ (১৯৮২) সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম ববি। তারকালোক (১৯৮২) সম্পাদক সৈয়দ মতিউর রহমান। পরে প্রধান সম্পাদক হন আরেফিন বাদল এবং সম্পাদক হন সাযযাদ কাদির। 'আনন্দ বিচিত্রা' (১৯৮৬) সম্পাদক শামসুর রাহমান। পরে সম্পাদক হন খোন্দকার শাহাদত চৌধুরী এবং নির্বাহী সম্পাদক হন চিন্ময় মুৎসুদ্দী। 'ছায়াছন্দ' (১৯৮৫) সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান। 'তারকা কাগজ' (১৯৯২) সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান। নান্দনিক (১৯৯১) সম্পাদক ফজল শাহাবুদ্দিন। 'পূর্ণিমা' (১৯৮৭) সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিন। নির্বাহী সম্পাদক আতাহার খান। 'মনোরমা' সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান। 'মূলধারা' (১৯৮৯) সম্পাদক শামসুর রাহমান। 'চোখে চোখে' (১৯৯১) সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান। 'মুখোমুখি' (১৯৮৫) সম্পাদক ইয়াসিন বাবুল। 'প্রিয়জন' সম্পাদক আবদুর রহমান। 'টেলিভিশন' (২০০৫) সম্পাদক আসাদুজ্জামান রিপন। আনন্দ আলো (২০০৫) সম্পাদক রেজানুর রহমান। 'বিনোদন' প্রধান সম্পাদক রাজু হোসেন। 'আনন্দধারা' (১৯৯৮) সম্পাদক খোন্দকার শাহাদৎ হোসেন। বর্তমান সম্পাদক অরুণ চৌধুরী। 'বিনোদন বিচিত্রা' (১৯৯৮) সম্পাদক দেওয়ান হাবিবুর রহমান। 'অন্যদিন' (১৯৯৬) প্রধান সম্পাদক মিজানুর রহমান মাসুম। সম্পাদক মাজাহারুল ইসলাম। আনন্দভুবন (১৯৯৬) ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইকবাল খোরশেদ। 'প্রতিচিত্র' (১৯৯৮) সম্পাদক বরুণ শঙ্কর। 'সিনেভিশন' (১৯৯১) সম্পাদক সৈয়দ রানা মুস্তফী। 'বিনোদন ধারা' (২০০২) সম্পাদক আবুল হোসেন মজুমদার। 'জনতার নিঃশ্বাস' (২০০৫) সম্পাদক সুমন পারভেজ। 'বিনোদন আলো' আবুল হোসেন মজুমদার সম্পাদিত। এছাড়া চলচ্চিত্রবিষয়ক বেশকিছু সংকলন, লিটল ম্যাগাজিন, বুলেটিন প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'ধ্রুপদী' (১৯৬৭) সম্পাদনা করেন জামাল খান, মুহম্মদ খসরু ও ইয়াসিন বাবুল। 'সিকোয়েন্স' (১৯৬২) সম্পাদক আলমগীর কবির। 'চলচ্চিত্র' (১৯৭৫) সিনেপল সংসদের। 'চলচ্চিত্রিক' (১৯৭৭) সম্পাদক এ এইচ মহিবুল্লাহ। 'চলচ্চিত্রকার' (১৯৭৫) সম্পাদক মুহম্মদ খসরু ও মাহবুব আলম। 'সেলুলয়েড' (১৯৭৭) সম্পাদক আহমেদ মুজতবা জামাল। 'মন্তাজ' (১৯৮৮) সম্পাদক তানভীর মোকাম্মেল, মানজারে হাসিন ও মাহমুদুল হাসান। 'চলচ্চিত্র চিন্তা' (১৯৮৭) সম্পাদক আনোয়ার হোসেন পিন্টু। 'ছবি' (১৯৭৯) সম্পাদক হোসেন জিলুর রহমান।

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত আনন্দ বিচিত্রা সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়। এই পত্রিকাগুলোয় সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রিপোর্ট এবং সাক্ষাৎকার গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো।

সংবাদপত্রে সংস্কৃতি পাতার চিত্র

সংস্কৃতি রিপোর্টিং এখন আর চলচ্চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সংস্কৃতির প্রতিটি শাখা নিয়ে প্রতিদিন একটি পাতা বের হয়। যেমন দৈনিক প্রথম আলোর বিনোদন, দৈনিক ইত্তেফাকের বিনোদন প্রতিদিন, দৈনিক সমকালের আনন্দ প্রতিদিন, দৈনিক নয়াদিগন্তের বিনোদন সারাদিন, দৈনিক যুগান্তরের আনন্দ নগর, দৈনিক জনকণ্ঠের সংস্কৃতি, দৈনিক মানবজমিনের বিনোদন, ডেইলি স্টারের Cultuer, নিউএজের Time out ইত্যাদি। সাংবাদিকতার যে মৌলিক উপাদান অর্থাৎ তাৎক্ষণিকতা, নৈকট্য, প্রখ্যাতি, অভিনবত্ব, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, শিহরন-উৎকণ্ঠা, আবেগ-মানবিক আবেদন, ফলাফল-পরিণাম খবরের বৈশিষ্ট্যের এসবই এই রিপোর্টগুলোতে অনুসরণ করা হয়।

দেশের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারি চ্যানেল, সরকারি ও বেসরকারি রেডিও এবং অনলাইন গণমাধ্যমগুলোয় প্রতিদিন সংস্কৃতিবিষয়ক রিপোর্টিং ও অনুষ্ঠান থাকছেই।

সংস্কৃতি সাংবাদিকতা

সংস্কৃতিবিষয়ক সাংবাদিকতার প্রাচীন সংগঠন বাচসাস

বাংলাদেশে এখন সংস্কৃতিবিষয়ক সাংবাদিকতার একাধিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। এ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত একঝাঁক তরুণ সাংবাদিক এখন কাজ করছে। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার সাথেও যুক্ত অনেকে। তবে এ দেশে সংস্কৃতিবিষয়ক সাংবাদিকতার সবচেয়ে পুরোনো সংগঠনটি হচ্ছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি, সংক্ষেপে বাচসাস। যেটির বয়স এখন প্রায় ৫০ বছর।

১৯৬৮ সালের ৫ এপ্রিল ঢাকার দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় (প্রাচী হোটেলে) তৎকালীন সাংস্কৃতিক সাংবাদিকদের এক সভায় পাকিস্তান চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেদিনই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-চলচ্চিত্র নির্মাতা ওবায়েদ-উল-হক। ওই সভায় ওবায়েদ-উল-হক সভাপতি এবং এস এম পারভেজ, আজিজ মিসির, ফজল শাহাবুদ্দিন ও আলমগীর কবিরকে সদস্য করে পাঁচ সদস্যের একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে সাধারণ সভায় উপস্থিত ১৯ জন সদস্যকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মর্যাদা দেয়া হয়।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন ওবায়েদ-উল-হক, এস এম পারভেজ, আজিজ মিসির, ফজল শাহাবুদ্দিন, আলমগীর কবির, হুসনা বানু খানম, আহমদ জামান চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, শাহার আজিম, শাহজাদ মানজার, আকিল পারভেজ, এটিএম হাই, গাজী মুঙ্গের, আহমেদ নূরে আলম, নাজিমুদ্দিন মানিক, আজিজুর রহমান নয়ন, সেলিম এবং আসিরুদ্দিন আহমেদ। এ দেশের সংস্কৃতি সাংবাদিকতার পথিকৃৎ হলেন তাঁরা।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সমিতির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস)। ইংরেজিতে বাংলাদেশ সিনে জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিজেএ)। পাচসাস অর্থাৎ পাকিস্তান চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতিই বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর বাচসাস (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি) হিসেবে নতুন উদ্দীপনার কর্মোদ্যোগে পথচলা শুরু করে।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাচসাস-ই প্রথম চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রবর্তন করে। সরকারিভাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এসেছে আরো অনেক পরে ১৯৭৫ সালে। চার দশকের বেশি সময় ধরে বাচসাস নানা কর্মসূচির মাধ্যমে স্বচ্ছ সাংবাদিকতা ও সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ জুগিয়ে আসছে। বর্তমানে সাংবাদিক আবদুর রহমান সভাপতি এবং ইকবাল করিম নিশান সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। ২০ সদস্যের নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি বাচসাস-এর সাংগঠনিক দায়িত্বে।

বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

এ দেশের সংস্কৃতি সাংবাদিকতার সময়োচিত ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। খুব বেশিদিন আগে নয়, ১৯৯৫ সালে দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় কর্মরত সাংস্কৃতিক বিট কভার করা কয়েকজন প্রতিভাবান তরুণ গড়ে তোলেন সংগঠনটি। বর্তমানে এ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বে আছেন অভি চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন সাংবাদিক দুলাল খান।

উপসংহার

সিনেমা, চিত্রালী, পূর্বাণী এবং চিত্রাকাশ– পঞ্চাশ দশকের সংস্কৃতি সাংবাতিকতার এই মূল স্রোত থেকে অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট এবং সফল প্লাটফর্মে এসে পৌঁছেছে এখনকার সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা। এই বিটে কাজ করে সাংবাদিকরা পাচ্ছেন পুরস্কার-সম্মাননা। তাঁরা লাভ করছেন বিশেষ প্রশিক্ষণ। তাঁদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে নতুন উদ্যোম-কর্ম আনন্দ। পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন, অনলাইন মিডিয়া গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখায় সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি টোটাল সাংবাদিকতার একটি ইতিবাচক দিক।

তথ্যসূত্র

১. *চিন্ময় মুৎসুদ্দী, সংস্কৃতি সাংবাদিকতার স্বরূপ পৃ. ৯–১১*
২. *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : পাঁচ দশকের ইতিহাস, আবদুল্লা জেয়াদ, পৃ. নং ৪৪২-৪৪৩*
৩. *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প, মীর্জা তারেকুল কাদের, পৃ. নং ৬১৯-৬২২*
৪. *সংস্কৃতি সাংবাদিকতার সেকাল একাল, মাহফুজ সিদ্দিকী, পৃ. নং ১৩-১৪*
৫. *আবদুর রহমান, সভাপতি, বাচসাস*
৬. *অভি চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন*

লেখক : সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, পিআইবি

প্রসঙ্গ: বিনোদন ও বিনোদন সাংবাদিকতা

ইরানী বিশ্বাস

বিনোদনজগৎ নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই সাধারণ মানুষের। তারকা বলতে ধরাছোঁয়ার বাইরের মানুষদের বোঝানো হতো। প্রিয় তারকার পছন্দের খাবার তালিকায় কী রয়েছে সেটা জানার আগ্রহ কমবেশি সব মানুষের মনেই উঁকিঝুঁকি দেয়। এছাড়া কেমন তাদের জীবনযাপন, তাদের পারিবারিক অবস্থান, এমনকি তারা বর্তমানে কী কাজ করছেন, আগামী দিনে কী করার পরিকল্পনা আছে, এসব বিষয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। অনেকেই প্রিয় তারকার স্টাইল ফলো করে। চুলের স্টাইল, কথা বলার স্টাইল, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও প্রিয় তারকার ছোঁয়া রাখতে পছন্দ করেন অনেকেই। সাধারণ মানুষের কাছে এই চিত্রতারকাদের ঘরে-বাইরের খবর দিতে নিরলস কাজ করেন বিনোদন সাংবাদিক।

একটা সময় ছিল যখন মানুষের অবসর কাটত বিনোদন ম্যাগাজিন পড়ে। তখন চ্যানেল বলতে একটাই ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশন। পরবর্তী সময়ে সেই টেলিভিশনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিশোর্ধ্ব। সেসময় চিত্রজগৎ অর্থাৎ বিনোদনের খবর ছাপা হতো হাতেগোনা কয়েকটা ম্যাগাজিনে। তখনো দৈনিক পত্রিকায় কোনো বিনোদনের খবর ছাপা হতো না। কোনো কোনো ম্যাগাজিন প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতো। আবার কোনোটা পাক্ষিক, মাসিক, দ্বি-মাসিকও বিনোদন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতো। বিনোদনপ্রেমী মানুষরা সারা সপ্তাহ, মাসজুড়ে অপেক্ষা করত এই ম্যাগাজিনের জন্য। পারিবারিক মিলনমেলাতেও দেখা যেত বিনোদনজগতের গসিব চলত। এছাড়া স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনোদন ম্যাগাজিনের কদর ছিল বেশি। তারা ক্যাম্পাসে বা ক্লাসের ফাঁকে, আড্ডায় মূল টপিক্স হিসেবে চিত্রজগতের খবরাখবর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করত।

তখনকার দিনে বিনোদন সাংবাদিক মানে ছিল অনেক সম্মানের পেশা। চাইলেই কোনো তারকা সাংবাদিককে নিউজ করার জন্য দাওয়াত করে নিজের বাড়িতে নিতে পারতেন না। সব তারকাকেই পত্রিকা অফিসে আসতে হতো

তবে গৃহবধূ বা বাড়ির কর্তারও কিন্তু কম আগ্রহ ছিল না এসব ম্যাগাজিনের প্রতি। সেসময়ে সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের ড্রয়িংরুমে দু'-একটা বিনোদন ম্যাগাজিন আজকালকার দামি শোপিসের মতো শোভাবর্ধন করত।

কোনো ছেলে বা মেয়ে যদি মিডিয়াতে নিজেকে দেখতে চাইতেন, তাহলে প্রথমেই তারা কোনো না কোনো বিনোদন সাংবাদিকের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতেন। কারণ একজন সাংবাদিক যদি তাঁকে চিত্রজগতের তারকা হিসেবে স্বীকৃতি দিতেন তবেই তিনি চিত্রজগতে বিচরণের সুযোগ পেতেন। তাই তো বলা হয়, মিডিয়াতে নিজের প্রতিপত্তি গড়তে চিত্রতারকারা নির্ভরশীল ছিলেন বিনোদন সাংবাদিকের ওপর। বিনোদনজগতে পরিচিতি পেতে হলে বা কোনো পরিচালকের কাছে সুযোগ পেতে হলে বিনোদন সাংবাদিকরাই ছিল মাধ্যম। যার কারণে কোনো মেয়ে বা ছেলে যদি চিত্রজগতে নিজের চেহারা বা নাম লেখাতে চাইতেন, তাহলে তিনি প্রথমে ধরনা দিতেন কোনো নামকরা বিনোদন সাংবাদিকের কাছে। এই সাংবাদিক নির্ধারিত ক্যামেরাম্যানের মাধ্যমে ফটোশুট করে ম্যাগাজিনে ছবি ছেপে পরিচিত করাতেন সাধারণ জনগণের সঙ্গে। শুধু ছবি নয়, তার সঙ্গে থাকত একটি বিশাল সাইজের নবাগত তারকার জীবনবৃত্তান্ত। এসব ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন এবং ছবি দেখে নাটক-সিনেমার প্রডিউসার, পরিচালকের ডাক আসত তারকার কাছে। এভাবে একসময় তারকারা কোনো সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হলে তাঁকে নিয়ে নিউজ ছাপা হতো। ধীরে ধীরে নতুন তারকা সাধারণ জনগণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠত। এভাবেই একজন তারকা ও পরিচালকের সেতুবন্ধ হয়ে কাজ করেন একজন বিনোদন সাংবাদিক।

সেসময় কোনো সাংবাদিক যদি চাইতেন কাউকে সুপারস্টার বানাবেন, তা সম্ভব ছিল এবং কোনো সুপারস্টারকে হিরো থেকে জিরো করে দেবেন, তা-ও সম্ভব ছিল। তাই তো কোনো পরিচালক যখন নতুন কোনো মেয়েকে নিয়ে মিডিয়াতে কাজ শুরু করতে চাইতেন, তখন পরিচালক বা প্রযোজক কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে শেয়ার করতেন। শুধু তা-ই নয়। নতুন কোন ছবি করবেন, কী ধরনের গল্প হবে এসব খবর আগে জানতেন একজন বিনোদন সাংবাদিক। এমন অনেক হয়েছে, পরিচালক গল্প চূড়ান্ত করেছেন। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করেছেন। এমনকি শুটিংয়ের তারিখ ঠিক। মহরতের আগের দিন হয়তো সাংবাদিক জানালেন গল্পটা মনে হচ্ছে তেমন জমবে না। পরিচালক দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করে, বাধ্য হয়েছেন গল্প পরিবর্তন করতে।

তখনকার দিনে বিনোদন সাংবাদিক মানে ছিল অনেক সম্মানের পেশা। চাইলেই কোনো তারকা সাংবাদিককে নিউজ করার জন্য দাওয়াত করে নিজের বাড়িতে নিতে পারতেন না। সব তারকাকেই পত্রিকা অফিসে আসতে হতো। চাইলেই কোনো সাংবাদিককে তারকারা গিফট দিতে পারতেন না। এতে নাকি সাংবাদিকের প্রেস্টিজ নষ্ট হতো। কারণ তারকার কাছে একজন বিনোদন সাংবাদিক বা সম্পাদক ছিলেন শ্রদ্ধার মানুষ, সম্মানের মানুষ। সেই কারণে, সাংবাদিকরা যদি তারকার বাড়িতে যায়, নিউজ করানোর জন্য একবেলা খেয়ে আসে তাহলে নিজেকে অসম্মানিত করা হবে। তবে তারকাদের বাড়িতে একদমই যেতেন না, তা কিন্তু নয়। কোনো উৎসবে, যেমন সিনিয়র কোনো তারকার ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে, কারো জন্মদিনে অবশ্যই যেতেন। তবে নিউজ করার জন্য কাউকেই বাড়িতে আসতে বলতে পারতেন না। আর সাংবাদিকরা কারো বাড়িতে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন না।

তখনকার সময়ে অধিকাংশ তারকাদের নামকরণ করা হতো। অনেকে বলতেন অভিষেক করানো। চিত্রজগতে নতুন নাম নিয়ে আবির্ভূত হতেন তারকা। শুধু বাংলাদেশে ছিল এ প্রথা তা কিন্তু নয়। বলিউড বা টালিউডেও ছিল এ নিয়ম। তারকাদের এই নতুন নামকরণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ছিল ম্যাগাজিন বা বিনোদন পত্রিকার ওপর। কখনো কখনো এই নামকরণ হতো কোনো বিনোদন সাংবাদিকের মাধ্যমে। সাংবাদিকদের সঙ্গে তারকার সম্পর্ক গড়ে উঠত পারিবারিক সূত্রে। শুধু নিজের পাবলিসিটির জন্য এবং মিডিয়া জগতে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে তারকারা সাংবাদিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেন। কারণ বিনোদন ম্যাগাজিনে শুধু তারকাদের পরিচিতি বা প্রশংসাপূর্ণ সংবাদ ছাপা হতো না। ছাপা হতো সমালোচনা। সংবাদের প্রথমে তারকার প্রশংসা থাকত ভূরি ভূরি। তবে এখানেই শেষ নয়। প্রথম বার যদি কোনো তারকার প্রশংসাপূর্ণ নিউজ ছাপা হতো। পরের সংখ্যায় হয়তো তার দোষ বা সমালোচনা ছাপা হতো। এখানেও কিন্তু শেষ ছিল না। সমালোচনা ছাপা হওয়ার পর পত্রিকা অফিসে বা সাংবাদিকের কাছে পৌঁছে যেতেন তারকা। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে যেন তার বিরুদ্ধে কোনো খারাপ নিউজ ছাপা না হয়। আর সেসময় একটা নিউজ মানে তারকাখ্যাতি বিড়ম্বনা।

তারকা সাংবাদিকের যতই কাছের হোক, নিউজ ছাপানোর সময়ে তারা ভুলে যেতেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তখন তারা শুধুই সাংবাদিক। তবে শুধু প্রশংসা বা সমালোচনা দিয়ে পত্রিকার পাতা সাজানো হতো না। বিশেষ সংখ্যায় থাকত সংবাদ পর্যালোচনা। যার মাধ্যমে তারকার ভুলগুলো তুলে ধরা হতো। এমনকি তারকার পরবর্তী দিকনির্দেশনাও ছাপা হতো। তার মাধ্যমে তারকারা নিজেদের ভুল শুদ্ধি করতেন।

সময় বদলে গেছে। এখন বাংলাদেশের সব দৈনিক পত্রিকায় একটা করে বিনোদন পেজ থাকে। যাতে প্রতিদিনের সংবাদ ছাপা হয়। এছাড়া সপ্তাহের একটি দিনে আলাদা করে অতিরিক্ত এক পৃষ্ঠা বা দুই পৃষ্ঠা বিনোদনের সব খবর ছাপা হয়। বেড়েছে দৈনিক পত্রিকা, সেই সঙ্গে বেড়েছে বিনোদন সাংবাদিক। দেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সংখ্যা প্রতিবছর বেড়েই চলেছে। আর টেলিভিশনের দর্শকদের বিনোদন চাহিদা পূরণ করতে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন তারকা। তাই বিনোদন সাংবাদিকরা এখন আর শুধু চিত্রজগতের খবর নিয়ে ব্যস্ত নন। আছে অডিও বাজারের খবর। শুধু তা-ই নয়, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিজ্ঞাপন মডেলদের সংবাদও বেশ সমাদৃত।

সময় বদলে গিয়ে শুধু চ্যানেল বেড়েছে, তারকা বেড়েছে তা-ই নয়। বদলে গেছে তারকা ও সাংবাদিকের সম্পর্ক। বর্তমানে বিনোদন সাংবাদিক যেমন তাঁর পেশাগত দিক বদলেছেন, তেমনি বদলেছে তারকাদের মনোভাব। মাঝে-মাঝে এমন সব নিউজের হেডলাইন চোখে পড়ে, যা পড়ে রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়। অধিকাংশ নিউজের হেডলাইন কুরুচিপূর্ণ। যা আসলে ক্রিয়েটিভিটি'র প্রকাশ পায় না। অথচ চাইলেই একটা সুন্দর হেডলাইন দিতে পারে। নিউজ লেখার কিছু নিয়মকানুন আছে, যা বর্তমান কিছু বিনোদন সাংবাদিকের মধ্যে অনুপস্থিত।

বর্তমান সময়ে অনেক সাংবাদিককে দেখা যায়, যে ব্যক্তির বা তারকার সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছেন তাঁর সম্পর্কে তিনি ন্যূনতম ধারণা রাখেন না। অফিস তাকে অ্যাসাইনমেন্ট করছেন, আর তিনিও কাগজ-কলম বা ক্যামেরা নিয়ে চলে যাচ্ছেন। এই বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। সিনিয়র বা জুনিয়র যে কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হলে প্রথমে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। এর জন্য প্রত্যেক পত্রিকা বা চ্যানেলে আর্কাইভ বা স্টাডি রুম আছে। একটু কষ্ট করে স্টাডি করলে কাউকেই বিব্রত হতে হয় না। যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তিনি পাবেন বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্ন। আর সাংবাদিক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে পেয়ে যাবেন সুষম উত্তর।

সাংবাদিকতা শুধু কাগজে-কলমে শিক্ষার বিষয় নয়। এটা অনেকটা নিজস্ব চিন্তাভাবনারও বহিঃপ্রকাশ। বর্তমানে অনেক সাংবাদিককে দেখা যায়, কেউ কেউ তারকাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এটা শুধু সম্পর্কের মধ্যেই আটকে থাকে না। তার বহিঃপ্রকাশ হয় নিউজের মাধ্যমে। অর্থাৎ এক পত্রিকায় তারকার যে বিষয় নিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে। অন্য পত্রিকায় সেই তারকার প্রশংসা ছাপা হচ্ছে। এতে পাঠক পড়ে যান বিভ্রান্তিতে। অনেক সময় বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের ভিত্তিতে পাঠক বা দর্শক বিনোদন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

শুধু একজন বিনোদন সাংবাদিক এ বিষয়ের জন্য দায়ী, তা কিন্তু নয়। একজন তারকা কম দায়ী নন। বর্তমান তারকারা পরিচালক বা সাংবাদিকের ওপর নির্ভরশীল নন। অধিকাংশ তারকার জন্ম হচ্ছে কোনো না কোনো চ্যানেল বা বিজ্ঞাপন সংস্থা বা বড় বড় কোম্পানির মাধ্যমে। এসব তারকা মনে করেন, তারকাদের নিউজ করাই হচ্ছে সাংবাদিকদের পেশা। এ কারণে পারস্পরিক সম্মানের জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক তারকা কিছু সাংবাদিকদের মাঝে-মাঝে বাড়িতে ডেকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে কিছু গিফট এবং মানি দিয়ে থাকেন। যে কারণে সাংবাদিকরা চোখের সামনে দেখেও তারকাদের অন্যায় দেখতে পান না। আবার যেসব তারকা এই নীতি না মানেন তারা পড়ে যান সাংবাদিকের রোষানলে। এই প্রথায় সাংবাদিকরা যেমন জিম্মাদার হয়ে পড়ছেন, তেমনি তারকারা হয়ে ওঠছেন স্বেচ্ছাচার।

একবার এক সাক্ষাৎকারে কলকাতার বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণা ঘোষ বলেছিলেন, একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী যখন মিডিয়াতে আসেন তখন তার মাথায় ছাতা ধরা হয়। এর অর্থ হচ্ছে যাতে তার মেকাপ নষ্ট হয়ে না যায়। কিন্তু সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী পরবর্তী সময়ে এটাকে ট্র্যাডিশন হিসেবে নেন। তিনি ধরেই নেন তার প্রাপ্য সম্মানে এ কাজটি করা হচ্ছে। আর গণ্ডগোলটা হয় সেখানেই। এই ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে যারপরনাই দাপুটে হয়ে ওঠেন। নিজের প্রভাব খাটান পুরো মিডিয়া তথা সমাজের ওপর। প্রথমে প্রোডাকশন বয়, তারপর অন্যান্য ইউনিট সহকর্মী থেকে ডিরেক্টরকেও বাদ দেন না। অন্ধ হয়ে পড়েন মিডিয়াতে নিজের অবস্থান সম্পর্কে। তিনি দিনের বেলা স্বপ্ন দেখতে থাকেন, তার চারিপাশে যারা কাজ করেন তারা প্রত্যেকেই কর্মী, শুধু তিনিই অভিনেত্রী। এমনকি প্রত্যেকেই তার সেবায় সর্বদা নিয়োজিত।

বিনোদন সাংবাদিকদের সবচেয়ে পুরোনো সংগঠন 'বাচসাস'। এবছর এই সংগঠনের ৫০ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী সংগঠনে এখনো রয়েছেন সেইসব প্রথিতযশা সাংবাদিক। যারা বিনোদন সাংবাদিকতার সুন্দর ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন। আশা করি, বর্তমানে বিনোদন সংবাদের সঙ্গে জড়িত সব সাংবাদিক নিজের অবস্থান সম্পর্কে সোচ্চার হবেন। তারা যেন কোনো তারকার জিম্মাদারি হয়ে না থাকেন। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ থেকে কখনোই যেন পিছপা না হন।

লেখক: সাহিত্যিক-সাংবাদিক, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক

বিনোদন সাংবাদিকতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রাধান্য

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

পেশাদার মনোভাব নিয়ে সাংবাদিকতায় বিনোদন বিষয় হয়েছে ষাটের দশকে। তখন এ সাংবাদিকতা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা বা সংস্কৃতি সাংবাদিকতা হিসেবেই চিহ্নিত হয়। আশির দশক থেকে সাংবাদিকতায় তারকাপ্রথা জেঁকে বসতে শুরু করে। ষাট থেকে আশির দশক এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে প্রধান বিনোদন সিনেমা। বিনোদনে তারকাপ্রথা থাকলেও সুলভ টেকনোলজির অভাবে সাংবাদিকতায় তারকানির্ভরতা সহজ ছিল না। প্রথম পর্যায়ে ব্লক করে ছবি ছাপতে হয়েছে। পরে অফসেট পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয়েছে ছবির পজিটিভ করা। নব্বইয়ের দশক থেকে প্রিন্ট টেকনোলজি আরো এক ধাপ এগিয়ে যায় ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ের কল্যাণে। সাংবাদিকতায়ও ধীরে ধীরে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বাড়তে থাকে উপস্থাপনার বৈচিত্র্যের কারণে।

একবিংশ শতকে সাংবাদিকতা বড় ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটে পড়েছে। গণমাধ্যমের করপোরেট মালিকানা, মুনাফার লক্ষ্যে পাঠকের অধিকার খর্ব, নৈতিকতায় ধস, সাংবাদিকতার শত বছরের ঐতিহ্য কল্যাণকামিতার সাথে আপস– এসব কারণে মানুষ সংবাদপত্র, টেলিভিশন বা অনলাইন পোর্টালের খবর সহজে বিশ্বাস করতে চান না। আর আজকের বিনোদন সাংবাদিকতাও গণমাধ্যমের মুনাফা অর্জনের অংশীদার। বিনোদনের বিষয়ভিত্তিক গভীরতার চেয়ে বাজার কাটতি ব্যক্তিনির্ভরতাই ভর করেছে এ ক্ষেত্রটিতে। সাংবাদিকতার মৌলিক উপাদান দায়িত্বশীলতার অভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে বিনোদন সাংবাদিকতার শুরু চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে। তবে অবাক করা ব্যাপার হলো,

পেশাদার মনোভাব নিয়ে সাংবাদিকতায় বিনোদন বিষয় হয়েছে ষাটের দশকে। তখন এ সাংবাদিকতা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা বা সংস্কৃতি সাংবাদিকতা হিসেবেই চিহ্নিত হয়। আশির দশক থেকে সাংবাদিকতায় তারকাপ্রথা জেঁকে বসতে শুরু করে

বাণিজ্যিকভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ না হতেই এ বিষয়ক পত্রিকা আমরা পেয়েছি। বাংলাদেশের প্রথম বিনোদন পত্রিকার নাম সিনেমা, প্রকাশিত হয়েছিল বগুড়া থেকে। কিছুটা কলকাতার উল্টো রথ, জলসার অনুসরণে এটি পাঠকের কাছে পৌঁছায় ১৯৫০ সালে। পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত অন্যান্য বিনোদন পত্রিকাও ছিল ম্যাগাজিন আকারে এবং ওই উল্টো রথ, জলসার ধারায়। আর সূচি ছিল প্রায় একই ধরনের। ঘটনানির্ভর সংবাদই ছিল বেশি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখা ছিল মূলত সাক্ষাৎকার বা কখনো মানবিক রিপোর্ট। (চিন্ময় মুৎসুদ্দী (২০০৭)। সংস্কৃতি সাংবাদিকতার স্বরূপ। ঢাকা, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট। পৃ.২৬)।

খবর যদি হয় কোনো ঘটনার বিবরণ, তাহলে সংস্কৃতি সাংবাদিকতা শিরোনামে যে খবর সংবাদপত্রে ছাপানো হয়, সেটা হবে সংস্কৃতিবিষয়ক কোনো ঘটনার বিবরণ। এখন এই সংস্কৃতিবিষয়ক ঘটনা কোনগুলো। সংবাদপত্র বা ই-মিডিয়ায় সংস্কৃতি সংবাদের শিরোনামে যে ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় সেসব মূলত নৃত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নাট্য আর চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক। এর মাঝে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত খবরের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করলে দেখা যায়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বিষয় হলো চলচ্চিত্র উৎসব ও প্রদর্শনীবিষয়ক, পুরস্কার ও পদকবিষয়ক, চলচ্চিত্রবিষয়ক, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, আলোচনা, মতবিনিময় ও সেমিনারবিষয়ক, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড ও ছাড়পত্রবিষয়ক, চলচ্চিত্রশিল্পী, পরিচালক ও কলাকুশলীবিষয়ক, চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এফডিসি) বিষয়ক, চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সংগঠনবিষয়ক, নতুন চলচ্চিত্র মুক্তি ও শুটিংবিষয়ক।

সংস্কৃতি সাংবাদিকতায় (এখন যা বিনোদন সাংবাদিকতা হিসেবেই উল্লিখিত হয়) আশির দশক পর্যন্ত ছিল চলচ্চিত্রের দাপট। মূলত সাংবাদিকতার এই ক্ষেত্রটি চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা হিসেবেই ছিল পরিচিত। ১৯৮৬'র পর টেলিভিশন মাধ্যমটি সংস্কৃতি সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করলে ফলাফল দাঁড়ায় খবরবিষয়ক, খবর ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানবিষয়ক, প্যাকেজ অনুষ্ঠানবিষয়ক, নতুন চ্যানেল উদ্বোধন ও চ্যানেল বন্ধবিষয়ক, মামলাবিষয়ক, যান্ত্রিক ত্রুটিবিষয়ক, প্রশাসনিক, টিভি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক, শিল্পী, পরিচালক ও কলাকুশলীবিষয়ক, এক চ্যানেলের বিরুদ্ধে আরেক চ্যানেলের অভিযোগবিষয়ক, টিভিবিষয়ক, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, আলোচনা, মতবিনিময়, সেমিনারবিষয়ক ও অন্যান্য।

চিত্রকলাবিষয়ক রিপোর্ট সাধারণত প্রদর্শনীকেন্দ্রিক। শিল্পীর পরিচিতি আর প্রদর্শিত ছবির শিরোনাম ও তালিকাই এতে প্রাধান্য পায়। নির্দিষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় দু'একটি সংবাদপত্রে, তা-ও ক্ষেত্রবিশেষে। কোনো কোনো সংবাদপত্র প্রদর্শনী শিরোনামে চিত্রকলা ও আলোকচিত্র সম্পর্কে মাঝেমধ্যে থিমেটিক আলোচনা প্রকাশ করে বিষয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রও আমাদের সংস্কৃতি সাংবাদিকতায় ঠাঁই করে নিয়েছে। এটাও সাধারণত প্রদর্শনীভিত্তিক। এই বিষয়ে খবরও আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তাদের ভাষণ এবং প্রদর্শনীর বর্ণনা। বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় খুব কম।

উল্লিখিত বিষয়ভিত্তিক রিপোর্ট আবার বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়। যেমন শিল্পী, পরিচালক ও কলাকুশলীবিষয়ক রিপোর্ট হতে পারে সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন, পরিচিতিমূলক প্রতিবেদন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ইত্যাদি।

শুরুতে চলচ্চিত্রনির্ভর সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত হতো সপ্তাহে একদিন। নতুন শতকে এখন প্রতিদিন বিনোদন পাতা বের হয়। বিনোদন বিভাগের রিপোর্টে এটা স্পষ্ট যে বিনোদন সাংবাদিকতায় বর্তমানে ব্যক্তিভিত্তিক সংবাদই প্রাধান্য পাচ্ছে। ক্ষেত্র হিসেবে সাপ্তাহিক বিভাগীয় পাতাগুলোতে রয়েছে টেলিভিশনের প্রাধান্য। এ ছাড়া চলচ্চিত্র, গ্রুপ থিয়েটার, ঢাকার বাইরের মঞ্চ, আবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো রিপোর্ট, ফিচার ও সাক্ষাৎকার হিসেবে সূচিতে থাকছে। এছাড়া আছে ঘটনার রিপোর্ট। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা বা নিবন্ধ তৃতীয় বা চতুর্থ বাছাই হিসেবে স্থান পায় দীর্ঘ বিরতিতে।

বিনোদন বিভাগে প্রকাশিত সংবাদের বাইরে অন্য পৃষ্ঠায় সংস্কৃতি সংবাদ শিরোনামেও কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয় মাঝেমধ্যে, যা মূলত অনুষ্ঠানভিত্তিক। একই ধরনের সংবাদ আবার কখনো কখনো বিনোদন বিভাগেও চলে যায়। এক্ষেত্রে সম্পাদকীয় নীতিমালা স্পষ্ট নয়। শোক সংবাদও বিনোদন বিভাগে স্থান করে নেয়! চলচ্চিত্র, টিভি বা মঞ্চ সংশ্লিষ্ট খ্যাতিমান ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ বিনোদন বিভাগেই দেখা যায়। (চলে গেলেন শাম্মী আখতার, প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ পৃ. ১৫)।

নব্বই দশক পর্যন্ত সংস্কৃতির আলাদা পাতা সব দৈনিকেই পাওয়া যেত সপ্তাহে একদিন, অনেকেই বৃহস্পতিবার, কেউ কেউ ভিন্ন কোনোদিন। এখনও প্রায় সব দৈনিকেই সাপ্তাহিক সংস্কৃতি বিভাগটি প্রকাশিত হয় বৃহস্পতিবার আলাদা ক্রোড়পত্র হিসেবে বা পাশাপাশি দুই পৃষ্ঠায়। এটি অনেকদিনের ঐতিহ্য। যখন রোববার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল, তখনও বিভাগটি বৃহস্পতিবারেই প্রকাশিত হতো।

সাপ্তাহিক বিভাগগুলোর নামেও এখন বিনোদনেরই প্রাধান্য:

আনন্দ বিনোদন	ইত্তেফাক (একসময় এই বিভাগের নাম ছিল রূপবাণী)
রঙের মেলা	কালের কণ্ঠ
আনন্দকণ্ঠ	জনকণ্ঠ
আনন্দ	প্রথম আলো
Arts and Entertainment	Daily Star (প্রতিদিনের মতো; আগে ছিল Culture)
Time out	New Age (প্রতিদিনের মতো)
তারা ঝিলমিল	যুগান্তর

ষাট থেকে সত্তর দশকে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এক বা দুই পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক সংস্কৃতি বিভাগে বিষয়ভিত্তিক একটি রচনা প্রায়ই থাকত, যে রচনা ছিল পাঠককে সংস্কৃতির কোনো একটি ক্ষেত্রে আলোকিত করার প্রয়াস। এখন ব্যক্তিনির্ভরতা অনেক বেশি সরাসরি। আগে ছিল রিপোর্টের সাপোর্ট হিসেবে তারকার বক্তব্য। এখন তারকার বক্তব্যই রিপোর্টের মূলভিত্তি।

৪০ বছর আগেও সংবাদ বাছাইয়ের মূল নীতিমালাও অনেকটা এরকমই ছিল। তবে ব্যক্তিপ্রাধান্য এতটা ব্যাপক ছিল না ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থাকলেও। সমসাময়িক ঘটনার খবর নিয়ে (সিলেটে দায়ীকে ১৮.৪.১৯৬৩ ফিল্মিস্তান-দৈনিক আজাদ) রিপোর্ট, একটি বড় নিবন্ধ, মাঝেমধ্যে কিছুটা দীর্ঘ তারকা পরিচিতি (গ্রেটা গার্বো, ফিলিস্তান- দৈনিক আজাদ, ১৪ মার্চ ১৯৬৩) সংস্কৃতি বিভাগের উপাদান হিসেবে এসেছে। সারা সপ্তাহের সিনেমা ও নাটক সংক্রান্ত সব হার্ড ও সফ্ট খবর সাপ্তাহিক বিভাগের জন্য জমা করে। সপ্তাহে একদিন সেসব ছাপা হতো ওই বিভাগীয় পাতায়। যে কারণে 'বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সেলজেনিক পুরস্কার' বা 'ভারতে ফিল্ম এক্সপোর্ট করপোরেশন' প্রতিষ্ঠার খবর সংক্রান্ত রিপোর্ট রেখে দেওয়া হতো সাপ্তাহিক পাতার জন্য। (ফিল্মিস্তান, দৈনিক আজাদ, ৩০ মে ১৯৬৩)।

সেই সময়ের সাপ্তাহিক বিভাগের একটি সংখ্যার শিরোনামগুলো ছিল এরকম (ফিল্মিস্তান, আজাদ, ২১ মার্চ ১৯৬৩):

চীন ও পাশ্চাত্যের রঙ্গমঞ্চ (বড় নিবন্ধ)/ নতুন ব্রিটিশ ছায়াছবি টেল [টেইলস] অব টেরর/মেরিলিন/সিংহলে লোলো ব্রিজিডা/সুরাইয়ার ছাড়পত্র লাভ/সামথিং গট টু গিভ ছবিতে ডোরিস ডে/পাইন উডের সম্প্রসারণ/দ্য লঙ্গেস্ট ডের অস্কার মনোনয়ন লাভ/ব্রিটেনে চলচ্চিত্র দর্শকের সংখ্যা হ্রাস/ব্রিজিত বার্দোর নতুন ছবি/কুয়ালালামপুরে উইলিয়াম হোল্ডেন/ নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় উদ্বোধন/ ঢাকা স্টুডিও সংবাদ।

চিত্রালীর আত্মপ্রকাশের হিসাবে সংস্কৃতি সাংবাদিকতার প্রায় ৬৪ বছর চলছে। এই সময়ে সংবাদপত্রের কারিগরি ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উন্নত ছাপার মেশিনের পাশাপাশি ৯ দশকে কম্পিউটার প্রযুক্তি সংবাদপত্রের জন্য বিপ্লবী পরিবর্তন। হাতের মনো থেকে লাইনো পেরিয়ে এখন কম্পিউটারের কিবোর্ড শব্দবিন্যাস ও ছবির প্রসেস করে দিচ্ছে।

নতুন শতাব্দীতে এসে প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রতিদিন ৪ থেকে ৮ পৃষ্ঠা রঙিন ছাপা হয়। বিনোদন ম্যাগাজিনগুলো ক্রমে পুরোটাই রঙিন অবয়বে চলে যাবে। এরই মধ্যে কেউ কেউ ৮ ফর্মা রঙিন করে ফেলেছে। দৈনিকের বিভাগগুলো প্রকৃতপক্ষে গাইড হিসেবেই কাজ করছে। কখন কী হবে এবং যা হবে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। পাঠকের জন্য এই ধরনের গাইডের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে টিভি চ্যানেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়। এই গাইড আবার বাংলাদেশের চ্যানেল এবং ভারতের বিনোদন চ্যানেলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জি বাংলা, জি সিনেমা, স্টার জলসা, সনি ম্যাক্স থাকলেও কদাচিৎ কেউ উল্লেখ করে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট বা হিস্ট্রি চ্যানেলের কথা।

বিনোদন সাংবাদিকতার আরেকটি সাম্প্রতিক প্রবণতা ব্যক্তির নামের আগে বিশেষণের ছড়াছড়ি। বাঙালি সম্ভবত বিশেষণপ্রিয় জাতি। তারা পরিচিত ব্যক্তিদের নামে ডাকার চাইতে বিশেষণে ডাকে অথবা নামের আগে বিশেষণ যোগ করতে খুবই ভালোবাসে। রাজনীতি থেকে নৃত্য-গান-নাটক সর্বত্রই এই প্রবণতা। অনেকে সুভাষ বসুর নামই জানেন না হয়তো কিন্তু নেতাজীকে চেনেন। এ কে ফজলুল হকের নাম তো শেরেবাংলা বিশেষণের প্রভাবে হারিয়েই গেছে। একইভাবে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী হারিয়ে গেছেন মহাত্মা

গান্ধী বা বাপুজীর আড়ালে। রবীন্দ্রনাথকে কবিগুরু বা গুরুদেব, নজরুলকে বিদ্রোহী কবি না বললে অনেকেই স্বস্তি পান না। এসবের দেখাদেখি ছোটবড় অনেকেই এ রকম বিশেষণে বিশেষায়িত হচ্ছেন। রাজনীতি ও সাহিত্যের বাইরে নাচ-গান-নাটকের পারফরমাররা মিডিয়ার সঙ্গে যোগসাজশে এখন বেশি বিশেষায়িত হচ্ছেন। বিশেষণ ব্যবহারে মিডিয়ার উদারতা সীমাহীন। চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজ্জাকের নামের আগে লেখা হয় নায়করাজ রাজ্জাক। কোনো সময় সাপ্তাহিক চিত্রালীতে লেখা হয়েছিল শব্দটি, আর সেটাই স্থায়ী বিশেষণ হয়ে গেল! এর আদলে নামের সঙ্গেই রাজ জুড়ে দিয়েছেন কেউ কেউ, যেমন আলীরাজ, বাপ্পারাজ। এর মানে কী? সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম এক সাপুড়ে নিজের বিশেষণ দিয়েছেন সর্পরাজ। এরই বা মানে কী? অভিনেতা-অভিনেত্রী ও গ্রুপ থিয়েটার কর্মীরা নিজেরাই নিজেদের সাধারণ বিশেষণ দিয়েছেন নাট্যজন। একসময় বলা হতো নাট্যকর্মী, নাট্যশিল্পী, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ইত্যাদি। এতে তাদের চিহ্নিত করা সহজ ছিল। এখন নাট্যজন বলে একটা শব্দ চালু হয়েছে। নাট্যজগতের সকলেই তাদের নামের আগে নাট্যজন ব্যবহারে আগ্রহী। মিডিয়াও কোনো বাছবিচার না করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রায় সকলের নামের আগেই তা জুড়ে দেয়। এতে ভালো-মন্দ চেনার উপায় থাকছে না, যথার্থ পরিচয় জানাও কঠিন হয়ে পড়ছে।

অতি উৎসাহের কারণে মাঝে মাঝে শিরোনামে রিপোর্টের ভুল নির্যাস তুলে ধরা হয়। নিচে উদ্ধৃত রিপোর্টে বলা হয়েছে *মাতিয়ে গেলেন বাঙালিদের*, কিন্তু শিরোনামে বলা হচ্ছে লন্ডন মাতালেন:

লন্ডন মাতালেন রুনা লায়লা মমতাজসহ তারকারা

তারেক চৌধুরী লন্ডন থেকে: সাংস্কৃতিক সংগঠক কাউন্সিলা'র শাহেদ আলীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিংবদন্তি শিল্পী রুনা লায়লা ও ফোক সম্রাজ্ঞী মমতাজসহ নামকরা তারকারা মাতিয়ে গেলেন বাঙালিদের। রোববার ওয়েম্বলি অ্যারেনায় ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস বিতরণ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন বাংলাদেশের সংগীত আর অভিনয় জগতের তারকারা। অনুষ্ঠানের মাঝামঝি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেয়ার জন্য মঞ্চে ডাকা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী রুনা লায়লাকে। তখন তার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন বাঙালির আরেক গর্ব হাউস অব লর্ডস'র একমাত্র বাংলাদেশি সদস্য ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন। তারপর উপস্থাপিকা ব্রাউনিয়া ও দর্শকদের অনুরোধে একে একে চার চারটি গান গেয়ে শোনান রুনা লায়লা। তার আগে কুমার বিশ্বজিৎ তার জনপ্রিয় গান 'ও ডাক্তার' গেয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন। মমতাজ তার স্বভাবসুলভ অঙ্গভঙ্গী দিয়ে 'খাইরুন' ও 'ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেলো গো মরার কোকিলে' গেয়ে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেন। (আমার দেশ, ২৮ জুলাই ২০০৬; পৃ. ১৬)।

বাংলাদেশের গায়ক-গায়িকা লন্ডন, নিউইয়র্ক বা অন্য কোনো বড় শহরে গান পরিবেশন করেছেন এই খবর শুনেই ঢাকায় অনেকে লিখেছেন, 'অমুক আমেরিকা মাতালেন', 'তমুক লন্ডন মাতালেন'। এদের অনেকেই সেসব অনুষ্ঠান না দেখেই এভাবে লিখে ফেলতেন। সত্তরের দশকে শুরু হওয়া এই প্রবণতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই সব রিপোর্টে লন্ডন, নিউইয়র্ক মাতালেন বলে যে দৃশ্যকল্প তুলে ধরা হয়, তা আসলে একেবারেই ভিত্তিহীন। এই সব অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাতালেন বললেও কিছুটা গ্রহণযোগ্য হয়। রয়েল অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠান করলেও 'লন্ডন মাতালেন' বলাটা যথার্থ নয়। লন্ডন 'হাতের তালুর' সমান কোনো শহর নয়। এখানে একটি হলে অনুষ্ঠান করলে তাই বলা যায় না 'লন্ডন মাতালেন'।

তাছাড়া এসব অনুষ্ঠানে কেবল প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমাবেশ ঘটে। একমাত্র রুনা লায়লার কয়েকটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশিদের সঙ্গে প্রবাসী পাকিস্তানি ও ভারতীয় 'কিছু' ট্যাক্সি ড্রাইভার শামিল হয়েছেন বলে শোনা যায়। আমি নিজে লন্ডন, নিউইয়র্ক শহরে এ ধরনের একাধিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। এসব অনুষ্ঠান মূলত *এথনিক মাইনরিটি* গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান হিসেবেই চিহ্নিত হয় সেই সব দেশে। বাংলাদেশি সম্প্রদায়ই এসবের দর্শক-শ্রোতা। একবার তো এক পত্রিকায় শহর ছাড়িয়ে গোটা 'আমেরিকা মাতিয়ে' ফেলেছেন বাংলাদেশের অমুক গায়ক-গায়িকা বা তমুক অভিনেতা-অভিনেত্রী এমন কথা বলা হলো। কী ভয়ংকর ভুল তথ্যপ্রবাহ! এ ধরনের 'ভক্ত সাংবাদিকতা' সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকতার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং আলাদাভাবে সংস্কৃতি সাংবাদিকতা এতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

মিডিয়ার আরেকটি প্রবণতা হলো তারকাখ্যাতি পাওয়া চলচ্চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাউকে কাউকে কিংবদন্তি বা কিংবদন্তিতুল্য বলে উল্লেখ করা। নিজ নিজ ক্ষেত্রে কারো অসামান্য অবদান থাকলে তাকে কিংবদন্তি বলা বাংলা ভাষায় চালু আছে অনেক বছর ধরে। তাই বলে ষাটের

> *নতুন শতাব্দীতে এসে প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রতিদিন ৪ থেকে ৮ পৃষ্ঠা রঙিন ছাপা হয়। বিনোদন ম্যাগাজিনগুলো ক্রমে পুরোটাই রঙিন অবয়বে চলে যাবে। এরই মধ্যে কেউ কেউ ৮ ফর্মা রঙিন করে ফেলেছে। দৈনিকের বিভাগগুলো প্রকৃতপক্ষে গাইড হিসেবেই কাজ করছে। কখন কী হবে এবং যা হবে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। পাঠকের জন্য এই ধরনের গাইডের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে টিভি চ্যানেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়*

নিচে কর্মজীবনে সচল কোনো পারফরমারকে কিংবদন্তি বলার যৌক্তিকতা কোথায়? তাছাড়া কিংবদন্তি শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী এটি ব্যবহারে কোনো ইতিবাচক মাত্রা যোগ করে না। অতি ব্যবহারের প্রভাবে যদিও কিংবদন্তি শব্দটির ভুল প্রয়োগের মধ্যেই একটা নির্দিষ্ট অর্থ বা চিত্র খুঁজে নেয় বাঙালি পাঠক।

বর্তমান সময়ের সাপ্তাহিক 'সংস্কৃতি' বিভাগ ৪ পৃষ্ঠায় প্রায় ১৬টি শিরোনাম ও আরো কিছু উপশিরোনাম নিয়ে দৈনিক সমকাল'র নন্দন (২৭ জুলাই ২০১৭), ১৪টি শিরোনাম ও আরো কিছু উপশিরোনাম নিয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠের রঙের মেলা (২৭ জুলাই ২০১৭), ৩৫টি শিরোনাম ও আরো কিছু উপশিরোনাম নিয়ে ইত্তেফাকের *আনন্দ বিনোদন* (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৪) এবং ৩১টি হেডিং ও আরো কিছু সাব হেডিং নিয়ে প্রথম আলোর *আনন্দ (১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪)* যেন এক মিনি ম্যাগাজিন। পৃষ্ঠার হিসাবে বিনোদন ম্যাগাজিন ১৫ দিনে ৬৪ পৃষ্ঠা নিয়ে একবার হাজির হচ্ছে। আর দৈনিক পত্রিকা এক সপ্তাহে আসছে ম্যাগাজিনের ১৬ পৃষ্ঠা নিয়ে। প্রতিদিনের এক পৃষ্ঠা হিসাবে নিলে আরো ২৪ পৃষ্ঠা যোগ করা হয়। অর্থাৎ এক সপ্তাহে দৈনিকগুলো ম্যাগাজিনের ৪০ পৃষ্ঠা উপস্থাপন করছে, পনের দিনের হিসাবে যা ৮০ পৃষ্ঠা। পাক্ষিক বিনোদন ম্যাগাজিনগুলোর চেয়ে প্রায় ১৬ পৃষ্ঠা বেশি! সেদিক থেকে বিনোদন ম্যাগাজিনগুলো দৈনিকের সঙ্গে এক বড় ধরনের প্রতিযোগিতায় পড়েছে। দৈনিক পত্রিকার বিনোদন বিভাগগুলোই এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ফলে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের বিনোদন সাপ্তাহিকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত চিত্রালীসহ পূর্বাণী, চিত্রাকাশ, সিনেমা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সর্বময় দাপট দৈনিকের।

বিনোদন এবং তারকানির্ভরতাই এখন সংস্কৃতি সাংবাদিকতার মূল স্রোত। ৭ দশক পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকার চলচ্চিত্র পাতাগুলো তারকাপ্রধান ছিল না,

চলচ্চিত্র, নাটক এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাযুক্ত নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ করত। মাঝেমধ্যে দু'একটি এরকম নিবন্ধ প্রকাশিত হলেও এই প্রবণতার পরিবর্তন লক্ষ করছি। এখন এসব পৃষ্ঠাও ফ্যান ম্যাগাজিনে পরিণত হয়েছে। ফ্যান ম্যাগাজিন হিসেবে প্রভাবশালী চিত্রালী, পূর্বাণী, চিত্রাকাশ, সিনেমা প্রকাশিত না হলেও সেই অভাব পূরণ করছে দৈনিক পত্রিকার প্রতিদিনের এবং সপ্তাহান্তের বিভাগীয় বিনোদন পৃষ্ঠাগুলো। পাশাপাশি পাক্ষিক বিনোদন ম্যাগাজিনগুলো একইভাবে ফ্যান ম্যাগাজিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে।

সংস্কৃতি জগতের কারো অপরাধ সম্পর্কিত ঘটনার প্রতিবেদন তৈরিতে ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। এইসব রিপোর্ট সংবাদপত্রে বা ই-মিডিয়ায় সংস্কৃতি বিভাগের রিপোর্ট হিসেবে আসেনি, সাধারণ ক্রাইম রিপোর্ট হিসেবেই প্রকাশ পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯৮ সালে সালমান শাহ'র আত্মহত্যার খবর এবং ২০০৩ সালে জয়ন্তী রেজার হত্যার সঙ্গে আফসানা মিমি ও শম্পা রেজার 'সম্পৃক্ততা' বিষয়ক প্রতিবেদন। ২০১৭ সালে অপু বিশ্বাস-শাকিব খানের দাম্পত্য জটিলতার খবর এসেছে দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায়। পাঠক-টানা অর্থাৎ বাণিজ্যিক দিকটাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এই রিপোর্টগুলো একই সঙ্গে অনুসন্ধানী রিপোর্টের চরিত্রও লাভ করে ক্ষেত্রবিশেষে। পেশাগত বিরোধের বা জটিলতার ক্ষেত্রে কাউকে সমিতি শাস্তি বিধান করলে সেটা সংস্কৃতি বিভাগের খবর হিসেবেই প্রকাশ পায়। এটা সাধারণত চলচ্চিত্রাঙ্গনেই ঘটে থাকে। এ বছর শাকিব খানকে বয়কটের খবরটি এ সংক্রান্ত একটি সরকারি সভার বিবরণ প্রকাশ বাদে। (আমাদের সময় ৮ জুন ২০০৬ জুন)।

পত্রিকাগুলোর ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সংস্কৃতি সাংবাদিকতা এখন বিনোদন সাংবাদিকতা। বলতে হবে এতে পরিধি সংকুচিত হয়েছে। সংস্কৃতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করি। সংস্কৃতির অর্থ কী? এই রকম প্রশ্ন করে বদরুদ্দীন উমর বলছেন, 'এ নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক সম্ভব হলেও এর স্বরূপ উপলব্ধির সহজ উপায় সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলোর প্রতি লক্ষ্যপাত করা। যেমন আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত-নৃত্য, সাহিত্য-নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি। এগুলোকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, এগুলো নিত্যকার জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত জীবন-উপভোগের ব্যবস্থা এবং উপকরণের সাথে জড়িত। কোনো জাতির অথবা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলতে এজন্যে তার সামগ্রিক আর্থিক জীবন থেকে শুরু করে ললিতকলা এবং শিষ্টাচার পর্যন্ত সবকিছুই বোঝায়। অর্থাৎ সেই দেশ এবং জাতির অন্তর্গত মানুষদের জীবনযাপন এবং জীবন উপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি এবং আয়োজনই এর অন্তর্গত। কোনো একটি লোকের সংস্কৃতি কী, এ কথা বোঝার জন্য তাই প্রয়োজন তার আর্থিক জীবন, ভাষা, শিক্ষা, রুচি, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবকিছুর সাথে ওয়াকিবহাল হওয়া।' (উমর, বদরুদ্দীন (১৯৬৭)। সংস্কৃতির সংকট। ঢাকা, গ্রন্থনা, পৃ. ১৫-১৬)

এই আলোকে দেখলে বিনোদন সংস্কৃতির একটি উপাদান মাত্র। সংবাদপত্রে এ পরিবর্তনের একটি কারণ দৈনিক পত্রিকায় প্রতিদিনের

66

পত্রিকাগুলোর ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সংস্কৃতি সাংবাদিকতা এখন বিনোদন সাংবাদিকতা। বলতে হবে এতে পরিধি সংকুচিত হয়েছে। সংস্কৃতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করি। সংস্কৃতির অর্থ কী? এই রকম প্রশ্ন করে বদরুদ্দীন উমর বলছেন, 'এ নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক সম্ভব হলেও এর স্বরূপ উপলব্ধির সহজ উপায় সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলোর প্রতি লক্ষ্যপাত করা

99

বিনোদন পৃষ্ঠাতেই পাওয়া গেছে। মাঝেমধ্যে বিনোদনজগতের তারকাদের মৃত্যু সংবাদ বিনোদন পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়। বিনোদন সাংবাদিকতা এখানে বিনোদনের সীমানা অতিক্রম করে। শোক সংবাদ তো আর বিনোদনের অংশ নয়!

দৈনিক পত্রিকায় এখন প্রতিদিন বিনোদন বিভাগ থাকে। এখানে মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংবাদ দেখা যায়। জনপ্রিয় তারকার সংবাদ গুরুত্বহীন হলেও বেশ বড় জায়গা পেয়ে যায়। জয়া আহসানের কলকাতায় বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার প্রাপ্তি দেশে তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া তারকার জন্য তত বড় খবর নয়, যত জায়গা দেওয়া হয়েছে। (প্রথম আলো ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ পৃ. ১৫)।

মিডিয়া বর্তমানে বাণিজ্যিক অবস্থানকেই সাফল্যের মাপকাঠি মনে করছে বলা যায়। সবকিছু মুনাফার আঙ্গিকেই দেখা হচ্ছে। এ কারণে সংখ্যা এবং বহিরাঙ্গন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্বায়নের পরিপ্রক্ষিতে উদার বাণিজ্যের ধাক্কায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনেও নতুন হাওয়া লেগেছে। বিনিয়োগের চেয়ে আমদানিনির্ভরতা হয়ে উঠেছে বেশি আকর্ষণীয়।

নব্য ধনিক শ্রেণির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণে সহায়ক হিসেবেই যেন আবির্ভূত হচ্ছে নতুন নতুন সাংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল এবং রেডিও স্টেশন। এই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে সংবাদপত্র বহিরাঙ্গনে হয়ে উঠেছে স্ফীত ও ঝলমলে। তাই অর্ধেক কাগজ হয়েছে রঙিন আর পৃষ্ঠা সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। কিন্তু বাড়তি পৃষ্ঠা ভরানোর দক্ষ সাংবাদিক গড়ে ওঠার ধীর গতির কারণে কনটেন্ট বা এর বিষয়বস্তু আনুপাতিক হারে এগোয়নি। এগোয়নি বলে জাতীয় সংস্কৃতি নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হলেও সংস্কৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলে কোনো স্থানই পায়নি। শুধুমাত্র সংস্কৃতি/বিনোদন বিভাগ সংযুক্তি। একই সঙ্গে হালকা তথ্য উপস্থাপনে কর্তৃপক্ষের নয়া দৃষ্টিভঙ্গি বা সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন। সাপ্তাহিক বিনোদন বিভাগেও এর প্রভাব বেশি।

ষাটের দশকে দুই পৃষ্ঠার সংস্কৃতি বিভাগে একটি বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ রাখা হতো নিয়মিত। উপরে উল্লিখিত সংস্কৃতির ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে সেটাই যথার্থ। কিন্তু বিনোদনের সাথে যুক্ত করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপন এখন আর নেই। বিনোদন সাংবাদিকতায় গভীরতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

একটি রিপোর্টের সূত্র ধরে বলতে হয় কুইন রহমান কোথায়? ২০০৬ সালের ১৭ জুলাই দৈনিক আমাদের সময় ৫৪৩ শব্দ ব্যয় করলো যার জন্য তিনি কিছুই হলেন না, হারিয়ে গেলেন (মুৎসুদ্দী, চিন্ময়; সংস্কৃতি সাংবাদিকতার স্বরূপ, ২০০৭, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট পৃ.১২১)। 'এটিএন তারকা, তারকাদের তারকা'র কী দুরবস্থা! বিনোদন সাংবাদিকতার গভীরতা কোথায়, এখান থেকেও কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

* কিংবদন্তি মানে n.(noun) a.(adverb) a traditional or familiar report or rumour; hearsay. (Samsad Bengali-English Dictionary. March 1999).

Hearsay n (U) মানে জনশ্রুতি, জনরব, লোকশ্রুতি, কিংবদন্তি, গুজব: This piece of information is no better than ~ (Bangla Academy English-Bengali Dictionary. November 1999)

লেখক: সাংবাদিক

ক্যামেরায় বিনোদন সাংবাদিকতা

খালেদ সরকার

বর্তমান যুগ ডিজিটাল যুগ। এ সময় অনলাইন পোর্টালের প্রতি মানুষের নজর থাকে বেশি। বিশেষ করে বিনোদন সংবাদের ক্ষেত্রে সেটি আরো বেশি প্রযোজ্য। বিনোদন সংবাদকে সবার কাছে সুন্দর করে তুলে ধরার জন্য দিন দিন ছবির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ফটো-সাংবাদিকের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিনোদন সংবাদ পাঠকের কাছে তুলে ধরতে বা অনলাইন পোর্টালটিকে জনপ্রিয় করতে ছবিসমৃদ্ধ ফিচারগুলো বড় ভূমিকা পালন করে।

বিনোদন সাংবাদিকতা হলো সাংবাদিকতার একটি ধারা। যা মূলত বিনোদন ব্যবসা অর্থাৎ টেলিভিশন নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীত এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি ও গণমাধ্যমে প্রকাশ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমকে নির্দেশ করা থাকে। সাংবাদিকতার অন্যতম মাধ্যম হলো আলোকচিত্র সাংবাদিকতা। পাঠকের কাছে কোনো খবর তুলে ধরার জন্য আলোকচিত্র-সাংবাদিকের তোলা ছবি মূল সংবাদের গুরুত্ব অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

বিশেষ করে বিনোদন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ফটো বা আলোকচিত্র সাংবাদিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ছবি ছাড়া বিনোদন সাংবাদিকতা কল্পনাই করা যায় না। বর্তমানে লেখার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ছবিকেই গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবাদকে তুলে ধরার জন্য লেখার চেয়ে ছবির ভূমিকাই বেশি। কখনো কখনো ছবিই সংবাদ তৈরি করে দেয়।

বিনোদন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ফটো বা আলোকচিত্র সাংবাদিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ছবি ছাড়া বিনোদন সাংবাদিকতা কল্পনাই করা যায় না। বর্তমানে লেখার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ছবিকেই গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি

সাধারণ আলোকচিত্র সাংবাদিক আর বিনোদনবিষয়ক আলোকচিত্র সাংবাদিক দু'জনের কাজই ছবি তোলা। কিন্তু বিনোদনবিষয়ক আলোকচিত্র সাংবাদিকতা একটু আলাদা। বিনোদনবিষয়ক আলোকচিত্র সাংবাদিক মূলত গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড বা রুপালি জগতের মানুষদের নিয়েই কাজ করে থাকেন। ক্যামেরা, লাইট আর আশেপাশের পরিবেশের মাধ্যমে তারকাকে আরও সুন্দর করে উপস্থাপন করেন বিনোদনবিষয়ক আলোকচিত্র সাংবাদিক। কোনো 'ডে ইভেন্টে' বিনোদন ফটো-সাংবাদিকেরা কাভার করলে তাঁরা চেষ্টা করেন তারকাদের সৌন্দর্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে। পরের দিনের পত্রিকা বা চলমান অনলাইনে নিউজটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন নিউজের চেয়ে ছবিটাই অনেক বেশি ফোকাস করা হয়। এখনকার বাস্তবতায় এই বিষয়টি আরও বাড়ছে। আর ফিচার আইটেম হলে তো কথাই নেই। বর্তমানে বিনোদন তারকাদের নিয়ে ফিচার মূলত ছবির মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হয়। ফিচারের জন্য তারকাদের ছবি তোলার ক্ষেত্রে রাখতে হয় যত্নের ছাপ। সুপারস্টারদের ছবি তোলার আগে একটু প্রস্তুতিও নিতে হয়। ক্যামেরার ব্যাটারি, মেমোরি কার্ড, ফ্লাশ, ফ্লাশের ব্যাটারি এসব দেখে নিতে হয়। সময়মতো যেতে হয়, ছবি তুলতে যাওয়ার আগে আবার ফোনে কথা বলে আগের সময় নিশ্চিত করে নেয়াও দায়িত্ব। কারণ এমনও হতে পারে, যে তারকার ছবি তোলার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে, তিনি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে আসবেন। তারকার সঙ্গে কথা বলার সময়-সুযোগ থাকলে একেবারে সকাল কিংবা বিকেলের সময় ঠিক করে নেয়া ভালো। অনেক সময় একটি ফিচারে তারকার অনেক ছবি ব্যবহার করতে হয় নিউজটির পৃষ্ঠা আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য।

তারকাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। কেননা, গ্ল্যামার জগতের তারকাদের সঙ্গেই মূলত বিনোদন ফটো-সাংবাদিকদের কাজ।

বিনোদন ফটো-সাংবাদিকতা ও পাপারাজ্জি

বিনোদন ফটো-সাংবাদিকতায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পাপারাজ্জি। পাপারাৎসি ইংরেজি শব্দ। যা পাপারাজ্জি নামেও পরিচিত। এটি মূলত একটি বহুবচন শব্দ। এর উৎপত্তি ইতালীয় একবচন শব্দ paparazzo থেকে। শব্দটি দ্বারা এমন সব আলোকচিত্রীকে বোঝানো হয়, যারা নির্দিষ্ট কোনো মঞ্চ বা অনুষ্ঠান ছাড়া তারকাদের অসচেতন ও ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি তোলেন। তাঁরা এমন সময় ছবি তোলেন যখন, তারকারা চান না এই ছবিগুলো কেউ তুলুক বা বাইরের জীবনে প্রকাশিত হোক। যেমন: তাঁরা যখন দোকানে বা মার্কেটে খাওয়া-দাওয়া করেন বা সমুদ্রসৈকতে অবকাশযাপন করেন ইত্যাদি। এটি কোনো সংবাদমাধ্যমের নিজস্ব আলোকচিত্র গ্রহণের স্থান নয়, যেমনটা হয়ে থাকে কোনো প্রেস কনফারেন্স বা লাল গালিচা সংবর্ধনার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে তারকারাও চান, তাঁদের ছবি সেখানে তোলা হোক। বিনোদন সাংবাদিকতায় এ ধরনের ছবি বেশি তোলা হয়। বিনোদন সাংবাদিকদের জন্য এটা একধরনের কৌশল। কিন্তু তারকারা চান না একটা তাঁরা করুক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোতে এ ধরনের সাংবাদিকদের দেখা যায়। বিশেষ করে হলিউড, বলিউডে। রাজপরিবারে সদস্যদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় পাপারাজ্জিদের তোলা ছবি প্রকাশ পায়।

পাপারাজ্জিদের হাত থেকে বাঁচতে তারকারা নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। পাপারাজ্জিরা একদিকে তারকাদের জীবনে একধরনের উৎপাত হিসেবে স্বীকৃত হলেও গোপনে তাদের তোলা সেই সব ছবি প্রকাশ পেলে অনেক সময় তারকাদের খ্যাতিও বাড়িয়ে দেয়।

২০১০ সালে শাহরুখ খান বাংলাদেশে আসেন। আমি জানতে পারলাম অন্য এক মাধ্যম থেকে, তারপর থেকে লেগেছিলাম তাঁর পেছনে। সেদিন সকালে চলে গেলাম এয়ারপোর্টে ভিআইপি গেটে। বসে থাকলাম অনেকক্ষণ, তাঁর বিমান অবতরণ করল দুপুরে। অপেক্ষা করতে থাকলাম তাঁকে দেখামাত্র ছবি তুলতে থাকব। কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না। তবুও হাল ছাড়লাম না। ছোট একটি মোটরসাইকেল নিয়ে ছুটলাম পেছন পেছন, অনেক দূর যাওয়ার পর একটি সিগন্যালে গাড়িটি দাঁড়িয়ে যায়, আমিও দাঁড়িয়ে যাই। শাহরুখ খান যে প্রাইভেট গাড়িটিতে চড়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করে তিনি সেই গাড়ির জানালার গ্লাসটি নামিয়ে পাসে দাঁড়ানো বাসের যাত্রীদের টাটা দিতে থাকেন। তখন আমি পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে ওই মুহূর্তের বেশ কয়েকটি ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে যাই।

বাজারে অবশ্য গুজব আছে। আলোচনায় থাকার জন্য তারকারা নিজে থেকেই পাপারাজ্জির শরণাপন্ন হন। কথা একেবারে উড়িয়েও দেয়া যাবে না। তবে এটা ঠিক, একজন পাপারাজ্জি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তারকাদের ছবি তোলেন।

পাপারাজ্জি ধারণাটি বিশ্বে প্রচলন শুরু হয় ১৯৬০ সালে। আর বলিউডে এই চল শুরু হয়েছে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে। ভারতের সবচেয়ে পুরোনো পাপারাজ্জিদের মধ্যে একজন ফটোগ্রাফার যোগেন শাহ। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি প্রকাশ করেছেন এই পেশার অনেক রহস্য। নব্বই দশকের শুরুর দিকে নির্মাতা সুভাষ ঘাইয়ের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে তারকাদের কিছু ক্যান্ডিড বা অপ্রস্তুত ছবি তুলে আনেন যোগেন। মানে সেই ছবিগুলো ঠিক পোজ দেয়া ছিল না। পরে দেখতে পেলেন, ট্যাবলয়েডগুলোয় এ ধরনের ছবির কদর বেশি। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান তো আর রোজ হবে না। তারকাদের নিয়মিত ক্যামেরায় ধরতে হবে অন্য কোনো উপায়ে। যেমন মুম্বাইয়ের জুহু, বান্দ্রা ও বিমানবন্দর এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো তারকার দেখা মেলে।

দীপিকা পাড়ুকোন বাংলাদেশে আসেন ২০১৫ সালে। এই খবরটি জানতাম আগে থেকে। তখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকি, কী করা যায়। আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম, এবারও ভিআইপি গেটে দাঁড়িয়ে কোনো কাজ হলো না। ছুটলাম তাঁর গাড়ির পেছনে। এবার দীপিকাকে পেয়ে গেলাম এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার পর গোলচত্বরে সিগন্যালে। মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশে রেখে দ্রুত নেমে পড়লাম। গাড়ির গ্লাস ছিল আটকানো। এর মধ্য দিয়েই ছবি তুলি দীপিকা পাড়ুকোনের।

বাংলাদেশের বিনোদন ফটো-সাংবাদিকতায় পাপারাজ্জির সুযোগ বেশ কম। বাংলাদেশের তারকারা অবসর কাটাতে কিংবা বেড়াতে যান দেশের বাইরে। বাংলাদেশের তারকাবাজার তুলনামূলক ছোট। পাপারাজ্জি করার মতো ফটোগ্রাফারও কম। এমনকি বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোতে এ নিয়ে আগ্রহও অনেক কম।

বিদেশে আজকাল জিমের বাইরেও ওতপেতে থাকে পাপারাজ্জির দল। বড় রেস্তোরাঁগুলোর বাইরে সব সময়ই ঘোরাফেরা করতে থাকেন তাঁরা। কোনো তারকাকে দেখতে পেলেই শুরু হয়ে যায় 'ক্লিক ক্লিক ক্লিক'। আর এই যে 'এয়ারপোর্ট লুক', 'জিম লুক' এসবও কিন্তু পাপারাজ্জিদেরই সৃষ্টি।

বিনোদন সাংবাদিকরা খুব ভেবেচিন্তে এই চল শুরু করেননি। কিন্তু সমস্যা হলো কোনো তারকা রেস্তোরাঁ থেকে বের হওয়ার পর গাড়িতে উঠতে যে সময় লাগে, সেই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে খুব একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় না। আর বিমানবন্দরের গেট থেকে ভেতরে ঢোকার আগ পর্যন্ত কোনো তারকার দিকে ক্যামেরা তাক করে অনবরত ক্লিক করতে থাকলে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো ছবি পাওয়া যায়।

বিনোদন সাংবাদিকদের পাঠকদের শুধু ছবি দেখালেই মন ভরে না, তাঁরা ভালো ছবি প্রত্যাশা করেন। তাই এর সঙ্গে ইদানীং যোগ হয়েছে তারকাদের ফ্যাশনও। কোথাও বেড়াতে গেলে তাঁরা কী পোশাক পরছেন, ব্যাগটি কেমন নিলেন, জিমে কী ধরনের পোশাক পরে শরীরচর্চা করেন। সবকিছু এখন যুক্ত করা হচ্ছে এর সঙ্গে। বাংলাদেশের পাঠক কিংবা দর্শক সবাই তারকাদের খুব ফলো করেন।

কোন তারকা কখন কোথায় যাবেন, আলোকচিত্রীরা তাঁর খোঁজখবর রাখেন। অনেক সময় তারকারাও খোঁজখবর দিয়ে থাকেন। বেশির ভাগ সময় আগে থেকে কিছু জানা থাকে না। কিন্তু যেসব জায়গায় তারকাদের আনাগোনা বেশি, সেসব জায়গায় প্রায় প্রতিদিনই আলোকচিত্রীরা মারেন।

বিনোদন আলোকচিত্রীর কাজটি অনেক চ্যালেঞ্জিং, এমনকি কষ্টসাধ্যও।খুব মনোযোগের সঙ্গে লেগে না থাকলে, ভালো কাজ করা যায় না। ভালো কাজের অংশ হিসেবে এক্সক্লুসিভ কিছু কাজ থাকতে হবে। এখানে তারকাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা জরুরি। একটু ভুল বোঝাবুঝির জন্য অনেক সময় কারো কারো শত্রুতেও পরিণত হতে হয়। তাই অন্যান্য পেশার মতো এই পেশাতেও অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়।

লেখক: ফটো-সাংবাদিক, দৈনিক প্রথম আলো

জহির রায়হান অম্লান সূর্যের বিচ্ছুরিত মন্তাজ

অনুপম হায়াৎ

যদি মহাকাশের কথা বলি তবে তিনি ছিলেন সূর্য।
যদি বৃক্ষের কথা বলি তবে তিনি ছিলেন বটবৃক্ষ।
যদি শরীর-বৃত্তের কথা বলি তবে তিনি ছিলেন হৃৎপিণ্ড।

আমি জহির রায়হানের কথা বলছি। জহির রায়হান ছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্য-সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র, রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অগ্রগামী সৈনিক। চলচ্চিত্রে তিনি ছিলেন পরিচালক, প্রযোজক, কাহিনীকার, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপকার, সংগঠক, শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। আর সাহিত্যে ছিলেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, গীতিকার ও প্রবন্ধকার।

চলচ্চিত্রে তিনি ছিলেন পরিচালক, প্রযোজক, কাহিনীকার, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপকার, সংগঠক, শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। আর সাহিত্যে ছিলেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, গীতিকার ও প্রবন্ধকার।

জহির রায়হানের পুরো নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ডাক নাম জাফর এবং রাজনৈতিক নাম রায়হান। জন্মেছিলেন তিনি ফেনীর মজুপুর গ্রামে ১৯৩৫ সালে ১৯ আগস্ট। পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত আলেম এবং কলকাতা ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক। মা সুফিয়া খাতুন ছিলেন গৃহিণী। পিতা-মাতার আট সন্তানের মধ্যে তৃতীয় জহির রায়হানের বড় ভাই ছিলেন সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)।

শৈশব-কৈশোরেই জহির রায়হানের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা ও সাহিত্যচর্চার বিকাশ ঘটে। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর লেখা কবিতা 'ওদের জানিয়ে দাও' প্রকাশিত হয় কলকাতার 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায়। এটি ছিল একটি প্রতিবাদী কবিতা। তিনি লেখাপড়া করেছেন ফেনী, কলকাতা ও ঢাকায়। ভাষা আন্দোলনে প্রথম গ্রেফতার বরণকারী ১০

জনের মধ্যে তিনি ছিলেন। চলচ্চিত্র বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য তিনি কলকাতার প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অব সিনেমাটোগ্রাফিতে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি সাংবাদিকতাও করেছেন পঞ্চাশ দশকে 'যাত্রিক', 'যুগের দাবী', 'প্রবাহ', 'সচিত্র সন্ধানী' এবং সত্তর দশকের 'এক্সপ্রেস' পত্রিকায়। ছিলেন ছাত্রলীগের সদস্য, ডাকসু'র সাংস্কৃতিক সম্পাদক। ১৯৫৭ সালে তিনি এ জে কারদারের সহকারী হিসেবে 'ডে শ্যাল ডন' নামে চলচ্চিত্রের কাজ শুরু করেন। পরে তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখায় সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক, সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

২. *জহির রায়হানের সৃষ্টিকর্ম*

জহির রায়হানের সৃষ্টিকর্মকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: সাহিত্য কর্ম ও চলচ্চিত্রকর্ম।

ক. সাহিত্য: জহির রায়হানের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ছোটগল্প লেখার মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে তিনি গল্পকার হিসেবেই আবির্ভূত হন প্রাথমিকভাবে। তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর রচিত ছোটগল্পের সংখ্যা ১৯। এর মধ্যে ভাষা আন্দোলন নিয়েই রয়েছে কয়েকটি গল্প। যেমন- পোস্টার, একুশে ফেব্রুয়ারি ও একুশের গল্প। তিনি ১৯৫২ সালে জেলখানায় বসে 'পোস্টার' গল্পটি লিখেছিলেন।

তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা সাতটি। যথা: শেষ বিকেলের মেয়ে, হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী, আর কত দিন, তৃষ্ণা ও কয়েকটি মৃত্যু। এর মধ্যে 'হাজার বছর ধরে'র জন্য পেয়েছেন আদমজী পুরস্কার ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলা একাডেমি তাঁকে সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭২ সালে পুরস্কৃত করে। জহির রায়হান কবিতা ও গান রচনা করেছেন কিছু। তবে সেসবের সংখ্যা অনুল্লেখযোগ্য।

সাংবাদিকতার সূত্রে তিনি লিখেছেন কিছু নিবন্ধ। কয়েকটি সিরিয়াস প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি। যেমন- গণশিল্প, অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব (ইংরেজিতে)। এছাড়াও লিখেছেন চিত্রনাট্য। তবে এর মধ্যে 'জীবন থেকে নেয়া', 'স্টপ জেনোসাইড' এবং 'একুশে ফেব্রুয়ারি' ছাড়া অন্য কোনো চিত্রনাট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সাহিত্যকর্মে জীবন, সমাজ ও সমকালীনতার ছাপ পাওয়া যায়।

খ. চলচ্চিত্র: জহির রায়হানের ব্যাপক পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা রয়েছে চলচ্চিত্রে অবদান রাখার জন্য। তাঁর চলচ্চিত্রপঞ্জির সংখ্যা সর্বমোট ৩০। এসবের মধ্যে তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ১২। এর মধ্যে ১১টি মুক্তিপ্রাপ্ত আর একটি অসমাপ্ত চলচ্চিত্র। এছাড়া তিনি ঘোষণা করেছিলেন ১৯টি চলচ্চিত্রের নাম। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'একুশে ফেব্রুয়ারি', 'দেবদাস' ও 'জ্বীনের বাদশা'।

অন্যের পরিচালিত ছবিতে জহির রায়হান প্রযোজক, তত্ত্বাবধায়ক, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার, সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৭/১৮টি চলচ্চিত্রে ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে। জহির রায়হান পরিচালিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'কখনো আসেনি' (১৯৬১), 'সোনার কাজল' যৌথভাবে (১৯৬২), 'কাচের দেয়াল' (১৯৬৩), 'সঙ্গম'-উর্দু (১৯৬৪), 'বাহানা'-উর্দু (১৯৬৫), 'বেহুলা' (১৯৬৬), 'আনোয়ারা' (১৯৬৭), 'জ্বলতে সুরুজ কি নিচে'-উর্দু (১৯৭০), 'স্টপ জেনোসাইড' (১৯৭১), 'এ স্টেট ইজ বর্ন, (১৯৭১) এবং অসমাপ্ত 'লেট দেয়ার বি লাইট' (১৯৭০-'৭১)। এসবের মধ্যে 'সঙ্গম' হচ্ছে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি। আর 'বাহানা' হচ্ছে প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি। 'জীবন থেকে নেয়া' হচ্ছে রূপকের আড়ালে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। আর 'স্টপ জেনোসাইড' হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র এবং অসমাপ্ত 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছিল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে সাতটি ভাষায় নির্মিতব্য চলচ্চিত্র।

৩. *কয়েকটি চলচ্চিত্রের কথা*

বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়, যারা খ্যাতিমান ও সৃজনশীল চলচ্চিত্রকার রয়েছেন তাঁদের যেমন রয়েছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-মানবতাবোধ, শিক্ষা, অধ্যয়ন ও চর্চা, তেমন রয়েছে এটি আত্মস্থ ও শিল্পমণ্ডিত করার মাধ্যমে দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটানো। জহির রায়হান ছিলেন তেমনি একজন দায়বদ্ধ নির্মাতা। তিনি কবিতা-গল্প-উপন্যাস-সাংবাদিকতা-রাজনীতি-আন্দোলনকে ধারণ করেই চলচ্চিত্রে জড়িত হন। তাঁর স্বপ্ন ছিল চলচ্চিত্রে ক্যামেরাম্যান হওয়ার; কিন্তু পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠেন চলচ্চিত্রকার। তিনি চলচ্চিত্রকে মনে করতেন কবিতা-গল্প-উপন্যাস-পেইন্টিং। তাঁর জীবনে সাহিত্যচর্চা ও চলচ্চিত্র নির্মাণে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ও ভাষা আন্দোলন গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে।

জহির রায়হান ছিলেন মার্কসবাদী। তাঁর চলচ্চিত্রেও রয়েছে এই বিষয় ও দর্শনের ছাপ অর্থাৎ সমাজের দ্বান্দ্বিক রূপ, ধনী-গরিবের সামাজিক বৈষম্য, শোষক-শোষিতের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বিশ্বখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ও নির্মাতা কুলেশভ পুদভডিন-আইজেনস্টাইন প্রমুখের তত্ত্ব ও ধারণায় তিনি প্রভাবিত ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সত্য-সুন্দর-কল্যাণবোধ। কয়েকটি উর্দু ছবি বাদে ১৯৬১ এর 'কখনো আসেনি' থেকে ১৯৭১ এর 'স্টপ জেনোসাইড' পর্যন্ত চলচ্চিত্রগুলো তাঁর সৃজনশীলতা ও আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ক. 'কখনো আসেনি' (১৯৬১): জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র 'কখনো আসেনি' বিষয়বস্তু ও নির্মাণশৈলীগতভাবে একেবারেই আলাদা আধা-পরাবাস্তবধর্মী ছবি এটি। এর আখ্যানভাগে রয়েছে একজন বেকার শিল্পী শওকতের (খান আতা), পিতা অবিবাহিতা দু'বোন (শবনম ও তনিমা) নিয়ে অভাবের সংসার। আবার এক বন্দিনী নারী মরিয়মের (সুমিতা) প্রতি প্রেম। সব মিলিয়ে ব্যর্থতা-অসহায়ত্ব অবশেষে সংঘবদ্ধ আত্মহত্যা। অন্যদিকে রয়েছে অদ্ভুত বিকৃত মানসিকতার ধনাঢ্য ব্যক্তি সুলতানের (সঞ্জীব দত্ত) শিল্প সংগ্রহের বাতিক। তার মিউজিয়ামে মেরি নামে এক নারীকে রক্ষিতা করে রাখে। ঢাকা শহরের একটি বাড়িতে এই একই ধরনের ঘটনা পরপর দু'বার ঘটে। এ গল্প বা কাহিনীর সারমর্ম হচ্ছে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের উঠতি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে কীভাবে বারবার মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের জীবনে সুখ 'কখনো আসেনি'। এ চলচ্চিত্র প্রতীকী, বাঙালির স্বপ্ন, সুখ ও সুপ্ত বাসনা ভঙ্গের আলেখ্য। এ ছবিতে দৃশ্য ও শব্দের ব্যবহার, ক্যামেরা কোণ ও শট নির্বাচন, চরিত্রগুলোর আচরণ, সংগীত ও সংলাপ যোজনা, কাহিনীর রহস্যময়তা, আদি-মধ্য-অন্তিমের সংশ্লেষ ছিল দুঃসাহসী নবীন নির্মাতা জহির রায়হানের শিল্পিত প্রয়াস।

খ. 'কাচের দেয়াল' (১৯৬৩): ঢাকার চিত্রশিল্পের উন্মেষলগ্নে নারী মুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে জহির রায়হান নির্মাণ করেন 'কাচের দেয়াল'। মা-মরা, বাপের উপেক্ষিত মামা-মামি সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকা অসহায় দুঃখী মেয়ে হাসিনার (সুমিতা) কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এ চলচ্চিত্রের আখ্যান। অসহায় হলেও মেয়েটি স্বাভাবিকভাবেই প্রেম করে মামাতো ভাইয়ের (আনোয়ার হোসেন) সঙ্গে স্বপ্ন দেখে সুখী সংসার গড়ার। কিন্তু মামিদের ভয়ে সদাই তটস্থ থাকে হাসিনা। একসময় খবর আসে হাসিনা লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছে। এই সংবাদে মামা-মামিদের কাছে হাসিনার কদর বেড়ে যায়। মামিদের কেউ তাকে পুত্রবধূ, কেউ ভ্রাতৃবধূ করার প্রতিযোগিতায় নামে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খবর আসে যে, লটারি পাওয়ার বিষয়টি ভুল। এই সংবাদে মা-মরা হাসিনার অসহায় অবস্থা পূর্বের মতো বেড়ে যায় এবং আরও খারাপ হয়ে পড়ে। হাসিনা তখন মামার সংসার থেকে মুক্তির কথা ভাবে। অতঃপর একদিন মামাদের বাড়ি ছেড়ে শহরের খোলা পথে বেরিয়ে পড়ে অজানা গন্তব্যে। এ সময় একমাত্র তার সঙ্গী হয় গায়ক তরমুজ মামা (খান আতা)। 'কাচের দেয়াল' প্রতীকী চলচ্চিত্র। শহরকেন্দ্রিক যৌথ পরিবার নিয়ে বসবাসকারী বাড়ির মধ্যে ঘটনাগুলো ঘটে। তীব্র আলো, সাজানো ঘটনা, চেম্বার ড্রামার মতো। চলচ্চিত্রে দিন-রাত্রির পার্থক্য, আলো-আঁধারের তীব্রতা ঘটনার বিকাশ, পরিবেশ, চরিত্রগুলোর আচার-আচরণের সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে দেখা যায়, হাসিনার কাছে যখন লটারি না পাওয়ার চিঠি আসে, তখন সে চিঠিটি পুড়ে ফেলে। আগুনে চিঠি পোড়ার এই দৃশ্যটি তীব্র আলোতে ক্যামেরায় ক্লোজআপে দৃশ্যমান হয় তখন চলচ্চিত্রের ভাষা নান্দনিক ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছবির শেষ দৃশ্যটিও ক্যামেরায় দেখানো হয়েছে কাচ ভাঙার মাধ্যমে। অর্থাৎ 'কাচের দেয়াল' ভেঙে পড়ছে, সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এক নারী।

গ. 'বেহুলা' (১৯৬৬): ১৯৬০ দশকের প্রারম্ভে বাণিজ্যলোভী প্রযোজক-পরিচালক-প্রদর্শকের কারণে যখন ঢাকার চিত্রলোক উর্দু ছবির জোয়ারে ডুবন্ত, বাংলা ভাষা, বাঙালির জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি পর্দালোক থেকে নির্বাসিত তখন জীবনবাদী পরিচালক সালাহ উদ্দীন কয়েকটি সুরুচিপূর্ণ সৃজনশীল চলচ্চিত্র যেমন-'সূর্যস্নান', 'ধারাপাত' এবং লোকগাথাভিত্তিক 'রূপবান' নির্মাণ করেন। 'রূপবান' বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে পথ উদ্ধারের কোরামিন হিসেবে কাজ করে। একের পর এক নির্মিত হতে থাকে লোকগাথাভিত্তিক চলচ্চিত্র। জহির

রায়হান তখন হিন্দুপুরাণভিত্তিক লোকসাহিত্যমূলক জনপ্রিয় গাথা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী অবলম্বনে 'বেহুলা' (১৯৬৬) নির্মাণ করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রাখেন। সর্পদেবী মনসার অভিশাপের শিকার হয় সাঁই সওদাগরের কন্যা বেহুলা (সুচন্দা)। তার বিয়ে হয় চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরের সাথে। বাসর রাতেই বেহুলা স্বামী (রাজ্জাক) লখিন্দরকে সর্পে কাটে। অতঃপর সতী বেহুলা দেবরাজ ইন্দ্রকে তুষ্ট করে মৃত স্বামীকে সারিয়ে তুলে। জহির রায়হান এই চলচ্চিত্রের আঙ্গিক গঠনে চলচ্চিত্র উপাদানের পাশাপাশি বিনোদনমূলক উপাদান যেমন নাচ-গানের আশ্রয় নিয়েছেন। চলচ্চিত্রের আখ্যানটি কল্পিত হলেও এর চরিত্রগুলো আচার-আচরণে, সংলাপে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সুখ-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় মাটির পৃথিবীর মানুষের মতোই।

'বেহুলা'র একটি দৃশ্যে দেখা যায়, বেহুলা সখীসহ নদীতে গোসল করছে তখন গান হচ্ছে 'অ বেহুলা সুন্দরী'। দৃশ্যটির কম্পোজিশনে রয়েছে শাপলার আঙ্গিক। বিষয়টি কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা ও বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মিশে একাকার হয়েছে। অন্যদিকে মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা কলাগাছের ভেলায় চড়ে নদীতে ভাসছে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে। এই দৃশ্যায়ন যেমন ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি সুগঠিত ও সৃজনশীল।

ঘ. 'আনোয়ারা' (১৯৬৭): হিন্দুপুরাণভিত্তিক 'বেহুলা'র পর জহির রায়হান মুসলমান জীবন ও সমাজনির্ভর 'আনোয়ারা' নির্মাণ করেন। 'আনোয়ারা'র আলেখ্য গড়ে উঠেছে নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন রচিত একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে। উপন্যাসটি ১৯১৪ সালে রচিত হওয়ার পর মুসলমান সমাজে বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা পায়। আর জহির রায়হান ১৯৬৭ সালে 'আনোয়ারা' চলচ্চিত্রায়ণ করেন। উপমহাদেশ তথা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তখন পর্যন্ত কোনো মুসলমান নারীর নামে উপন্যাসভিত্তিক কোনো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে বলে জানা নেই। এটি একটি বিরল ঘটনা।

মাতৃহীন পর্দানশীল যুবতী আনোয়ারার (সুচন্দা) বিয়ে হয় পাট ব্যবসায়ী কর্মকর্তা নূরুল ইসলামের (রাজ্জাক) সঙ্গে। কিন্তু গরিব, লোভী সৎমা (রানী সরকার) ও সৎশাশুড়ির চক্রান্তের শিকার হয় এই নবদম্পতি। নানা অঘটনের পর সতী নারী আনোয়ারা তার পতিকে ফিরে পায় এবং সুখে জীবন কাটায়। 'আনোয়ারা' নির্মাণে জহির রায়হান যথেষ্ট সময় ও বাস্তবতা সচেতন ছিলেন। এই চিত্রে মুসলমান সমাজ, পরিবেশ, চরিত্র ও ঘটনার বাস্তবতা আনয়নে জিটেলের ব্যবহার করেছেন। শব্দ, সংলাপ, সংগীত, পরিবেশ ও প্রতীকের ব্যবহারে তিনি ছিলেন যত্নশীল ও সৃজনশীল। ছবিতে সৎমার লোভ-লালসার পরিণতির দৃশ্যে তিনি প্রদীপের আগুনে উঁইপোকা পুড়ে মরার এবং দাদির মৃত্যুর সময় ছুটন্ত ছাগল-ছানার দৃশ্য দেখিয়েছেন। এছাড়া গভীর রাতের ভয়াবহতা, গ্রাম্যজীবনের বিভিন্ন পরিবেশ এবং কোরআন পাঠ শুনে নারীর প্রেমে পড়া এবং মিলাদ অনুষ্ঠানের দৃশ্য দেখিয়ে পরিচালক ঢাকার চলচ্চিত্রে নতুনমাত্রা সংযোজন করেছেন। এই ছবিতে সুচন্দাকে সত্যিকারের আনোয়ারা এবং রাজ্জাককে সত্যিকারের নূরুল ইসলামই মনে হয়েছে।

ঙ. 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০): রাজনীতি ও সমাজসচেতন এবং জীবনবাদী চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের অত্যুজ্জ্বল সৃষ্টির নিদর্শন হচ্ছে 'জীবন থেকে নেয়া'। মোল্লাতান্ত্রিক ও মিলিটারি শাসন-শোষণকবলিত তৎকালীন সারা পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'জীবন থেকে নেয়া'-ই একমাত্র চলচ্চিত্র যার বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, নির্মাণশৈলী, সংগীত, আবহ সংগীত, সংলাপ, ইঙ্গিত, সংকেত, অভিনয় পারিবারিক ঘটনার রূপকের আড়ালে এক রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। প্রথমে এ ছবির নাম ছিল 'তিনজন মেয়ে ও এক পয়সার বিষ'। পরে নাম বদল করা হয়। এই চলচ্চিত্রের আখ্যানভাগে দেখা যায়, কর্তৃত্ববাদী, বদমেজাজি এক বড়বোনের (রওশন জামিল) ভয়ে তটস্থ পরিবারের সবাই; মোক্তারি পাস করা বেকার-গায়ক স্বামী (খান আতা), কনিষ্ঠ দুই ভাই, একজন আইনজীবী (শওকত আকবর), আরেকজন ছাত্রনেতা ফারুক (রাজ্জাক) এবং চাকর-চাকরানিগণ। চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে তিনি কর্তৃত্ব ফলান সবার ওপর। এমন স্বৈরতান্ত্রিক বোনের পরিবারে বউ হয়ে আসেন রাজনীতিবিদ আনোয়ার হোসেনের দুই বোন সাথী এবং বীথি (রোজী ও সুচন্দা)। সংঘাত আরো তীব্র হয় সংসারে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতোই। এদিকে দেশে চলছে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আটষট্টি ও উনসত্তরের প্রবল গণআন্দোলন। এতে শক্তি জোগায় ভাষা আন্দোলনের গান ও চেতনা, রবীন্দ্র-নজরুল-ইকবালের গান। আনোয়ার হোসেন জেলে বন্দি হয়। বড়বোন ষড়যন্ত্র করে বিষ প্রয়োগে দু'বোনের একজনকে হত্যার চেষ্টা করে। অবশেষে আদালতে আসল সত্য বেরিয়ে আসে। কুচক্রী স্বৈরতান্ত্রিক বড়বোনের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়।

'জীবন থেকে নেয়া'র নির্মাণ ও মুক্তিপর্বে ঘটে সামরিক সরকারের হস্তক্ষেপ। ক্যান্টনমেন্টে ডেকে নেয়া হয় নির্মাতা জহির রায়হানকে। শেষ পর্যন্ত ছবিটি মুক্তি পায় ঘোষিত তারিখের একদিন পর ১৯৭০ সালের ১১ এপ্রিল।

এই চলচ্চিত্রের ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, শব্দ, সংগীত, দৃশ্যরূপ, অভিনয়, ক্যামেরার অবস্থান, শট বিন্যাস– সবই উদ্দেশ্যমূলক এবং সাংকেতিক। ছবিতে বড়বোনের চরিত্রটি স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক, তার চাবির গোছাটি ক্ষমতার স্মারক, এটি যার আঁচলে থাকে চাকরানিরা তার পেছনে পেছনেই ছুটে। আর চাবির গোছাতে চাবির সংখ্যা ০৫ হলে পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশ আর ৬টি চাবি হলে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার ইঙ্গিতবাহী। রাজনৈতিক নেতার চরিত্রটি অবশ্যই ওই সময়ের বঙ্গবন্ধু না হয়ে পারে না। দু'বোন সাথী আর বীথি হতে পারে পাকিস্তানের দুই অংশ-পূর্ব ও পশ্চিম। আর নবজাতকের নাম 'মুক্তি' গভীর রাজনৈতিক ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত। ছবির ফারুক চরিত্রটি তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের নেতার প্রতীক। আর গায়ক স্বামীটি নির্যাতিত জনগণের একজন, যিনি স্ত্রীর ভয়ে ছাদে বসে 'এ খাঁচা ভাঙ্গবো আমি কেমন করে' বলে গান করেন। ছবির সংলাপে 'মিলিটারি' শব্দের উচ্চারণটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এমনকি চাকরও বড়বোনের আচার-আচরণে তাকে 'মিলিটারি বউ' বলে ব্যঙ্গোক্তি করে।

ছবিতে বিভিন্ন দাবিসম্বলিত পোস্টার লাগানো, বড়বোনের প্রতিক্রিয়া, মার্শাল সংগীতধ্বনি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

এ ছবিতে ব্যবহৃত 'আমার সোনার বাংলা', 'কারার ঐ লোহ কপাট', 'এ খাঁচা ভাঙ্গবো আমি কেমন করে', 'দাও দাও দুনিয়ার যত গরীবকে', 'ও আমার স্বপ্ন ঝরা আকুল করা' গানগুলো যেমন বাঙালির চেতনা, সংগ্রাম, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্মারক তেমন অতীত-সমকালীনতায় ভাস্বর এবং স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের ইঙ্গিতবাহী।

'জীবন থেকে নেয়া' শুধু সেকালে এবং একালের চলচ্চিত্র নয়, এটি খাঁচা ভাঙার, নির্যাতন-স্বাধীনতা-মুক্তির চেতনাজাগানিয়া সর্বকালের চলচ্চিত্র। আশার কথা, সম্প্রতি জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া'সহ অন্যান্য চলচ্চিত্র নিয়ে মার্কসবাদী, নারীবাদী-নন্দনবাদী-চিহ্নবাদী-সমাজবাদী তত্ত্বের আলোকে পিএইচ.ডি পর্যায় ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণা হচ্ছে।

৪. জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র (১৯৭১)

জহির রায়হান সক্রিয় ও সৃজনশীল ছিলেন কাগজে-কলমে-ক্যামেরায় এবং আন্দোলনে-মিটিংয়ে-মিছিলে-মুক্তিযুদ্ধে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পর্যন্ত জহির রায়হানের সৃজনশীলতা ছিল সামনের সারিতেই দৃশ্যমান। অর্থাৎ জহির রায়হান ছিলেন সবার আগে।

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বহুবিধ ভূমিকা ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রযোজনা ও সাংগঠনিক নেতৃত্বদান। ওই সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নিজে দুটো প্রামাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' ও 'এ স্টেট ইজ বর্ন' নির্মাণ করেন এবং অন্য প্রামাণ্যচিত্র আলমগীর কবিরের 'লিবারেশন ফাইটার্স' ও বাবুল চৌধুরীর 'ইনোসেন্ট মিলিয়নস' প্রযোজনা করেন। তিনি এই চারটি চলচ্চিত্রের নামকরণ করেছিলেন 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র'। এ ধরনের চলচ্চিত্র 'তৃতীয় চলচ্চিত্র ধারা' নামেও পরিচিত।

০১. 'স্টপ জেনোসাইড': 'স্টপ জেনোসাইড' ছবির বিষয়বস্তু, নির্মাণশৈলী, আঙ্গিক ও উপস্থাপনা নান্দনিকতায় ভাস্বর। এতে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা, বিশ্ববিবেকের নিস্পৃহতা, শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্ট এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুতি দেখানো হয়েছে কুশলতার সঙ্গে। 'স্টপ জেনোসাইড' জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চলচ্চিত্রের প্রথম খণ্ড।

লেলিনের বক্তব্য ও স্থিরচিত্র দিয়ে ছবিটির শুরু। এরপরেই চলমান দৃশ্য-টেকিতে– ধানভানারত কিশোরী, হঠাৎ কুকুরের ঘেউ ঘেউ, গুলির শব্দ, প্রাণভয়ে উড়ন্ত কাকের চিৎকার, অসংখ্য লাশ, ভেঙে পড়ে বার্লিনের দেয়াল। টাইটেল 'স্টপ জেনোসাইড'; গণহত্যা বন্ধ কর। টেলিপ্রিন্টারের ঠকঠক: ডেটলাইন ২০ জুলাই নিউইয়র্ক। মহিলাকণ্ঠে উচ্চারিত জাতিসংঘের মানবাধিকার ধারা। আবার ডেটলাইন ২০ জুলাই সায়গন। ভিয়েতনামে মার্কিনি বর্বরতার সাফাই গাওয়ার নির্লজ্জ দৃশ্য– কসাই সেনাপতি কেলির ছবি। কাট টু বাংলাদেশ: আবার ২০ জুলাই,

তবে স্থান বনগাঁ সীমান্ত। ইংরেজিত আলমগীর কবিরের ধারাবিবরণী; সেই সঙ্গে হাজার হাজার শরণার্থীর মিছিল– ছেলে, বুড়ো, নারী, শিশু প্রাণভয়ে পালাচ্ছে ভিটেমাটি ছেড়ে– দুরন্ত দুর্গম কর্দমাক্ত বৃষ্টিস্নাত পথ ভেঙে ভেঙে। হত্যা দৃশ্য। শরণার্থী শিবিরে ক্লোজআপে বুড়োর বীভৎস অভিজ্ঞতা বর্ণনা, ফরিদপুরের বিনোদবিহারীর কথা, নাম না জানা ধর্ষিতার নিঃশব্দ চাহনি, কসাই ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে একজনের নিন্দা। এরপরেই ক্যামেরায় ফ্রেমজুড়ে একটি উলঙ্গ শিশুর মূত্রত্যাগের দৃশ্য– যেন পাকিস্তানের রাষ্ট্র তলিয়ে যাচ্ছে এই অপবিত্র প্রবাহ ধারায়। কিন্তু পরক্ষণেই জন্ম নিচ্ছে নতুন দৃশ্য। গাঁয়ের পথে গাছগাছালির আড়াল আর পাখির ডাকের মধ্যে মালকোচা দেয়া দৃপ্তপদে বন্দুক হাতে এগিয়ে যাচ্ছে একদল মুক্তিযোদ্ধা..., যারা লড়ছে গণহত্যার বিরুদ্ধে।

'স্টপ জেনোসাইড' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য প্রামাণ্য দলিল। মানবিকতায় সমৃদ্ধ এই ছবিটি বিশ্বজনমত গঠনে সহায়তা করে। ছবিটি সিডালক এবং তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির পুরস্কার পেয়েছে। ছবিতে বাংলাদেশের গণহত্যার সাথে নান্দনিকতার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণহত্যাকেও তুলে ধরা হয়েছে।

০২. ***'এ স্টেট ইজ বর্ন' :*** এ ছবিতে ১৯৪৭ সাল থেকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে গঠিত স্বাধীনবাংলা সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাক্ষাৎকার পর্যন্ত বর্ষ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা যায়, 'এ স্টেট ইজ বর্ন' হচ্ছে বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পাকিস্তানিদের নির্যাতন-নৃশংসতার বিভিন্ন ঘটনার প্রামাণ্য ইতিহাস। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম, জিন্নাহর শপথগ্রহণ, ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষার দাবি, ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে সোহরাওয়ার্দী-হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, ৯২-ক ধারা জারি, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব-ইস্কান্দারের নেতৃত্বে সামরিক শাসন, ১৯৬২-'৬৫ সালে ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৬-দফা ঘোষণা, মুজিব-নজরুল-মনসুর-মুশতাক-কামরুজ্জামান-তাজউদ্দীনের রাজনৈতিক জীবন, ১৯৬৮-'৬৯ সালে ছাত্র ও গণআন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মার্চে গণ ও অসহযোগ আন্দোলন, পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণ, স্বাধীনতা ঘোষণা, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরের মন্ত্রিসভা গঠন এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন, মন্ত্রী মনসুর আলী-কামরুজ্জামান-খন্দকার মুশতাকের সাক্ষাৎকারে ভবিষ্যতে স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামো-আদর্শ-উদ্দেশ্য-রাজনীতি-অধিকার-অর্থনীতি-পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে রূপরেখা।

ছবির শুরুতে রয়েছে 'আমার সোনার বাংলা' গান, আবহমান বাংলার দৃশ্যাবলি এবং শেষ হয়েছে সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলা'র প্রতীক শিশিরস্নাত ধানের শীষ দিয়ে। নতুন করে ক্যামেরায় চিত্রায়িত দৃশ্য ছাড়াও এতে রয়েছে হাতে আঁকা স্কেচ, স্থিরচিত্র, লেটারিং, স্টকশট ইত্যাদি। পর্দায় প্রতিটি সাল যখন ভেসে ওঠে তখন সেই সঙ্গে দেখানো হয় বাঙালিদের সংগ্রাম। ছবিতে ক্লোজআপ একটি লাশের বুক থেকে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন ধারাবিবরণীতে শোনা যায়, 'অ্যান্ড মোর ব্লাড ফলোজ' তখন চোখ ছল ছল করে ওঠে। সেই পাকিস্তানি আমলের শত নির্যাতন আর উত্তাল দিনগুলোর জীবন্ত ফ্রেম, বঙ্গবন্ধু আর ১৯৭১ সালে বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী কামরুজ্জামান-মনসুর আলী-মুশতাক যখন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আবেগাপ্লুতভাবে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত একটি জাতির দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাবণ্যের উৎসারমাখা অবিস্মরণীয় এক অতীত।

০৩. ***অসমাপ্ত 'লেট দেয়ার বি লাইট' (১৯৭০-'৭১) :*** চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে জহির রায়হান বিষয়বস্তুর দিক থেকে, নির্মাণশৈলীর দিক থেকে এবং দেশ থেকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ক্রমেই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। এর প্রমাণ তাঁর 'লেট দেয়ার বি লাইট'। এই চলচ্চিত্রের আখ্যান গড়ে উঠেছে স্বরচিত উপন্যাস 'আর কতদিন' অবলম্বনে। এ ছবির কাজ শুরু হয় ১৯৭০ সালের আগস্টে। ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ছবিটির অসমাপ্তই থেকে যায়, বলা যায় চিরদিনের জন্য। এ ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক এবং চিত্রগ্রাহকও ছিলেন জহির রায়হান। জহির রায়হান বলেছিলেন, 'লেট দেয়ার বি লাইট' হচ্ছে আমার প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র...। এতদিন আমি সব ছবিতেই কমবেশি ক্রীতদাসের মতো কাজ করেছি।

'লেট দেয়ার বি লাইট' এর কাহিনীর সংক্ষিপ্তরূপ ওই সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো:

'...তবু মানুষের এই দীনতার বুঝি শেষ নেই। শেষ নেই মৃত্যুরও। তবুও মানুষ মানুষকে হত্যা করে। ধর্মের নামে। বর্ণের নামে। জাতির নামে। সংস্কৃতির নামে। এই বরবর্তাই অনেকদিন ধরে আমাদের এই পৃথিবীর শান্তিকে বিপন্ন করেছে। হিংসার এই বিষ লক্ষ-কোটি মানবসন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে...। কিন্তু মানুষ মরতে চায় না। ওরা বাঁচতে চায়... একটা সীমাহীন সমুদ্রের পাড় ধরে মানুষগুলো এগিয়ে চলেছে সামনে।

ছেলে। বুড়ো। মেয়ে। শিশু। যুবক। যুবতী। দীর্ঘপথ চলার ক্লান্ত অবসন্ন জীর্ণশীর্ণ-বিবর্ণ। ক্ষত-বিক্ষত দেহ আর অন্ধকারে আমরা কোথায়?

ভিয়েতনাম না ইন্দোনেশিয়ায়, জেরুজালেমে না সাইপ্রাসে। ভারতে না পাকিস্তানে কোথায় আমরা? জানো, ওরা আমার ছেলেটাকে হত্যা করেছে হিরোশিমায়। ওরা আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়। আমার বোনটাকে ধর্ষণ করে মেরেছে ওরা আফ্রিকাতে। আমার বাবাকে মেরেছে বুখেনওয়ার্ল্ডে গুলি করে। আর আমার ভাই। তাকে ওরা ফাঁসে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। বলতে গিয়ে দু'চোখের কোণে দু'ফোটা অশ্রু রক্তের মত চিক চিক করে উঠলো বুড়োটার। ওর পাশে এসে দাঁড়ালো তপু আর ইভা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ওরা। সামনে...।

০৪. ***বহুল ঘোষিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৬৬-'৭০):*** ভাষা আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে জহির রায়হান একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ছবির চিত্রনাট্য লিখে তা এফডিসি'তে জমাও দিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সে ছবি করার অনুমতি দেয়নি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জহির রায়হান ছিলেন ভাষা আন্দোলনের সন্তান। জহির রায়হান বলেছিলেন–'বিশ্বাস করুন, একুশই আমাকে লেখক বানিয়েছে। আমি যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা একুশেরই দান। .... একুশের উপর ছবি করা আমার জীবনের অন্যতম প্রধান বাসনা...।' কিন্তু তার সে বাসনা পূর্ণ হয়নি। তিনি চিরতরে ছাড়িয়ে গেছেন মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্নে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে অগ্রজ সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে। সেসবই এখন ইতিহাস।

উপসংহার

জহির রায়হানের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম বাংলাদেশের জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা যখন ভাষা আন্দোলন, গণআন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাহিত্য-সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র, মুক্তিযুদ্ধ, বুদ্ধিজীবী হত্যা, পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আল বদরদের নৃশংসতার কথা বলব, তখন জহির রায়হানই হবেন আমাদের প্রেরণার উৎস ও আদর্শ। অন্তর অন্তরীক্ষে তিনি হবেন অম্লান সূর্য। জহির রায়হানের জীবন ও কর্ম নিয়ে আমরা যত বেশি অধ্যয়ন, অবলোকন, চর্চা ও গবেষণা করব, ততবেশি আমরা হব উপকৃত।

সহায়ক রচনাপঞ্জি ও পত্রপত্রিকা

১. সারোয়ার জাহান, জহির রায়হান, ঢাকা, ১৯৮৮
২. শাহরিয়ার কবির, একুশে ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, ১৯৮৮
৩. অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ১৯৮৭
৪. অনুপম হায়াৎ, জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি, বিষয় ও বৈশিষ্ট্য
৫. সাপ্তাহিক চিত্রালী, ১৯৬০-১৯৭১
৬. সচিত্র সন্ধানী, ১৯৫৯, ১৯৬৫ ও ১৯৮৪।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, গবেষক

বিনোদন সাংবাদিকতায় সাক্ষাৎকার ও খবরের উৎস

তৌহিদা শিরোপা

সত্তরের দশকে কার্ল বার্নস্টেইন ও বব উডওয়ার্ড ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ করেছিলেন ডিপ থ্রট ছদ্মনামের এক সংবাদসূত্র থেকে। প্রাপ্ত খবরে নড়ে যায় রিচার্ড নিক্সনের প্রেসিডেন্সি। সোর্স বা সংবাদসূত্রের গুরুত্ব কতখানি, তা ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কথা পড়লেই বোঝা যায়।

১৯৯৭ সালের কথা। ব্রিটিশ রাজবধূ প্রিন্সেস ডায়না, ফ্রান্সের এক হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে নিজ গাড়িতে ওঠেন। গাড়িতে ওঠার একটু পরই পাপারাজ্জিরা তাড়া করে প্রিন্সেস ডায়নাকে। পাপারাজ্জিদের এড়াতে তাড়াহুড়োয় গাড়িটি একটি টানেলের মধ্যে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অনেক গোপনে চলাচল করলেও কীভাবে প্রিন্সেস ডায়নার হোটেলে ওঠার কথা পাপারাজ্জিরা জেনেছিল? পাপারাজ্জিরা জানতেন প্রিন্সেস ডায়না ও তাঁর প্রেমিকের ছবি বিনোদন পাতা বা পেজ থ্রির কাটতি বাড়ায়, তাই তো যে করেই হোক তার ছবি চাই-ই চাই। হোটেলের লিফটম্যান আর ম্যানেজাররাই নাকি আগে থেকে বার্তা জানাতেন সাংবাদিকদের।

হলিউড, বলিউড কিংবা টালিউডে তারকা সমাগম বেশি। বিনোদনজগৎ বর্ণাঢ্য, বড়। ফলে সেখানে সত্যিকার অর্থে বিনোদন সাংবাদিকতা করার সুযোগ বেশি। পরস্পর অনেক প্রফেশনাল। যেটা বাংলাদেশে খুব একটা চোখে পড়ে না। এটিও ঠিক যে, বিনোদন সাংবাদিকতার সোর্স তৈরি ও সাক্ষাৎকার নেয়ার কিছু সাধারণ নিয়ম সব দেশে সব বিনোদনজগতে প্রায় কাছাকাছি। কাছ থেকে তারকাদের জীবনের আলোকিত জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক বিষয় কিংবা অন্ধকার দেখার সুযোগ তাদেরই বেশি হয়।

সত্তরের দশকে কার্ল বার্নস্টেইন ও বব উডওয়ার্ড ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ করেছিলেন ডিপ থ্রট ছদ্মনামের এক সংবাদসূত্র থেকে। প্রাপ্ত খবরে নড়ে যায় রিচার্ড নিক্সনের প্রেসিডেন্সি

শক্ত সোর্স, রঙিন খবর

এই তো কিছুদিন আগের কথা, প্রথমে শোনা গেল আবারও এক হচ্ছেন বা প্রেম করছেন হালের হার্টথ্রব সেলেনা গোমেজ ও জাস্টিন বিবার। শোনা কথার প্রমাণ হিসেবে এক সাংবাদিক সেলেনা-বিবার সাইকেল চালিয়ে আমোদে আছেন– এমন ছবি প্রকাশ করলেন। সেলেনা-বিবারের এক পারিবারিক বন্ধুই নাকি কোনো এক সাংবাদিককে প্রথম তাদের দ্বিতীয় প্রেমের কথা জানিয়েছিলেন। সেই বন্ধু কে ছিলেন!

বিনোদন দুনিয়ার হুটহাট এমন অনেক খবর আর ছবি সাংবাদিকরা মাঝেমধ্যেই প্রকাশ করে চমকে দেন, ভক্ত আর তারকা সবাইকে। সাংবাদিকরা কি সুপার হিরো– এমন সব খবর কোথায় পান, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন পাঠক-দর্শক-ভক্তরা। বিখ্যাত বিনোদন সাংবাদিক জন স্টুয়ার্ট সারাজীবনে হলিউড নিয়ে অনেক সংবাদ প্রকাশ করে চমকে দিয়েছেন। তাঁর সংবাদের উৎস ছিল তারকাদের বন্ধু-পরিবারের সদস্য কিংবা সহকর্মীরা। উৎস, সূত্র বা সোর্স যাই বলি না কেন, যার সোর্স যত শক্ত আর নির্ভরশীল, তাঁর কিন্তু সংবাদের রং আর গুরুত্বই ততই বেড়ে যায়।

যেভাবে সোর্স তৈরি করেন সাংবাদিকরা

টড ম্যাকার্থি ৩০ বছরের বেশি সময় ভ্যারাইটি ম্যাগাজিনের প্রধান চলচ্চিত্র সমালোচক ছিলেন। টড তাঁর বিখ্যাত বই 'দ্য গ্রে ফক্স অব হলিউডে'তে কীভাবে হলিউডে সামান্য স্টুডিও অপারেটরও যে বড় বড় সংবাদের উৎস হতে পারে, তা লিখেছেন। টডের মতে, 'বিনোদন সাংবাদিকতা শক্তি হচ্ছে তারকাদের পেছনের মানুষদের সঙ্গে সাংবাদিকের সম্পর্ক। যারা অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুললে অন্যরকম খবর পাওয়া যায়।' বিনোদন সাংবাদিকতায় আগে ছবি পরে কথা– বিষয়টি বেশ প্রচলিত। ফটো-সাংবাদিকদের জন্য ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে থাকার জন্য নির্ভরযোগ্য সোর্সের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেলেনা-জাস্টিনের প্রেম কিংবা অ্যাঞ্জেলিনা-ব্র্যাডের লুকিয়ে লুকিয়ে শপিং করার ছবি প্রথম পত্রিকায় প্রকাশের পরই সবাই বিশ্বাস করেন। এক পাপারাজ্জি সেই ছবি সরবরাহ করেছিলেন সংবাদমাধ্যমে।

বলিউডের আলোচিত সাংবাদিক খালিদ মোহাম্মদ। হিন্দুস্থান টাইমস ও ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনে কাজ করা এ সাংবাদিক 'টু বি অর নট টু বি: অমিতাভ বচ্চন' নামের একটি বই লিখে বেশ আলোচিত হয়েছিলেন ২০০২ সালে। খালিদ তাঁর পেশাজীবনে বলিউডের অনেক তারকার খবর প্রকাশ করে আলোচিত হয়েছিলেন। চলচ্চিত্র সেটের বেনামের কলাকুশলীরা ছিলেন খালিদের সংবাদের সূত্র। খালিদ যতটা না তারকাদের পেছনে সময় দিতেন, তার চেয়ে বেশি সময় দিতেন তার সূত্র বা সোর্সদের। একসময়কার বলিউড কাঁপানো তারকা আশা পারেকের জীবনী নিয়ে খালিদ 'দ্য হিট গার্ল' নামের একটি বই এ বছর প্রকাশ করেছেন। আশা'র প্রতিবেশী থেকে শুরু করে আইনজীবী সবার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে খালিদ বইটি প্রকাশ করেন।

নিউইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত সাংবাদিক জ্যানেট মসলিন। ৩০ বছরের ক্যারিয়ারে জ্যানেট উডি অ্যালেন থেকে শুরু করে জর্জ ক্লুনি-টম ক্রুজদের অনেক সংবাদ প্রকাশ করেছেন। জ্যানেট তারকাদের স্কুলের বন্ধু আর আইনজীবীদের সঙ্গে দারুণ সখ্য রাখতেন। সখ্যের জোরেই হলিউডের অন্দরমহলের অনেক খোঁজ পেতেন জ্যানেট।

সোর্সের গ্রহণযোগ্যতা সাংবাদিকতার শক্তি

বিনোদন সাংবাদিকতা করার সময় আমার মনে হয়েছে একদিকে যেমন সোর্স বা সূত্রের নির্ভরযোগ্যতাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, আবার একই সঙ্গে বিনোদনজগতের তারকাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গাটা বন্ধুত্বপূর্ণ হলে যে কোনো তথ্য সহজে এবং সবার আগে পাওয়া যায়। সোর্স তৈরি সাংবাদিকদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জের একটি কাজ। সেই চ্যালেঞ্জকে যারা জয় করতে পারেন, তারাই গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ প্রথম প্রকাশ করতে পারেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো হলে এবং আস্থার জায়গা তৈরি করে নিতে পারলে সবার আগে আপনাকে জানাবে। তারকাই তখন সোর্স হয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, তারকার আশেপাশের মানুষও আপনাকে সাহায্য করবে। এফডিসি, নাটকপাড়া, বিভিন্ন শুটিং স্পটে যারা কাজ করেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও তারকাদের বন্ধু, প্রতিবেশীসহ আইনজীবীর সঙ্গেও সম্পর্ক রাখলে হুটহাট অনেক সংবাদ পাওয়ার সুযোগ থাকে।

সোর্সের তথ্য সঠিক তো

অনেক তথ্যই সাংবাদিকরা পেয়ে থাকেন। কোনটি ঠিক আর কোনটি বেঠিক, তা নিয়ে অনেকটা সময় হিমশিম খেতে হয়। এ বছর বলিউড সাংবাদিক রাম কমল মুখার্জি অভিনয় শিল্পী হেমা মালিনীকে নিয়ে 'দ্য ড্রিম গার্ল' বইটি প্রকাশ করেন। বইটিতে রাম হেমা মালিনী যেখানে নাচ শিখেছেন, যেখানে হেমা মালিনী থেকেছেন, তাঁর বাসিন্দাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বইয়ে হেমার অনেক অজানা কথা তুলে ধরেছেন। সাংবাদিক হিসেবে রাম কিন্তু সব তথ্যই নেননি। তারকাদের নিয়ে অনেক গুজব থাকে, অনেক চটুল কথা প্রচলিত থাকে। গুজব থেকে ঠিক সংবাদ বের করে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টাই থাকে সাংবাদিকের। যে কারণে সোর্সের সব তথ্য চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেন না সাংবাদিকরা। সোর্সের তথ্যকে যাচাই-বাছাই করে তারপর প্রকাশ করেন সাংবাদিকরা।

যে কোনো সংবাদ প্রকাশের আগে তার সত্যতা নির্ধারণ করা সাংবাদিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। হুজুগে কোনো তথ্য বা ছবি প্রকাশ করে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারেন না কেউই। বিনোদনদুনিয়ার তারকাদের গসিপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি থাকে, সেক্ষেত্রেও সতর্ক হয়ে সোর্সের তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রকাশ করতে হয়।

বলিউডে গত বছর নভেম্বরে মাহিরা-রণবীর কাপুর প্রেমের খবর রটেছিল। ফ্রান্সে দু'জনের ধূমপানের এক ছবি বেশ আলোচিত হয়। যে সোর্স থেকে সেই ছবি সাংবাদিকরা সংগ্রহ করেছিলেন, তা তেমন নির্ভরযোগ্য ছিল না, পরে অবশ্য রণবীর-মাহিরা প্রেমের সংবাদ তেমন আলোচিত হয়নি।

তারকারা যখন নিজেই সোর্স

১৯৯২ সালে গোটা ব্রিটেনের পাশাপাশি সেলিব্রেটি দুনিয়া আলোড়িত হয়েছিল প্রিন্সেস ডায়নার ওপর প্রকাশিত এক বই নিয়ে। ব্রিটিশ সাংবাদিক অ্যান্ড্রু মর্টন 'ডায়না: হার ট্রু স্টোরি' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যা কাঁপিয়ে দেয় পুরো ব্রিটেনকে। প্রিন্সেস ডায়নার দাম্পত্য বিরহ, প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কথা প্রকাশিত হয় বইয়ে। বই প্রকাশের পরের দিন ব্রিটিশ রাজপরিবারের কেনসিংটন প্যালেস বইটির সব তথ্যকে অস্বীকার করে। ডায়নার মৃত্যুর পর অ্যান্ড্রু মর্টন বইটির সূত্র প্রকাশ করেন। প্রিন্সেস ডায়না-ই ছিলেন মর্টনের বইয়ের সূত্র। প্রিন্সেস অডিওটেপে নিজের কথা রেকর্ড করে পাঠাতেন মর্টনের কাছে। সেই টেপের সূত্র ধরেই বই প্রকাশ করেন মর্টন। মর্টন টম ক্রুজ, ব্রিটনি স্পিয়ার্স আর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ওপরও বই প্রকাশ করেছেন। বইয়ের অনেক তথ্য আছে, যা তারকারা অস্বীকার করেন; কিন্তু মর্টন জানান, 'তারকাদের ব্যক্তিজীবনের কথা জানা বেশ কষ্টের। শক্তিশালী সংবাদসূত্র ব্যতীত আসলে আপনি কখনোই কোনো সংবাদ বা ছবি প্রকাশ করতে পারেন না।' মর্টন টম ক্রুজের ওপর যে বই লিখেছিলেন, তার প্রধান সূত্র ছিল একদল ধর্মযাজক! টম সায়েন্টোলজি ধর্মবিশ্বাসী, সেই সায়েন্টোলজির ধর্মের ধর্মযাজকরা যারা টমকে চেনেন তাদের বয়ানেই বই লিখেছিলেন মর্টন।

সাংবাদিক বনাম তারকাযুদ্ধ

তারকাদের হরহামেশাই সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হতে দেখা যায়। আবার প্রকাশিত সংবাদ বানোয়াট, মিথ্যা বলে তারকারা অনেক সংবাদ উড়িয়ে দেন। ২০০৭ সালে তো গায়িকা ব্রিটনি স্পিয়ার্স এক সাংবাদিকের গাড়ির ওপর ছাতা দিয়ে আক্রমণ করে বসেছিলেন। টোয়াইলাইট অভিনয়শিল্পী ক্রিস্টিনা স্টুয়ার্ট ২০১৩ সালে প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের শ্বাস নেয়ার অধিকার নেই বলে উচ্চবাচ্য করেছিলেন।

২০১৩ সালের আরেক ঘটনা। তখন বাতাসে খবর রটেছিল মাইলি সাইরাস নাকি লিয়াম হেমসওর্থের সঙ্গে প্রেম করছেন। এক সাংবাদিককে তখন লিয়াম বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখেছিলেন, তা দেখে সেই সাংবাদিককে ধাওয়া দিয়েছিলেন লিয়াম। ২০১০ সালে মাইলি নিজেও একবার এক সাংবাদিককে ঘুসি মেরে আলোচনায় এসেছিলেন। এতো গেল বাড়ির সামনের দৌড়ানো। গায়ক জাস্টিন বিবার তো গাড়ি নিয়ে এক ফটো-সাংবাদিককে চাপা দিয়েছিলেন। কোর্টে দাঁড়িয়ে নিজের ভুল অস্বীকার

করেছিলেন সেবার বিবার। অন্যদিকে লিন্ডসে লোহান গেল কয়েক বছর অভিনয়ের চেয়ে মাদক নিয়েই পত্রিকার শিরোনাম হয়েছিলেন। ছবি তোলার কারণে একবার এক সাংবাদিকের পায়ের ওপর দিয়ে তিনি গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন।

সাংবাদিকের ওপর তারকার কফি ছুঁড়ে মারারও সংবাদ আছে কিন্তু! ২০১০ সালে শিয়া লিবেওফ কফি শপ থেকে বেরিয়ে এক সাংবাদিককে সামনে পান। বলা নেই কওয়া নেই, সেই সাংবাদিকের ওপর কফি ছুঁড়ে মারেন শিয়া।

'আমি সাংবাদিক'

জাইলস হ্যারিসন লন্ডন এন্টারটেইনমেন্ট গ্রুপের প্রধান। তারকাদের ছবি আর সংবাদ সংগ্রহের জন্য বেশ আলোচিত লন্ডন এন্টারটেইনমেন্টের সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা। ভয়েস অব আমেরিকা'তে তিনি কীভাবে ছবি তোলেন, তা নিয়ে বেশ বড় একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। জাইলস জানান, 'আমরা সব ধরনের তারকার ছবি তুলি। ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে শুরু করে মডেলিং দুনিয়া– সবখানেই আমরা আছি। আমি সাংবাদিক বলেই পাঠক-ভক্তরা তারকাদের সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে ছবি আর সংবাদ পায়। আমরা না থাকলে তারকাদের নিজের ঢোল নিজেকেই পেটাতে হতো। আর নিজের ঢোল বেশিদিন পেটানো যায় না, এটা সবাই জানে!' শুধু অর্থ আয়ের জন্যই ছবি বা সংবাদ সংগ্রহ করেন না জাইলস, তিনি জানান, 'আমরা এ পেশায় অর্থ আয়ের জন্য আসিনি। এটা সত্য যে দারুণ কোনো ছবি অনেক অর্থ আয়ের সুযোগ করে দেয়; কিন্তু কজন সাংবাদিক ছবি তোলার আগে অর্থ কিংবা সম্মান নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন?' কীভাবে সংবাদ-ছবি সংগ্রহ করেন– প্রশ্নের উত্তরে জাইলস বলেন, 'আমরা বাড়ির দারোয়ান থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার পাইলটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। তারাই আমাদের সূত্র, তারাই আমাদের ভরসা। আমরা কখনোই আমাদের সোর্সের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করি না।'

জীবনের ঝুঁকি সম্পর্কে জাইলসের ভাষ্য, 'আমি তো ছবি তোলার জন্য হেলিকপ্টারে চড়েছি, এমনকি অনেকবার পানির নিচে ডুবসাঁতার কেটেছি। আগে তো প্রায়ই গোলাগুলির সামনে পড়তে হতো তারকাদের ছবি তোলার জন্য।'

তারকাদের সাক্ষাৎকার

তারকাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। জানতে হবে। কীসের ওপর, কী কারণে, কী বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছেন, তা সম্পর্কে গভীর ও পরিষ্কার জ্ঞান থাকতে হবে। তা না হলে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। কারো সঙ্গে গল্পচ্ছলে সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। আবার কারো সঙ্গে আগে থেকে বলে-কয়ে বেশ একটা সাহেবি কায়দায় সাক্ষাৎকার নিতে হতে পারে। তবে অব দ্য রেকর্ডে কোনো কথা বললে তা প্রকাশ করা উচিত নয়। সব কথা রেকর্ড করে রাখা উচিত। যাতে আপনার দেয়া তথ্য নিয়ে পরবর্তী সময়ে কোনো বিতর্ক না হয়। হলেও যেন আপনি নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে পারেন। প্রমাণ হিসেবে কাজে দেবে।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক প্রথম আলো

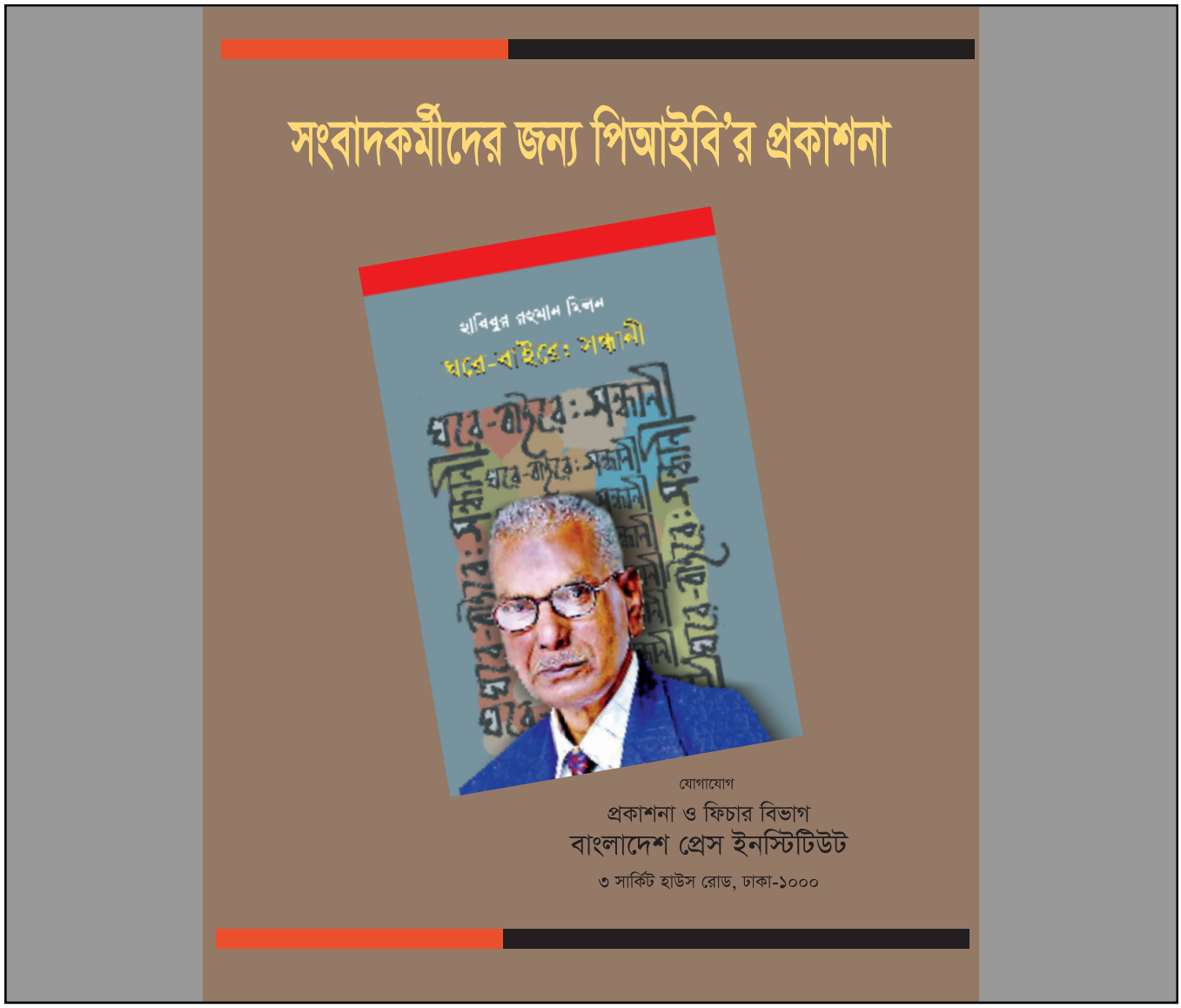

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অতীত ও বর্তমান

কমল চৌধুরী

উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে চলচ্চিত্র আবিষ্কার পূর্ণতা পায়। ফলে গণমাধ্যমের এই ক্ষেত্রটি বিনোদন-তথ্য-শিক্ষাপ্রভাবমূলক মাধ্যম হিসেবে, বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ও নান্দনিক শিল্প হিসেবে বিকশিত, বর্ধিত ও সমাদৃত হতে থাকে। শতবর্ষের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নানা আঙ্গিকে, ধারায় বিষয়ে, শৈলীতে, রঙে রূপে, নীরবে, সরবে নাচ, গান, সংলাপে, দৃশ্যে, সজ্জায় চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-নেতৃত্ব-পরিবেশ-জন সম্পর্কের এক শক্তিশালী মাধ্যম। লেনিন তাই চলচ্চিত্রকে বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে। চলচ্চিত্র শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাকে ধারণ করেছে প্রযুক্তিগতভাবে। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন: 'নাটকের দ্বন্দ্ব, উপন্যাসের কাহিনী ও পরিবেশ বর্ণনা, সংগীতের গতি ও ছন্দ, পেইন্টিং সুলভ ব্যঞ্জনা, এসবই চলচ্চিত্রে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন বিষয় ধারণ করে ও চলচ্চিত্র এর স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।'

বিষয়বস্তু অনুসারে চলচ্চিত্র বিভিন্ন ধারা বা শ্রেণির হয়ে থাকে। যেমন: অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, সাহিত্যভিত্তিক, ঐতিহাসিক, কমেডি, থ্রিলার, গোয়েন্দা, ফ্যান্টাসি, মিউজিক্যাল, বিজ্ঞান-কল্পভিত্তিক, ক্রীড়ামূলক, নাটকীয়, অ্যানিমেশন, জীবনীমূলক, অপরাধমূলক, গ্যাংস্টার, যুদ্ধ ও ওয়েস্টার্ন। চলচ্চিত্রের এ ধরনের শ্রেণি বিভাগকে Genre বা 'জর' বলা হয়ে থাকে। ১৯৩০ ও ১৯৪০ দশকে হলিউডের প্রচলিত বাণিজিক ধারায় নির্মিত চলচ্চিত্রকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বিষয়বস্তু অনুসারে চলচ্চিত্র বিভিন্ন ধারা বা শ্রেণির হয়ে থাকে। যেমন: অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, সাহিত্যভিত্তিক, ঐতিহাসিক, কমেডি, থ্রিলার, গোয়েন্দা, ফ্যান্টাসি, মিউজিক্যাল, বিজ্ঞান-কল্পভিত্তিক, ক্রীড়ামূলক, নাটকীয়, অ্যানিমেশন, জীবনীমূলক, অপরাধমূলক, গ্যাংস্টার, যুদ্ধ ও ওয়েস্টার্ন

পৃথিবীর সকল দেশের মতো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও শিক্ষণীয় বহুকিছু রয়েছে। তাই চলচ্চিত্র শুধু নিছক বিনোদন নয়; এর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বিশ্ব

চলচ্চিত্রের সাথে পূর্ব বাংলা'র (যা এখন বাংলাদেশ) দর্শকের পরিচয় অনেকদিনের। ধ্রুপদি চলচ্চিত্রের সঙ্গেও ব্রিটিশ আমলে এদেশে প্রদর্শিত হতো আমেরিকার হলিউড বিলেতের পইন উডের ইংরেজি ছবি, ভারতের মুম্বাই ও মাদ্রাজি হিন্দি ছবি এবং কলকাতায় নির্মিত বাংলা ছবি। তখন কালেভদ্রে দু'-চারটা ইতালীয়, ফরাসি, জাপানি ছবিও দেখানো হতো। পাকিস্তান আমলে এই অঞ্চল হয়ে পড়ে লাহোরে নির্মিত সামাজিক ও লারে লাপ্পা মার্কা উর্দু ছবির সংরক্ষিত বাজার। মনোপলি মার্কেট। চলচ্চিত্র নির্মাণে স্টুডিও ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা না থাকায় পূর্ব বাংলা'র সিনেমা হলগুলো পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাইরের ছবির প্রদর্শনী কেন্দ্র হয়েই ছিল।

তবে ঢাকায় 'দি লাস্ট কিস' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রয়াসের কথা আমরা জানি। কিন্তু তা ছিল কতিপয় শৌখিন ব্যক্তির খেয়াল মাত্র। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে এখানে চলচ্চিত্র প্রযোজনার সম্ভাব্যতা নিয়ে কিছু গভীর চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়। তবে এই ব্যাপারে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, ১৯৫৩ সালে যখন আবদুল জব্বার খান ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ইকবাল ফিল্মসের ব্যানারে মুখ ও মুখোশ নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেন। কলকাতা থেকে একটি 'আইমো' ক্যামেরা এনে চিত্রগ্রহণের কাজ করা হয়। ল্যাবের সব কাজ করা হয় লাহোরের শাহনুর স্টুডিও'তে। অর্থাৎ কেবল ছবির শুটিং এবং গান রেকর্ডিং-ই পূর্ব বাংলা'য় করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ছবিটি মুক্তিলাভ করে। কাহিনী ও প্রায়োগিক কলাকৌশলগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এতে স্থানীয়ভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টার যাত্রারম্ভ ঘটে। গুণ ও মানের বিচারে যত অনুল্লেখই হোক না কেন, ছবিটি নির্মাতাদের মূল উদ্দেশ্য সাধনে সফলতার জন্য সর্বত্র নন্দিত হয় সংগত কারণেই।

১৯৫৭ সালে সংসদে পূর্ব বাংলা'র যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী বছর থেকেই স্থানীয়ভাবে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি নির্মাণ শুরু হয়।

চলচ্চিত্রের আবিষ্কার, বিকাশ এবং আধুনিক প্রযুক্তির পেছনে বহু বিজ্ঞানীর বহু শতাব্দীর নিরলস শ্রম রয়েছে। চলচ্চিত্র, প্রযুক্তির উৎকর্ষতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিস্ময়কর এই আবিষ্কারের অন্যতম সফল ব্যক্তি ফ্রান্সের ভ্রাতৃদ্বয় অগাস্ট লুমিয়ের ও লুইস লুমিয়ের। ১৮৯৫ সালে প্যারিসে প্রথম এই ভ্রাতৃদ্বয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয় এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কিংবা ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দ্রুত উন্নয়ন লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন শুরু করেন হীরালাল সেন ১৯০৩ সালে। ভারত উপমহাদেশে হীরালাল সেনই চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ। হীরালাল সেনের এক দশক পর ১৯১৩ সালে চুণ্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে (ডিজি ফালকে) প্রথম কাহিনীচিত্র/পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এর প্রায় সাত বছর পর ১৯১৯ সালে ভারত উপমহাদেশে আরেক ইতিহাস সৃষ্টি করেন আর্দেশীর এএম ইরানী। আর্দেশীর এএম ইরানী নির্মাণ করেন প্রথম চলচ্চিত্র 'আলম আরা'। ১৮৯৫ সালে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের ছয় দশক পর ১৯৫৬ সালে আমাদের দেশে আবদুল জব্বার খান নির্মাণ করেন প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'। যেটি আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে বিবেচিত হয়। আবদুল জব্বার খানের হাত ধরে আমাদের চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরুর পর কারিগরি প্রযুক্তির আশানুরূপ উন্নতি না হলেও শুধু স্বপ্ন, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা আর একাগ্রতায় বেশ ক'জন নির্মাতা এগিয়ে আসেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। চলচ্চিত্রের মতো আধুনিক এই মাধ্যমের কারিগরি সমর্থন না থাকার পরও মনের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এ দেশে নির্মিত হয় অনেকগুলো আলোচিত এবং মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র।

আমাদের দেশে ষাটের দশকে নির্মিত বেশকিছু ছবি এশিয়া মহাদেশসহ ইউরোপ, আমেরিকার মতো দেশে প্রদর্শিত ও আলোচিত হয়। বিশেষ করে ১৯৫৯ সালে এ জে কারদারের নির্মিত 'জাগো হুয়া সাভেরা' ইউরোপ ও আমেরিকার মতো দেশে প্রদর্শিত ও আলোচিত হয়। কোনো কোনো দেশ থেকে ভালো চলচ্চিত্রের স্বীকৃতিও অর্জন করে। প্রথমেই স্বীকার করতে হয় ষাটের দশকে ফতেহ লোহানী 'আসিয়া' (১৯৬০), জহির রায়হানের 'কখনো আসেনি' (১৯৬১), 'কাচের দেয়াল' (১৯৬৩), 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০), সালাহউদ্দিনের 'সূর্যস্নান' (১৯৬২), 'ধারাপাত' (১৯৬৩), সুভাষ দত্ত 'সুতরাং' (১৯৬৪), বেবী ইসলাম 'তানহা' (১৯৬৪), সাদেক খান 'নদী ও নারী' (১৯৬৫), সুরুর বারাবাঙ্কভির 'আখেরী ষ্টেশন' (১৯৬৬), খান আতাউর রহমান 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' (১৯৬৭) ও 'সোয়ে নদীয়া জাগে পানি' (১৯৬৮) শিল্পমানসম্পন্ন ছবি নির্মাণ করেন। কাছাকছি সময়ে শিল্পমানসম্পন্ন ও পরিচ্ছন্ন বেশকিছু সামাজিক এবং লোককাহিনীভিত্তিক ছবি নির্মাণ করেন এ দেশের নির্মাতারা। যেমন 'মাটির পাহাড়' (১৯৫৯), 'আকাশ আর মাটি' (১৯৫৯), 'রাজধানীর বুকে' (১৯৬০), 'হারানো দিন' (১৯৬১), 'সংগম' (১৯৬৪), 'দিনের চেনা' (১৯৬৪), 'রূপবান' (১৯৬৫), 'কাগজের নৌকা' (১৯৬৬)।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লোকচাহিদার প্রভাব যথেষ্ট তাৎপর্যময়। উর্দু চলচ্চিত্রের আধিক্যের স্থলে লোককাহিনীর চিত্রায়ণ এবং বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, 'রূপবান' যাত্রার আগমন আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পকে চারভাবে প্রভাবিত করেছে।

(১) লোক ঐতিহ্যের দিকে অর্থাৎ শেকড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পেরেছে।
(২) যাত্রার জনপ্রিয় কাহিনীকে চিত্রায়ণের মাধ্যমে সাধারণ দর্শককে বহুমুখী করতে সহায়তা করেছে।
(৩) বাংলা চলচ্চিত্রের বাজার বৃদ্ধি পেয়েছে।
(৪) উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে বাঙালি পরিচালকের নিরুৎসাহিত কাজ করেছে।

১৯৬৭ সালে 'রহিম বাদশা ও রূপবান'-এর পরিচালক সফদার আলী ভূঁইয়া ঝুমুর যাত্রা'র জনপ্রিয় পালা কাঞ্চনমালা'র কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপ দেন। 'সইফুলমূলক বদিউজ্জামান'-কে চলচ্চিত্রায়িত করেন পরিচালক আজিজুর রহমান (১৯৬৭)। ১৯৬৮ সালে আজিজুর রহমান নির্মাণ করেন ঝুমুর যাত্রা'র নন্দিত পালা 'মধুমালা' এবং ইবনে মিজান নির্মাণ করেন 'রাখালবন্ধু'। এবছর রূপবানের কাহিনী নিয়ে নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণ পরিচালক ই আর খান 'রূপবানের রূপকথা' নামে। ১৯৬৯ সালে ময়মনসিংহ কাহিনীভিত্তিক 'বেদের মেয়ে' ও 'মহুয়া' চিত্রায়িত হয়। 'রূপবান' খ্যাত পরিচালক সালাহউদ্দিন চলচ্চিত্রে রূপ দেন 'আলোমতি প্রেমকুমার' যাত্রাপালার কাহিনীকে।

পরিচালক ইবনে মিজান 'আমীর সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী' নির্মাণ করেন ১৯৭০ সালে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংগত কারণেই বেশি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়নি। ১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'নিমাই সন্ন্যাসী' ও 'লালন ফকির' চলচ্চিত্রের কাহিনী যাত্রা-অপেরার মাধ্যমে সারাদেশে আগেই জনপ্রিয় ছিল। এ দু'টি চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে সিরাজুল (১৯৩৮), সৈয়দ হাসান ইমাম (১৯৩৫)। ১৯৭৬ সালে লোককাহিনী 'কাজলরেখা' চিত্রায়িত করেন সফদার আলী ভূঁইয়া। এ বছর চলচ্চিত্র শিল্পে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম হয়। মোহাম্মদ আলী মিন্টুর পরিচালনায় 'বর্গী এলো দেশে' যাত্রাপালার হুবহু চলচ্চিত্রের রূপ দেয়া হয়। ১৯৭৭ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় 'সাগরভাসা' নামের একটি লোককাহিনী চিত্ররূপ। ১৯৮৪ সালে সফদার আলী ভূঁইয়া নির্মাণ করেন 'রসের বাইদানী' (১৯৮৪)। এটি জনপ্রিয় 'বেদের মেয়ে'র প্রভাবজাত।

১৯৮৫ সালের ৬৫টি চলচ্চিত্রের মধ্যে আজিজুর রহমানের 'রঙিন রূপবান', মতিন রহমানের (১৯৫২) 'রাধাকৃষ্ণ', মহম্মদ হাননানের (১৯৪৯) 'রাই বিনোদিনী' এবং হারুনুর রশীদের (১৯৪০) 'গুনাইবিবি' ছিল লোককাহিনী থেকে নেয়া। ১৯৮৬ সালে ৪টি, ১৯৮৭ সালে ৩টি, ১৯৮৮ সালে ২টি, ১৯৮৯ সালে ৬টি, ১৯৯০ সালে ১টি, ১৯৯১ সালের ৩টি এবং ১৯৯২ সালে ১টি চলচ্চিত্রের মধ্যে লোকজ জীবনের অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৮৯ সাল বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত, মতিউর রহমান পানু (১৯৪০) প্রযোজিত এবং অঞ্জু ঘোষ (১৯৬৬) অভিনীত 'বেদের মেয়ে জোসনা' চলচ্চিত্রটি এই গুরুত্বের প্রধান কারণ।

লোকজ কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক ব্যাপার। প্রতিটি দেশের সাংস্কৃতিক মূলধারার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির গভীর সংযোগ রয়েছে। আশার কথা এই যে, চলচ্চিত্র শুরুর পর্বে লোকনাট্য এবং যাত্রার কাছ থেকে অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতি থেকেই উপাদান গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে। কিন্তু বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পে হিন্দি চলচ্চিত্রের ফর্মুলা নকল করার প্রতিযোগিতা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে পড়েছে। দর্শকরা বেশি চলচ্চিত্র দেখতে এখন আর সিনেমা হলে যাওয়ার আগ্রহ দেখায় না। যে যাত্রা বা লোককাহিনী আমাদের দেশ থেকে আসল উর্দু চলচ্চিত্র হটিয়ে দিয়েছে, সেই যাত্রা বা লোককাহিনী নকল হিন্দি চলচ্চিত্রের প্রভাব তাড়িয়ে সুস্থ ও স্বকীয় ধারা পুনর্নির্মাণ করতে পারে। এ নিয়ে তাই প্রণালিবদ্ধ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় জনমানসে লোককাহিনীর প্রভাব কতটা রয়েছে, তাও অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আরো বিস্তৃত পরিসরে এই গবেষণা হলে জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের ধারণা।

গবেষণার সুবিধার জন্য আমরা সাতটি চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছি যেগুলো লোককাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। এগুলো হলো সালাহউদ্দিনের রূপবান, জহির রায়হানের বেহুলা, ইবনে মিজানের রাখালবন্ধু, দিলীপ সোমের সাত ভাই চম্পা, সফদার আলী ভূঁইয়ার কাজলরেখা, হারুনুর রশীদের গুনাইবিবি এবং তোজাম্মেল হক বকুলের বেদের মেয়ে জোসনা।

রূপবান গ্রাম-বাংলা প্রচলিত ও জনপ্রিয় লোককাহিনীর থেকে নির্মিত চলচ্চিত্র। রূপবান কাহিনীতে লোকাচার ও লোক-অনুষ্ঠান হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান, বাসররাত, লোকবিশ্বাস প্রভৃতি। লোকসুরের আধিক্য এবং দ্বন্দ্বমুখর কাহিনীর কারণে রূপবান বাঙালির লোকজীবনের চিরায়ত রূপরেখা হয়ে উঠেছে। বেহুলা চলচ্চিত্র চিরায়ত পৌরাণিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। পৌরাণিক কাহিনীর চিত্রায়ণকে আমরা লোকজ জীবনের চিত্রায়ণ বলে বিবেচনা করতে পারি। বেহুলার কাহিনী সনাতন জীবনধারায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে। রাখালবন্ধু কাহিনীতে লোকসংগীতের প্রয়োগের মাধ্যমে এই কাহিনীকে লোকজীবনঘনিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে। রাখালবন্ধু চলচ্চিত্র ফোক-ফ্যান্টাসিতে পূর্ণ। গ্রামের পরিবেশ, নদীতীরে গরু চরানোর মাঠ, নৌকাবিলাস, পালকিযাত্রা

সবকিছু মিলিয়ে লোকজ আবহ সৃষ্টির চেষ্টা রয়েছে। সাত ভাই চম্পা চলচ্চিত্রে লোকজীবনের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। রানীদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে ছয় ছেলে ও এক মেয়ে ফিরে পাওয়ার কাহিনীর মধ্য দিয়ে সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে। রূপকথার কাহিনী কাজলরেখায় লোকশিক্ষার কিছু উপাদান থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা যায়। গুনাইবিবির পালা জনপ্রিয় কাহিনীর পুনর্বিন্যস্ত চিত্ররূপ। চিত্রায়ণের প্রয়োজনে মূল কাহিনীর কিছু বিচ্যুতি ঘটলেও তাতে প্রকৃত রস ও সুর নষ্ট হয়নি। এতে রূপায়িত প্রতিটি দৃশ্যই লোকজীবন থেকে নেয়া। লোকগাথার রূপায়ণের কারণে গুনাইবিবি জনমনে আকর্ষণ করেছে। বেদের মেয়ে জোসনা জনপ্রিয়তার পেছনেও হয়তো বাঙালি দর্শকের ঐতিহ্যপ্রীতি ক্রিয়াশীল। সর্পবিশ্বাসও এই অঞ্চলের মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। লোকজ গানের সুর ও শারীরিক কসরত ও সর্বোপরি লোকজ জীবনের চিত্রায়ণ এই চলচ্চিত্র পূর্ণতা পাওয়ার কারণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের লোককাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে লোকসংগীত। বাঙালির প্রাণের এই সম্পদ লালন ও প্রচার করার ক্ষেত্রে আলোচিত চলচ্চিত্রগুলোর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকজ জীবনের সন্ধান করতে লোককাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্রের কাছে বারবার ফিরে যেতে হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোকপাতের আগে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ও বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তন ধারায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটি সস্তা বাণিজ্যমুখী জনরুচির অস্তিত্ব, জনচেতনা, দায়বদ্ধতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ ভঙ্গিমা থেকে। মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে পরিচালন পদ্ধতি, সম্মুখ যুদ্ধ, অবরুদ্ধ জীবন, শরণার্থী জীবন, প্রবাস জীবন, পেশাগত অবস্থান, পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ, নারী ও শিশু নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, রাজাকার-আলবদর-আল শামসদের ভূমিকা, বিদেশি সাহায্য, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং চূড়ান্ত বিজয় প্রভৃতি। এসব ঘটনাবলি চলচ্চিত্র নির্মাণে অবশ্যই বিবেচ্য।

যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও যন্ত্রপাতির প্রভাব আধুনিক সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নয়ন এবং বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশ্চাত্যের বহু দেশের বহু বিজ্ঞানীর বহু বছরের সাধনায় বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত মাধ্যমে চলচ্চিত্রের আবিষ্কার পূর্ণতা পায় উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে। ফ্রান্সের লুইস লুমিয়ের ও অগাস্ট লুমিয়ের নামে দু'ভাই তাদের আবিষ্কৃত সিনেমাটোগ্রাফ বা চলচ্চিত্র রাজধানী প্যারিসের গ্র্যান্ড ক্যাফে'তে ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শন করেন। অতঃপর খুব শিগগিরই নতুন আবিষ্কৃত এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি বিভিন্ন দেশে গণবিনোদন পণ্য হিসেবে দর্শকপ্রিয়তা পায়। এর অংশ হিসেবে ব্যবসায়ীদের হাত ধরে 'সিনেমাটোগ্রাফ' বা চলচ্চিত্র ১৮৯৮ সালের এপ্রিলে অবিভক্ত বাংলার ঢাকা ও ভোলায় প্রদর্শিত হয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর খবর সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ঘটনার মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে মানিকগঞ্জের হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) কলকাতায় ১৯০১ সাল হতে মঞ্চস্থ বিভিন্ন নাট্যাংশ এবং অন্যান্য বিষয়ের দৃশ্য মুভি ক্যামেরায় তোলা শুরু করেন। তাঁর তোলা স্বল্পদৈর্ঘ্যের বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে রয়েছে আলীবাবা (১৯০১), হরিরাজ (১৯০১), ভ্রমর (১৯০১), স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫), বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৩) প্রভৃতি। বাঙালির মধ্যে হীরালাল সেনই প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নির্মাণ ও প্রযোজনা করেন বলে তাঁকে 'বাংলার পথিকৃৎ চলচ্চিত্রকার' বলা হয়।

অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় সেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণের স্টুডিও এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গড়ে ওঠে। আর তখনকার পূর্ব বাংলা হয়ে ওঠে কলকাতা, মুম্বাই, লাহোর ও ইউরোপ-আমেরিকার চলচ্চিত্রের বাজার। এমন পরিস্থিতিতে ত্রিশের দশকে ঢাকার নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে নির্মিত হয় নির্বাক স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র 'সুকুমারী' (১৯২৭-'২৮) ও পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র 'দি লাস্ট কিস বা শেষ চুম্বন' (১৯৩১)। ওই দু'টি ছবির প্রিন্ট পরবর্তী সময়ে চিরতরে হারিয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর রাজধানী ঢাকায় সরকারিভাবে ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা এফডিসি স্থাপিত ও চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। এর আগে ল্যাবরেটরিহীন নির্মিত হয় তথ্যচিত্র নাজির আহমদের 'ইন আওয়ার মিডস্ট' (১৯৪৮), প্রামাণ্যচিত্র 'সালামত' (১৯৫৪) এবং আবদুল জব্বার খানের সবাক বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬)।

যখন কোনো চলচ্চিত্র বিষয়বস্তু, নির্মাণশৈলী, আঙ্গিক, আদর্শ ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে অন্য একটি চলচ্চিত্রের অনুরূপ হয়ে যায় তখন সেটি একটি শ্রেণি বা ধারায় রূপ নেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের শ্রেণি বা ধারার অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন ফ্রান্সের আঁভাগার্দ, ইতালির নব্যবাস্তববাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টার্ন ইত্যাদি। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বা ধারার উদ্ভব হয়েছে। এ ধারা এসেছে বাণিজ্যিক কারণে, কখনো নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে, কখনো দায়বদ্ধতা, শিক্ষা, রুচি ও মেধার প্রেক্ষাপটে।

১৯৫৬ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে কয়েকটি ধারা লক্ষণীয়, যেমন:

১. সামাজিক চলচ্চিত্র।
২. উর্দুভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র (১৯৫৯-১৯৭০)।
৩. লোকগাথা ও রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র।
৪. ইতিহাস ও গণআন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র।
৫. মারদাঙ্গা চলচ্চিত্র।
৬. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র।
৭. স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।
৮. প্রামাণ্যচিত্র।
৯. অন্যান্য চলচ্চিত্র (অশ্লীল, প্রতিহিংসাপরায়ণ, কুরুচিপূর্ণ)।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এসে যায় ইতিহাস ও গণআন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্রের কথাও। চলচ্চিত্রের নির্মাণ ধারায় বিষয়বস্তু হলো যুদ্ধ, আন্দোলন, লড়াই। বাঙালির যুদ্ধ অভিজ্ঞতার তালিকায় রয়েছে ১৭৫৭ সালের পলাশীর ঘটনা, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, মাস্টার দা সূর্যসেনের সশস্ত্র অভিযান, শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন এবং বারো ভূঁইয়াদের সংগ্রামের ঘটনা। এসব যুদ্ধ-সংগ্রাম-আন্দোলন, বিদ্রোহের কথা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সকল আন্দোলন বাঙালিদের যুদ্ধভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়িয়ে দেয়। বিশ শতকে সমগ্র বিশ্বের মতো বাংলাদেশের মানুষেরও অভিজ্ঞতার তালিকায় যুক্ত হয় দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও। প্রথম মহাযুদ্ধে বাঙালিদের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার ৪৯ নং বাঙালি পাল্টন নামে আলাদা রেজিমেন্টও গঠন করে নিজেদের স্বার্থে সে অভিজ্ঞতার ছাপও পড়ে বাঙালিদের মননে।

কলকাতায় নির্মিত কয়েকটি চলচ্চিত্র যেমন 'পথের দাবী' (১৯৪৬), 'জয়তু নেতাজী' (১৯৪৭), 'দেবী চৌধুরানী' (১৯৫৯), 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' (১৯৪৯), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯৫২), 'বাশের কেল্লা' (১৯৫৩) প্রভৃতিতে যুদ্ধ, বিপ্লবী চেতনা ও প্রতিরোধের ছাপ রয়েছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নির্মিত হয়েছে যেমন: ওরা এগার জন, সংগ্রাম, রক্তাক্ত বাংলা, আলোর মিছিল, আবার তোরা মানুষ হ, ধীরে বহে মেঘনা, মেঘের অনেক রং, অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী। অবশ্য বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ওপর এ পর্যন্ত বহু টেলিফিল্ম ও নাটক নির্মিত হয়েছে।

বাংলা চলচ্চিত্রে ১৯৫৬ সাল থেকে উল্লেখ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম উল্লেখ করা হলো:

আমিনুল হক, ইনাম আহমেদ, সাইফুদ্দিন, কাজী খালেক, আনসিমা খান, সুমিতা দেবী, সুলতানা জামান, গোলাম মুস্তাফা, ডা. রওশন আরা, রহমান, শবনম, নারায়ণ চক্রবর্তী, চিত্রা সিনহা, আজিম, আশীষ কুমার লৌহ, আনোয়ার হোসেন, খলিল, শাবানা, শওকত আকবর, আনোয়ারা, সৈয়দ হাসান ইমাম, সুজাতা, রোজী, ফতেহ লোহানী, হারুন, খান জয়নুল, কবরী, বেবী জামান, আলতাফ, টেলিসামাদ, রাজ্জাক, সুচন্দা, নাদিম, ববিতা, এটিএম শামসুজ্জামান, মতি, উজ্জ্বল, সুচরিতা, জাফর ইকবাল, নূতন, আহমেদ শরিফ, ফারুক, প্রবীর মিত্র, ওয়াসিম, অলিভিয়া, জসিম, বুলবুল আহমেদ, আলমগীর, সোহেল রানা, অঞ্জনা, রোজিনা, মিজু আহমেদ, ইলিয়াস কাঞ্চন, রাজীব, অঞ্জু ঘোষ, মান্না, চম্পা, হুমায়ুন ফরিদী, দিতি, রুবেল, মিশা সওদাগর, নাঈম, শাবনাজ, ওমর সানি, সালমান শাহ, মৌসুমী, আমিন খান, শাবনূর, রিয়াজ, ফেরদৌস, পপি, শাকিল খান, পূর্ণিমা, শাকিব খান, অপু বিশ্বাস, ময়ূরী প্রমুখ।

বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কোনো না কোনোভাবে (সিনেমা হল বা টিভি পর্দায়) বাংলা চলচ্চিত্র দেখে থাকে। আমিও ছোটবেলা থেকেই বাংলা চলচ্চিত্র দেখে আসছি। একসময় বাংলা চলচ্চিত্র পরিবারের সবাইকে নিয়ে উপভোগ করা যেত। মাঝখানে অবশ্য বাংলা চলচ্চিত্রে পাশ্চাত্যের মতো অশ্লীলতা দেখা দেয়। বর্তমানে চলচ্চিত্রে অবশ্য অশ্লীলতা বহুলাংশেই কমে গেছে। চলচ্চিত্রে বর্তমানে অত্যাধুনিকতা থাকলেও সুস্থ বিনোদন রয়েছে। বাংলা শিক্ষণীয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে এদেশে শিক্ষণীয় আরো বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ করা উচিত।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর লোকজীবনের উপস্থাপনা (ড. তপন বাগচী)
২. আমাদের চলচ্চিত্র (মো. ফখরুল আলম)
৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র (অনুপম হায়াৎ)।

লেখক: সাংবাদিক

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন

মো. আবদুল রকিব খান

দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সংরক্ষণের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নগদে বা বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ, নান্দনিক ও বিনোদনমূলক ছবি নির্মাণের সহযোগিতা প্রদানকারী একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে করপোরেশনের সেবা গ্রহণকারীদের যথাসময়ে উন্নত সেবা প্রদান করা এবং কোনো অভিযোগ দায়ের করলে দ্রুততম সময়ে তা নিষ্পত্তি করে অবহিত করা।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র বিএফডিসির সৃষ্টিতে আছে গৌরবময় এক ইতিহাস। এই ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন বিল উত্থাপন করেন এবং বিলটি পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বিএফডিসি তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যা সৃষ্টির পর থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণে নির্মাতাদের কারিগরি ও বাণিজ্যিক সহায়তা দিয়ে আসছে। প্রকাশনা ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন ও সরকারি প্রচারে ভূমিকা রাখছে। এই সংস্থার মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ ছাড়াও প্রামাণ্যচিত্র, সরকারি প্রচারচিত্র ও সংবাদচিত্র নির্মাণ করা হয়। এটি একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র বিএফডিসির সৃষ্টিতে আছে গৌরবময় এক ইতিহাস। এই ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ইতিহাস

১৯৫৭ সালের আগে বাঙালিদের চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ-সুবিধাসহ কোনো ফিল্ম স্টুডিও ছিল না। চলচ্চিত্র নির্মাণের

যাবতীয় প্রযুক্তির সুবিধাসংবলিত স্থাপনাকে স্টুডিও বলে। পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনো সুযোগ ছিল না। কোনো বাঙালির যদি চলচ্চিত্র নির্মাণের সাধ জাগত, তবে নেগেটিভ নিয়ে যেতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে। প্রক্রিয়াকরণ শেষে আনতে লাগত কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে নানা পর্যায়ে চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তান শাসকদের ঔদাসীন্যের কারণে তা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারেনি।

পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্ভাসিত গোটা বাঙালি জাতি। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতন আর নিপীড়নের জাঁতাকলে পিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অংশ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের এক বছর পর ১৯৫৩ সালে নাজির আহমদ পরিচালিত 'সালামত' ছবিটি মুক্তি পেলে ঢাকায় চলচ্চিত্র স্টুডিও গড়ে তোলার দাবি ক্রমশ জোরদার হতে থাকে।

১৯৫৬ সালে অবাঙালি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের চ্যালেঞ্জ করে ১৯৫৪ সালে প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ থেকে শুরু করে বিশাল সংগ্রামের মাধ্যমে এ দেশের চলচ্চিত্রের জনক আবদুল জব্বার খান ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট স্টুডিও ল্যাবরেটরি ছাড়াই নির্মাণ করেন বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক কাহিনীচিত্র 'মুখ ও মুখোশ'। কলকাতা ও লাহোর চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট মানুষজনকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব মেধা দিয়ে মুক্তি দিলেন এ দেশের প্রথম ছবি।

এটি ছিল এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা, ভাষা আন্দোলনের চেতনার ফসল এবং চলচ্চিত্র সংস্কৃতির দিগন্তে উদিত প্রথম প্রত্যাশার সৃষ্টি।

'মুখ ও মুখোশ' মুক্তি পেলে ঢাকায় একটি চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি অনুভূত হয়। এর পূর্বে বেসরকারিভাবে স্টুডিও স্থাপনের জন্য অনেকেই চেষ্টা করেন। 'পূর্ব পাকিস্তানে আধা সরকারি ফিল্ম স্টুডিও নির্মাণের সিদ্ধান্ত'-এ শিরোনামে ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বেগমের একটি সংবাদের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়।

ক্যাপ্টেন জায়েদীর হাতে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম ফিল্ম স্টুডিও ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। গভর্নর ফ্রেডারিকবানও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আঁতুড়ঘরেই এর মৃত্যু হয়।

১৯৫১ সালে ন্যাশনাল স্টুডিও অ্যান্ড সিনে ল্যাবরেটরি নামের একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকায় জন্ম নেয়। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারেনি। ব্যাংকের পরিচালক জে আর্থার ১৯৫৩ সালে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে স্টুডিও স্থাপনের চেষ্টা করে অনুমোদন পাননি।

১৯৫৫ সালের ১৯ জুন ঢাকায় উদ্বোধন করা হয় সরকারি ফিল্ম ডিভিশন ল্যাবরেটরি। কিন্তু পরিপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই সময় বেসরকারিভাবে স্টুডিও নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন ড. সাদেক। অনুমোদনের জন্য একটি ফিল্ম স্কিম সরকারের কাছে জমা দেন।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬-১৯৫৭ অর্থবছরে ফিল্ম স্টুডিওর জন্য লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে চলচ্চিত্রের জন্য একটি সংস্থা গঠন করে এক কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দের দাবি তোলেন প্রাদেশিক চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান নাজীর আহমদ।

সরকার যাতে নিজেই ফিল্ম স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করে, এজন্য ড. সাদেকের পরামর্শে আবদুল জব্বার খান দেখা করেন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুরের সঙ্গে। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। চট্টগ্রামের মাহমুদন্নবী মন্ত্রী হলে জব্বার খান তার সঙ্গেও দেখা করেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব তোলে ধরেন। মন্ত্রী মাহমুদন্নবী পরামর্শ দেন বিষয়টি শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তুলে ধরার জন্য। সংশ্লিষ্ট সবাই উৎসাহিত বোধ করেন। কারণ যুক্তফ্রন্টের তরুণ মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে সবাই জানেন।

নাজির আহমদ তখন শিল্প দপ্তরের সচিব। তিনি আজগর আলী শাহ এবং শিল্প দপ্তরের উপসচিব আবুল খায়েরের মাধ্যমে বিষয়টি শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিতে আনেন। বঙ্গবন্ধু সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে অতিসত্বর স্টুডিও প্রতিষ্ঠার বিলের একটি খসড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে নির্দেশ দেন।

তথ্য বিভাগের সহকারী পরিচালক সামসুদ্দিন আবুল কালাম, ড. সাদেক, নুরুজ্জামান এবং আবদুল জব্বার খান একটি প্রস্তাব তৈরি করেন। ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্টে স্টুডিও অ্যাক্ট ১৯৫৭। প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন শেষ হওয়ার মাত্র দুই দিন বাকি। সবাই মিলে বিলের খসড়া বঙ্গবন্ধুর হাতে তোলে দেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল সকালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের শেষদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র

উন্নয়ন সংস্থা' বিল উত্থাপন করেন। সামান্য সংশোধনের পর বিলটি বিনা বাধায় আইন পরিশোধে পাস হয়। বাঙালি জাতির অনেকদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়। সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম চলচ্চিত্র তৈরির সুযোগ বাঙালি জাতির হাতে আসে। এক বছর পর ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ইপিএফসিসি))। এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে থাকে ১৯৬০ সাল থেকে। নিয়মিত প্রতিবছর চলচ্চিত্র মুক্তি পেতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করতে কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়।

প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি শুটিং ফ্লোর, সাদা-কালো ল্যাবরেটরি, স্বল্পসংখ্যক যন্ত্রপাতি, ৫১ লক্ষ টাকা ও ২০ জন কর্মচারী নিয়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জহির রায়হান স্টপ জেনোসাইটসহ কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রযোজনা করেন।

আলমগীর কবির নির্মাণ করেন লিবারেশন ফাইটার্স। চাষী নজরুল ইসলাম নির্মাণ করেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র ওরা ১১ জন (১৯৭২)।

নির্মাণশৈলী, কারিগরি উৎকর্ষ, নান্দনিকতা, জীবন ও সমাজ, গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি কারণে বেশ কিছু চলচ্চিত্র স্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে। যেমন- সংগ্রাম, রক্তাক্ত বাংলা, বাঘা বাঙালি, ধীরে বহে মেঘনা, আবার তোরা মানুষ হ, মেঘের অনেক রং উল্লেখযোগ্য।

বেশ কিছু চলচ্চিত্র দেশ-বিদেশে পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছে। জাগো হুয়া সাভেরা সর্বমোট ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। ষাটের দশক বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ। '৮০-এর দশকে রমরমা ব্যবসা। '৯০-এর দশক থেকে ভিসিআর ও ভারতীয় ছবির প্রভাব। সস্তা অনুকরণের মাধ্যমে দেশীয় ছবির স্বকীয়তা বিসর্জন। এরপর চলচ্চিত্রে চরম অশ্লীলতা এবং দেশীয় চলচ্চিত্রের ভাবমূর্তি ধ্বংস, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত রুচিশীল দর্শকদের হল থেকে বিদায়। বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার না জানা। সৃজনশীল নির্মাতাদের অভাব। তাই বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পের দুঃসময়।

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র শিল্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রপ্তানি পণ্য। ১৯৯৭ সালে শুধু চলচ্চিত্র শিল্প থেকে আয় করে ত্রিশ বিলিয়ন ডলার। বলা হয়, অসংখ্য গ্রন্থ যে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে না, একটি চলচ্চিত্র তা সহজে পারে। যদি তার বিষয়বস্তু ও নির্মাণশৈলী উঁচুমাপের হয়।

চলচ্চিত্র অত্যন্ত সহজলভ্য ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় করার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। চলচ্চিত্র যুগ যুগ ধরে মানুষের বিনোদনের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এতে মানুষের জীবনসংগ্রাম ও সমাজ বাস্তবতার চিত্র প্রতিফলিত হয়।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তার, জাতি গঠন ও সুন্দর সমাজ নির্মাণে চলচ্চিত্র শক্তিশালী ভূমিকা রেখে চলেছে। এটি শুধু বিনোদন মাধ্যম নয়। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের রূপকার। নান্দনিক ও মননশীল কর্মের জন্য বৈপ্লবিক ক্ষমতার অধিকারী। সমাজ উন্নয়নে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মল বিনোদন, শিক্ষার প্রসার, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অপরদিকে অশ্লীল ও নিম্নরুচির চলচ্চিত্র যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটানোসহ সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

* ২০১২ সালে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।
* বিশ্বমানের ডিজিটাল ফরমেটের চলচ্চিত্র নির্মাণের সব সেবা এফডিসিতে সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে।
* বৃদ্ধি করা হয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে চলচ্চিত্র অনুদানের পরিমাণ।
* প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বমানের চলচ্চিত্র আর্কাইভ।
* চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালকরা কর রেয়াতসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন।
* চলচ্চিত্র শিল্পে মেধাবী ও সুদক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
* আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এফডিসি ডিজিটাল যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।
* জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
* আধুনিক ও ডিজিটাল সিনেমা হল নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
* অসচ্ছল চলচ্চিত্রশিল্পী ও কলাকুশলীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ও চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
* চলচ্চিত্র রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
* ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মহতি উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এফডিসি আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
* সরকারের ব্যাপক কার্যক্রম ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে চলচ্চিত্র শিল্প এখন পুনর্জাগরণের পথে।
* গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় কবিরপুরে ১০৫ একর জমিতে চলচ্চিত্রের আউটডোর সুটিং সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নগরী এবং পর্যটন কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন ছিল আউটডোর সুটিংয়ের ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি চলচ্চিত্র নগরী প্রতিষ্ঠা করা, যা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় রয়েছে। চলচ্চিত্রবান্ধব বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালের ৪ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি নামে চলচ্চিত্র নগরী গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গাজীপুরের কবিরপুরে ১০৫ একর জমি ও প্রথম পর্যায়ে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এ কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই, চারতলা ডরমেটরি ভবন নির্মাণ, বাগান, লেক ও পুকুরঘাট, গ্রাম্যবাজার, বাড়ি, ব্রিজ, রেস্টুরেন্ট নির্মাণ, ব্যাটারিচালিত নৌকা, শিশুদের বিনোদনের গাড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গড়ে তোলা হবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নগরী, যা চলচ্চিত্র নির্মাণ সেবাকেন্দ্রই নয়, হবে পর্যটন স্পট, পাহাড়, ঝরনা, বিনোদন পার্ক, জাদুঘর, সিনেপ্লেক্স, কনভেনশন হল, তারকা হোটেলসহ বিভিন্ন সুটিং স্পট।

বিএফডিসি-এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিশ্বমানের ডিজিটাল প্রযুক্তি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। সম্পাদনার মধ্যে হালনাগাদ সফটওয়্যারবিশিষ্ট এডিটিং মেশিন, কালার গ্রেডিং ও কারেকশন মেশিন, অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রজেক্টর ও শব্দগ্রহণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের জুম লেন্স ও লাইট, সেন্ট্রাল স্টোরেজ জিমি জীবসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। বিএফডিসি-এর স্টুডিও, ফ্লোরসমূহ ব্যাপকভাবে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। বিশ্বমানের ডিজিটাল প্রযুক্তির চলচ্চিত্র নির্মাণে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

একটি প্রশ্ন

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের কারখানা তথা চলচ্চিত্র নির্মাণের পথ সুগম করে দিয়ে চলচ্চিত্রকে আজকের অবস্থানে আনার জন্য সেদিনের সেই তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান হিমালয়ের চূড়ার সমান। সেদিন যদি কোনো কারণে বিলটি উত্থাপন না করতেন বা করতে না পারতেন, তা হলে এদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। বাঙালিরা হয়তো ছবি ঠিকই নির্মাণ করত তবে তা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের কলাকুশলী, প্রযুক্তি ও সাহায্যনির্ভর। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাঙালিদের জীবনধারা তুলে ধরা প্রতিনিয়ত হতো বাধাগ্রস্ত।

সূত্র

তথ্য মন্ত্রণালয়, এফডিসি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও পত্রিকা।

লেখক: সাংবাদিক

বিনোদন গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপনা

রীতা ভৌমিক

গণমাধ্যম একটি শিল্প সংস্থা। বিনোদন গণমাধ্যমে চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে নারী মডেল, অভিনেত্রীর ছবি ব্যবহার করা হয়, যা কখনো ইতিবাচক, কখনো নেতিবাচক ইমেজ তৈরি করে। নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে একজন অভিনেত্রীকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে– এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এখানে একজন বিনোদন গণমাধ্যমকর্মীকে জেন্ডার গণমাধ্যম নীতিমালা সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ বিনোদন গণমাধ্যমে চলচ্চিত্র, নাটক ও বিজ্ঞাপনে নারীর শরীরের বাঁক দেখান অথবা অর্ধনগ্ন ছবি উপস্থাপন করছে। তা দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী শিখছে! পাঠককে খাওয়ানোর জন্য নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রুচিশীল পাঠক তৈরিতে জেন্ডার সংবেদনশীল সংবাদ ও ছবি উপস্থাপন করা দরকার। বিনোদন সাংবাদিকতায় জেন্ডার ইন মিডিয়া বিষয়টি যুক্ত হওয়া দরকার।

বিনোদন গণমাধ্যমে নারী তারকাদের কখনো কখনো খোলামেলা পোশাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের দেশের গণমাধ্যম অন্যান্য দেশের গণমাধ্যম থেকে পিছিয়ে নেই। ধরা যাক, ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও বলিউডের অভিনেত্রী আনুশকা শর্মার বিয়ের সংবাদ। দৈনিক যুগান্তরে ২০১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর 'প্রেম-বিচ্ছেদ তারপর বিয়ে' শিরোনামে সংবাদে বিরাট কোহলির পরনে টি-শার্ট আর আনুশকা শর্মার পরনে আকাশি ফিনফিনে জর্জেটের স্লিভলেস কামিজের কোমরের অংশ থেকে ডানদিকে ফাড়া। এর ভেতর থেকে সাদা রঙের প্যান্টির একাংশসহ নগ্ন পা

বিনোদন গণমাধ্যমে নারী তারকাদের কখনো কখনো খোলামেলা পোশাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের দেশের গণমাধ্যম অন্যান্য দেশের গণমাধ্যম থেকে পিছিয়ে নেই

বেরিয়ে এসেছে। ফিনফিনে জর্জেটের ভেতর থেকে পুরো শরীরের নগ্নতা ফুটে উঠেছে। বিরাট কোহলিকে কিন্তু সেভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। আনুশকা শর্মা একজন বলিউড অভিনেত্রী এবং নারী বলেই কি এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে! এখানে তার নগ্ন শরীর দেখানোর প্রয়োজন আদৌ কি ছিল!

যুগান্তরে ২০১৫ সালের ১২ নভেম্বর তারা ঝিলমিলে 'এগিয়ে যাচ্ছেন আইরিন' শিরোনামের প্রতিবেদনে মডেল ও অভিনেত্রী আইরিন সুলতানার একটি ছবি ছাপা হয়। তার পরনে জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে নাভি থেকে বুক পর্যন্ত পুরো অংশই অনাবৃত। বোতাম খোলা কোটের ফাঁক দিয়ে বেরুনো নগ্নতা ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেখাচ্ছে কি? নারী অভিনেত্রী যখন খোলামেলা পোশাক পরে পত্রিকার খবর হন, সমাজ তাকে বলে মেয়েটি কেন সংযত হলো না। কিন্তু যিনি ওই ছবিটি গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তাকে কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেন না।

সাংবাদিকতার তত্ত্বই সংবাদপত্রে নারীর অপরূপায়ণকে উৎসাহিত করে। যেমন– স্ট্যানলি ওয়াকারের দেয়া খুব পরিচিত একটি সংজ্ঞা অনুসারে 'Women, wampum and wrongdoing; sex, money, crime'-ই হলো সংবাদ। যৌনতা, অর্থ, অপরাধ– এ তিন বিষয়ের সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে খুব সহজেই নারীকে যুক্ত করে দেয়া যায়। সংবাদপত্রে তাই নারীকে দেখা যায় যৌনতা ও অপরাধের অনুষঙ্গ হিসেবে। বিনোদন গণমাধ্যমে সংবাদের আকার ছোট হয়ে মডেল, অভিনেত্রীর খোলামেলা ছবি বড় আকারে ছাপা হয়। সেখানে তাকে যৌন আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার দৈনিক ও সাপ্তাহিক বিনোদন পাতায় প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে হলিউড, বলিউড এবং ঢাকাই ছবির নায়িকাদের খোলামেলা পোশাকের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। দৈনিক যুগান্তরের বিনোদন পাতা 'আনন্দনগর' ও সাপ্তাহিক 'তারা ঝিলমিল'-এর ২০১৭ সালের ৮ আগস্ট প্রকাশিত 'নতুন গান নিয়ে প্রিয়াঙ্কা' শিরোনামের প্রতিবেদনে প্রিয়াঙ্কার বুক খোলা ম্যাক্সি পরিহিত ছবি, ৩ অক্টোবর '১৫০ পেরিয়ে ঢাকা অ্যাটাক' শিরোনামে ঢাকা অ্যাটাকের নায়িকা মাহিয়া মাহির পরনে মিনি হাফপ্যান্ট, ৫ অক্টোবর 'অপেক্ষায় বিদ্যা সিনহা মিম' শিরোনামে প্রতিবেদনের ছবিতে বিদ্যা সিনহা মিমকে যৌন আবেদনময়ী নারীরূপে উপস্থাপনা করা হয়েছে। ১৪ অক্টোবর নায়িকা সিমলার খোলামেলা পোশাক পরিহিত ছবি ছাপা হয়। ১৮ অক্টোবর 'ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি কেট' শিরোনামের প্রতিবেদনে অস্কারজয়ী অভিনেত্রী কেট উইন্সলেটের বুক খোলা গাউন পরিহিত ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। ২৬ অক্টোবর 'সেলেনার নতুন জীবন' শিরোনামের প্রতিবেদনে সেলেনা গোমেজের বুক খোলা ছবি প্রকাশ করা হয়। ২ নভেম্বর 'গেমারদের গল্প' শিরোনামে গেম রিটার্নস ছবির নায়িকা লাবণ্যর পরনে শর্ট ব্লাউজ বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে কি?

দৈনিক প্রথম আলোর বিনোদন পাতা 'বিনোদন'-এ ২০১৬ সালের ৯ ডিসেম্বর 'লুকোচুরি করেন না আনুশকা' শিরোনামের প্রতিবেদন ও যুগান্তরে ২০১৭ সালের ৭ ডিসেম্বরে প্রকাশিত বিরাট কোহলির পরনে টি-শার্ট আর আনুশকা শর্মার পরনে আকাশি ফিনফিনে জর্জেটের স্লিভলেস কামিজের কোমরের অংশ থেকে ডানদিকে ফাড়া ওই ছবিটি ছাপা হয়েছিল। কালের কণ্ঠের বিনোদন পাতা রঙের মেলায় ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি 'এগিয়ে আনুশকা' শিরোনামের প্রতিবেদনেও একই ছবি ছাপা হয়েছে। এতে হয়তো বিনোদন সাংবাদিকরা ধরেই নিয়েছেন আনুশকা শর্মার খোলামেলা এই একটি ছবি পাঠক ও দর্শকদের মনে নাড়া দেয়া যাবে। ১৮ ডিসেম্বর 'এতে লজ্জার কী আছে! কারিনা কাপুর' শিরোনামে প্রতিবেদনে গর্ভবতী কারিনা কাপুরের মাতৃত্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ছবিটি একজন নারীর মাতৃত্বকে ইতিবাচক অর্থে তুলে ধরা হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর 'বন্ধুত্ব শেষ' শিরোনামের প্রতিবেদনে হলিউড জনপ্রিয় দুই তারকা সেলেনা গোমেজ ও টেলর সুইফটের প্রায় অর্ধাংশ নগ্ন ছবি প্রকাশ করা হয়। বন্ধুত্ব শেষের সঙ্গে এ ধরনের ছবির আদৌ কোনো মিল রয়েছে কিনা, তা সত্যি ভাবার বিষয়। ২০১৭ সালের ১০ জানুয়ারি হলিউড তারকা এমা স্টোন ও মেরিল স্ট্রিপের বুক ফাড়া পোশাকের ছবি প্রকাশ করে পাঠককে সুড়সুড়ি দেয়ার ইঙ্গিত বহন করছে।

দৈনিক সমকালের বিনোদন পাতা 'আনন্দ প্রতিদিন' ও সাপ্তাহিক 'নন্দন' পাতায় ২০১৭ সালের ১০ জানুয়ারি গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে হলিউড ও বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বুক খোলা পোশাক পরিহিত ছবি, ১৯ জানুয়ারি অভিনেত্রী সোনম কাপুরের বুক খোলা পোশাক, ২১ জানুয়ারি 'অলংকার ডাকাতি' শিরোনামে প্রতিবেদনে কিমের পোশাকের ওপরের অংশ অনাবৃত। ২৫ জানুয়ারি 'পোশাক বিড়ম্বনায় দীপিকা' শিরোনামের প্রতিবেদনের ছবিতেও দীপিকা পাড়ুকোনকে ব্লাউজহীন শাড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখলে মনে হবে সত্যিই তিনি পোশাক বিড়ম্বনায় রয়েছেন। ১৫ নভেম্বর সংগীত তারকা রিটা ওরা'র বুক ফাড়া ফ্রক, ১৬ নভেম্বর 'কণ্ঠ সমস্যায় শাকিরা' শিরোনামে প্রতিবেদনে কলম্বিয়ান পপ সংগীতশিল্পী শাকিরার বুক খোলা ড্রেস, ২০১৮ সালের ৪ জানুয়ারিতে 'শাকিরা সমাচার' শিরোনামে প্রতিবেদনে শাকিরার বড় গলার গেঞ্জি ভেদ করে বেরিয়ে আসা স্তনের ছবিতে কী বোঝানো হচ্ছে? তার গান শুনে নয়, তার নগ্ন সৌন্দর্যের দিকে চাতকপাখির মতো তাকিয়ে পাঠক-শ্রোতারা মুগ্ধ হবেন। ২০১৭ সালের ১৯ নভেম্বর 'চরিত্রগুলো শুধু বিনোদননির্ভর নয়/নারীর সংগ্রামের কথাও বলে' শিরোনামের প্রতিবেদনে মৌসুমী হামিদকে যৌন আবেদনময়ী নারী রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বর 'গ্যালারির নতুন মুখ' শিরোনামের প্রতিবেদনে জান্নাতুল ফেরদৌস পিয়াকে উপস্থাপন করা হয়েছে খোলামেলা পোশাকে।

দৈনিক কালের কণ্ঠের বিনোদন পাতা 'রংবেরং' ও সাপ্তাহিক 'রঙের মেলায়' ২০১৭ সালের ২৯ জানুয়ারি 'এক মাসে ১৫ ছবির প্রস্তাব' শিরোনামের প্রতিবেদনে বিদ্যা সিনহা মিমের পরিহিত সোনালি রঙের চুমকি বসানো স্লিভলেস আঁটসাঁট শর্ট কামিজ। কোমরের সামান্য নিচ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নগ্ন ছবি এক যৌন আবেদনময়ী বিদ্যাকে উপস্থাপন করার ইঙ্গিত বহন করছে। নইলে ২০১৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'নতুন বছরের অঙ্গীকার' শিরোনামের প্রতিবেদনে কেন বিদ্যা সিনহা মিমের একই ছবির পুনঃপ্রকাশ হয়েছে।

এক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালাগুলোয় নারীর অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী হবে, তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যা নারীর অধিকার রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় নীতিমালায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পাঁচটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি পদক্ষেপের প্রথমটি হলো– গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশ অধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও কন্যাশিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো। দ্বিতীয়টি, নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচার ব্যবস্থা করা। এ অর্থে বলা যায়, প্রথম পদক্ষেপটি গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা, প্রবেশাধিকার, অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্তগ্রহণ, সুযোগ বৃদ্ধি, ইতিবাচক উপস্থাপন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিনোদন গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছে না। দ্বিতীয় পদক্ষেপে নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক সংবাদ ও ছবি প্রচার বন্ধের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বিনোদন গণমাধ্যমে কখনো কখনো নারীকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা নীতিমালার পরিপন্থী। কোনো উপস্থাপনই মডেল, অভিনেত্রীর ব্যক্তিত্বকে বিকিয়ে সৌন্দর্যকেন্দ্রিক হতে পারে না।

সংবাদপত্র নতুন প্রজন্মের জন্য পাঠক তৈরি করে। বিনোদনের নামে এখানে নারীকে যৌন আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করাটা বিনোদন নয়। নারী-পুরুষের সেক্স এবং সেক্সুয়ালিটি, সম্পর্ক, ফ্যাশন এবং সৌন্দর্য, ক্ষমতায়নকে খোলামেলাভাবে প্রকাশ না করে ভদ্রভাবে, সুন্দরভাবেও প্রকাশ করা যায়। নারীকে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যৌন আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন হয় না। স্বল্পবসনায় নারীকে উপস্থাপন করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মার্কেটিং। অভিনেত্রী, মডেলের শরীরকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা না করে সুস্থ, সাবলীল ছবি ও সংবাদ পরিবেশন করার প্রচেষ্টা নারীর ইমেজকে ইতিবাচক করে তুলবে। সেসঙ্গে পত্রিকার রুচির পরিচয়ও বহন করবে।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক যুগান্তর

পাপারাজ্জি বিনোদন সাংবাদিকতা ও নৈতিকতা

শুভ কর্মকার

তাজিও সেকিওরোলি, জন্ম ১৯২৫ সালের ২৫ নভেম্বর। ফটোগ্রাফি যার পেশা ও নেশা। ইতালিয়ান এ ফটোগ্রাফারের ছবি তোলায় প্রথম হাতেখড়ি ১৯৪১ সালে। ছবি তোলার নেশা থেকেই সেকিওরোলি ১৯৫৫ সালে রোমা প্রেস ফটো নামে একটি ফটো এজেন্সি গড়ে তোলেন। প্রথমদিকে তার তোলা ছবিগুলো কারো নজর কাড়তে পারেনি। তবে পরবর্তী সময়ে তার ছবির বিশেষত্ব অনেকেরই নজর কাড়ে। সেকিওরোলি মূলত একজন স্ট্রিট ফটোগ্রাফার। স্ট্রিট ফটোগ্রাফিকে অনেকে ক্যানডিড (Candid) ফটোগ্রাফির সঙ্গেও তুলনা করে থাকেন। যদিও স্ট্রিট ফটোগ্রাফি ও ক্যানডিড ফটোগ্রাফির মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। স্ট্রিট ও ক্যানডিড ফটোগ্রাফির মৌলিক সাদৃশ্য হলো– বিষয়বস্তু বা সাবজেক্ট বা ঘটনার ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রকৃত, স্বাভাবিক, অনানুষ্ঠানিক বা সাধারণ অবস্থার ছবি তোলা। সেকিওরোলি এ ধরনের ছবি তুললেও তার সাবজেক্ট ছিল মূলত চলচ্চিত্রতারকা। সেকিওরোলির বিশেষত্ব এখানেই। স্টুডিওতে কিংবা বাড়িতে চলচ্চিত্র তারকাদের অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তুলতেন সেকিওরোলি। তবে স্থানীয় রেস্টুরেন্টগুলোয় তারকাদের অপ্রস্তুত ছবি তুলে সেকিওরোলি বিখ্যাত হয়ে উঠেন।

চলচ্চিত্র তারকাদের অপ্রস্তুত ছবি তোলার প্রক্রিয়া ইতালীয় চলচ্চিত্রকার ফেডেরিকো ফেল্লিনিকে উদ্বুদ্ধ করে। এ বিষয়ে জানতে সেকিওরোলির সঙ্গে ফেল্লিনি বেশ কয়েকবার আলাপও করে নেন। অবশেষে ১৯৬০ সালে ফেল্লিনি 'La Dolce Vita' নামে চলচ্চিত্রে এ ধরনের একটি চরিত্র নির্মাণ

পাপারাজ্জি বিখ্যাত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের ছবি তুলে থাকেন। পাপারাজ্জি শব্দটি এসেছে ইতালীয় শব্দ 'Paparazzo' থেকে। 'Paparazzo' শব্দটি একবচন আর বহুবচন হলো 'Paparazzi'

করেন। এ চরিত্রের নামকরণ করেন পাপারাজ্জো। চলচ্চিত্রের এ পাপারাজ্জো থেকেই পাপারাজ্জির উৎপত্তি। এভাবেই ইতিহাসে সেকিওরোলিকে পাকাপোক্ত জায়গা করে দেন ফেডেরিকো ফেল্লিনি।

'La Dolce Vita' চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেলে পাপারাজ্জি বেশ জনপ্রিয় হতে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ের পাপারাজ্জি ৫০ বছর আগের চেয়ে অনেক ভিন্ন। বর্তমানে পাপারাজ্জি প্রতিযোগিতামূলক বিনোদন ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। পাপারাজ্জির একটি ক্যামেরা শটের ওপর নির্ভর করে তারকাদের খ্যাতি এবং অর্থ উপার্জন। পাপারাজ্জি এবং তারকাদের বর্তমান অবস্থা দাঁড়িয়েছে 'ইঁদুর-বিড়াল' খেলার মতো।

বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্রের বিনোদন পাতায় আবার কখনো সংবাদপত্রের সাধারণ পৃষ্ঠায়ও পাপারাজ্জিদের সৃষ্ট কর্ম ও কর্মকাণ্ডের বিচরণ দেখা যায়। পাপারাজ্জিদের এ ব্যাপক উত্তরণের ক্ষেত্রে কাজ করেছে প্রযুক্তির বিকাশ। উন্নতমানের ক্যামেরার বদৌলতে পাপারাজ্জিরা এখন আরো দ্রুত এবং এক্সক্লুসিভ ছবি তুলতে পারছেন। বর্তমান সময়ের স্মার্টফোন পাপারাজ্জিদের ছবি তোলার অন্যতম হাতিয়ার।

পাপারাজ্জি

পাপারাজ্জি বিখ্যাত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের ছবি তুলে থাকেন। পাপারাজ্জি শব্দটি এসেছে ইতালীয় শব্দ 'Paparazzo' থেকে। 'Paparazzo' শব্দটি একবচন আর বহুবচন হলো 'Paparazzi'। পাপারাজ্জি শব্দটির অর্থ 'বিরক্তিকর মশা' (অর্থাৎ যে মশা 'গুনগুন' করে কানের কাছে শব্দ করে)। এটিকে অনেকে 'buzzing insects' হিসেবেও উল্লেখ করে থাকেন। আর পাপারাজ্জির তোলা ছবিকে অনেকে 'Visual form of gossip' হিসেবেও উল্লেখ করেন।

পাপারাজ্জি হলেন বিশেষ আলোকচিত্রী, যারা নির্দিষ্ট কোনো মঞ্চ বা অনুষ্ঠান ব্যতীত তারকাদের স্বাভাবিক বা অপ্রস্তুত ছবি তোলেন। অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের অসচেতন ও ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি তোলেন তারা। পাপারাজ্জিরা পেশায় স্বাধীন। বিভিন্ন স্থান থেকে তারকাদের ছবি তুলে সেটা গণমাধ্যমে বিক্রি করাই তাদের কাজ। সব পাপারাজ্জি যে পেশাগত কারণে ছবি তোলেন, এমনটা নয়। অনেকে নেশার বশবর্তী হয়ে এ ধরনের ছবি তুলে থাকেন।

পাপারাজ্জি সম্পর্কে Tallulah Watson বলেন, "Paparazzi are known for 'relentlessly shadowing' celebrities, capturing pictures of them at unflattering moments/ in compromising positions, and then selling them on to tabloids and magazines for large sums of money." (Watson, 2010)। আবার Bua and O'Driscoll বলেন, "Celebrity hunters, usually not professional press nor legitimate photographers, who use aggressive and intrusive tactics to videotape, photograph, record, or otherwise invade the privacy of the rich and famous and their families for purposes of financial gain from the sale of their illegally-obtained paparazzi photos and paparazzi video images." (Bua and O'Driscoll, 2012)।

স্টুডিও, শুটিং স্পট কিংবা আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র ব্যতীত তারকা বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত বা অপ্রস্তুত ছবি তুলে গণমাধ্যমে যারা বিক্রয় করে দেন, তাদেরকে পাপারাজ্জি হিসেবে অভিহিত করা হয়। পাপারাজ্জি বিশেষ ধরনের ফটোগ্রাফার, যারা বিনোদন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত।

বিনোদন সাংবাদিকতা ও পাপারাজ্জি

পাপারাজ্জি সাংবাদিক নাকি ফটোগ্রাফার? কেউই পাপারাজ্জিদের সাংবাদিক কিংবা ফটোগ্রাফার হিসেবে মেনে নিতে চান না। বরং কোনো সাংবাদিক ছবি তোলার ক্ষেত্রে একটু 'অনৈতিক' (তারকাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসে, যে কারণে এখানে অনৈতিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে) ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তাকে 'পাপারাজ্জি ফটোগ্রাফার' বলে সম্বোধন করে। পাপারাজ্জি ফটো-সাংবাদিক অথবা ফটোগ্রাফার না হলেও সংবাদ, বিনোদন কিংবা গল্পের খোরাক জুগিয়ে থাকেন। পাপারাজ্জিদের তোলা ছবিগুলো অনেক ব্যতিক্রম হওয়ায় তারা তথ্যবাজারে অনেক সুবিধা পেয়ে থাকেন। অনেক গণমাধ্যমই তাদের ছবি ক্রয় করে থাকে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) সহকারী ওয়াশিংটন ব্যুরো চিফ (ফটোগ্রাফি) ফ্রেড সুইটস বলেন, 'যে কেউই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে পারেন এবং তাকে ফটোগ্রাফার বলতে পারেন। তবে যে কোনো ফটোগ্রাফারকেই আপনি পাপারাজ্জি বলতে পারবেন না।'

একইভাবে পাপারাজ্জি এবং ফটো-সাংবাদিকের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। পাপারাজ্জির লক্ষ্য গোপন মুহূর্তের ছবি তোলা। অন্যদিকে ফটো-সাংবাদিক বছরের পর বছর সংবাদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা থেকে ছবি তোলেন। তবে বর্তমান সময়ে পাপারাজ্জি, ফটোগ্রাফার ও ফটো-সাংবাদিকের পার্থক্য কমে আসছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে এবং বিশ্বব্যাপী আধুনিকায়নের ছোঁয়ায় মানুষ এখন অনেক ব্যস্ত। পাঠকের হাতে সময় নেই। যে কারণে উল্টো পিরামিড কাঠামো (যে সংবাদ কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আগে তুলে ধরা হয়) এবং সারমর্ম সংবাদ সূচনাই (সংক্ষেপে পুরো ঘটনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে যে সূচনা) পাঠকের ভরসা। কখনো কখনো পাঠক শুধু শিরোনাম কিংবা ছবি দেখেই সংবাদের স্বাদ নিয়ে থাকেন। তাই দিন দিন ছবির গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। পাঠক এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিবেচনা করে খেয়াল রাখতে হয় সংবাদপত্র বিক্রির বিষয়টিও। যে কারণে পাপারাজ্জির তোলা ছবি দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ট্যাবলয়েডের সীমানা ছাড়িয়ে মূলধারার সংবাদপত্রেও জায়গা করে নিচ্ছে পাপারাজ্জি-ফটোগ্রাফি।

মূলধারার সংবাদপত্রে পাপারাজ্জির ছবি জায়গা করে নেওয়ার পেছনে দুটি বিষয় কাজ করে থাকে। প্রথমত, বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন এবং ট্যাবলয়েড সংবাদপত্রগুলোর সঙ্গে সার্কুলেশনের প্রতিযোগিতার কারণ। দ্বিতীয়ত, পাপারাজ্জিদের ছবির রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণ। পাপারাজ্জিদের তোলা ছবির বাজারমূল্যও অনেক। ২০০২ সালে হলিউড জুটি বেন অ্যাফলেক ও জেনিফার লোপেজের ছবি 'ইউএস উইকলি' ৭৫ হাজার মার্কিন ডলারে রাইভাল পাবলিকেশন প্রকাশিত 'পিপল'-এর কাছে বিক্রি করে দেয়। আবার ২০০৫ সালে বিগ পিকচার নামে এক এজেন্সি ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিন 'ইউএস উইকলি'-এর কাছে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্রাডপিটের ছবি রেকর্ড পরিমাণ ৫ লাখ মার্কিন ডলারে বিক্রি করে দেয়। মার্কিন গণমাধ্যম বাজারে এখনও 'পিপল' ও 'ইউএস উইকলি' এবং ইউকে বাজারে 'দ্য সান ও নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড' পাপারাজ্জিদের তোলা ছবির অন্যতম বড়ো ক্রেতা। (McNamara, 2011)।

পাপারাজ্জিদের কেন্দ্র করে দুই ধরনের বিনোদন সংবাদ পরিবেশিত হয়ে থাকে। এক. পাপারাজ্জির তোলা ছবিকে কেন্দ্র করে সংবাদ। দুই. পাপারাজ্জিদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সংবাদ।

পাপারাজ্জিদের একটি কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরা হলো। হলিউডের খ্যাতিমান অভিনেতা দম্পতি অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্রাড পিট পাপারাজ্জিদের হাত থেকে বাঁচতে ছয় সন্তানসহ দিনের ৯০ ভাগ সময় ঘরের ভেতরেই কাটিয়েছিলেন। জোলি সে সময়ের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'বাচ্চারা বাইরে যেতে চায়, শপিং করতে চায়; কিন্তু যখনই আমরা বাইরে বের হই, তখনই দেখি জনাবিশেক লোক পিছু লেগেছে।' জোলিদের ঘরের পেছনের দরজায় লোকজন ওতপেতে থাকেন, কখন তারা বাড়ির বাইরে আসেন। জোলির মন্তব্য, 'এটা খুবই বিরক্তিকর। আমরা সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে আসি। এভাবে জীবন চালানো যায় না।' (পাপারাজ্জি ঠেকাতে গৃহবন্দি জোলি-পিট, ২০১০)।

জোলি-পিটের পেছনে পাপারাজ্জির কর্মকাণ্ডের বিষয়টি সংবাদ হয়েছে। তেমনই বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের তিন বছরের মেয়ে আরাধ্যের পেছনে পাপারাজ্জির কর্মকাণ্ড ও সংবাদ হয়েছে। প্রথমদিকে বচ্চন পরিবার আরাধ্যকে ভালোই আড়াল করে রাখত। তারপরও পাপারাজ্জিরা আরাধ্যের ছবি তুলতে সমর্থ হতেন। ঐশ্বরিয়ার বক্তব্য, প্রতিবারই যখন বাড়ি বা বিমানবন্দরের বাইরে ও আসে, তখন লাইট ক্যামেরা আর লোকজন দেখে আরাধ্যর বুঝতে বাকি নেই যে এটাই স্বাভাবিক। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেও সংবাদ হয়েছে।

নৈতিকতা ও পাপারাজ্জি

পাপারাজ্জির হাতে হেনস্তার শিকার হওয়া যেন তারকাদের নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপারাজ্জি সাংবাদিকতার শিকার হয়ে কিছুদিন আগে লেখক জে কে রাওলিং যুক্তরাজ্যের লেভেনসন তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ করেন, ওই সময় তিনি রীতিমতো 'অবরুদ্ধ কিংবা জিম্মি' হয়েছিলেন। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই আয়ারল্যান্ডের ন্যাশনাল লাইব্রেরি প্রকাশিত এক চিঠিতে জানা গেল, ৮০ বছর আগে এমনই একদল

নাছোড়বান্দা সাংবাদিকের কবলে পড়েছিলেন লেখক জেমস জয়েস। চিঠিটি জয়েস লেখেন তার ছেলে জর্জো ও তার স্ত্রী হেলেনের কাছে ১৯৩১ সালের ৯ জুলাই। এতে জানা যায়, জয়েস তার বান্ধবী নোরা বার্নাকলকে বিয়ে করার দিনপাঁচেক আগে লন্ডনে তাঁর বাড়ির সামনে মধ্যরাতে এক সাংবাদিক আড়ি পাতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওই বিয়ের ব্যাপারে তথ্য বের করা। জয়েস ও নোরা বিয়ের আংটিটিকে 'দাসত্বের প্রতীক' হিসেবে বিবেচনা করতেন। এ কারণে দীর্ঘ ২৭ বছর তাঁরা একসঙ্গে কাটালেও বিয়ের কথা কখনো ভাবেননি। শেষ পর্যন্ত আইনের চোখে সন্তানদের বৈধতা দিতে ১৯৩১ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। ওই সাংবাদিক বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও জয়েসের কাছ থেকে কোনো তথ্য বের করতে না পেরে শেষে তাকে এক প্রস্তাব দেন, 'আধুনিক যুগের বিয়ে ও উন্মুক্ত মেলামেশার বিষয়ে তিনি একটি নিবন্ধ লিখলে এর জন্য তাদের পত্রিকার পুরো অর্ধেকটা পৃষ্ঠা বরাদ্দ দেওয়া হবে।' জয়েস সাংবাদিকদের এ প্রস্তাবকে ডাহা ব্ল্যাকমেইল বলে অভিহিত করেন। (জয়েসকে পাপারাজ্জির ব্ল্যাকমেইল, ২০১৪)

তাহলে পাপারাজ্জি তারকাদের যে গোপন তথ্য প্রকাশ করেন, এটা কি নৈতিক? এ প্রশ্ন সবার মধ্যেই কমবেশি রয়েছে। তবে একজন ফটো-সাংবাদিকের নৈতিকতার মাপকাঠি পাপারাজ্জিরা মেনে চললে এ বিষয়ে অনেকটাই সমাধান পাওয়া যাবে। বিপিজে আয়োজিত বিভিন্ন সময়ে সেমিনার ও কর্মশালায় বিভিন্ন সম্পাদক, ইউনিয়ন নেতার সুপারিশগুলো সারসংকলন করে নিম্নোক্ত বিষয় সচেতনভাবে বাস্তবায়নের জন্য পেশ করা হয়েছে। সেখান থেকে ফটো-সাংবাদিকদের জন্য প্রযোজ্য আচরণবিধিগুলো তুলে ধরা হলো (উদ্ধৃত মহসীন, ২০১৩) :

কর্তব্য সম্পাদনে সাংবাদিকরা মৌল, মানবিক ও সামাজিক অধিকারের কথা মনে রেখে সংবাদচিত্র, প্রতিবেদন ও মন্তব্য লিখবেন।

বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচনা দিতে পারে, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র এমন সব সংবাদচিত্র, প্রতিবেদন ও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন।

কোনো সংবাদচিত্র প্রতিবেদন বা মন্তব্য ভুল প্রমাণিত হলে তা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করতে হবে।

বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। বৃত্তিমূলক গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাঙ্গামার সংবাদচিত্র প্রকাশ করা চলবে না।

তথ্যসূত্র

১. মহসীন, এ কে এম (২০১৩), আধুনিক ফটো সাংবাদিকতার কলাকৌশল, ঢাকা: অনন্যা।

২. 'পাপারাজ্জি ঠেকাতে গৃহবন্দি জোলি-পিট', ২০১০, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

৩. জয়েসকে পাপারাজ্জির ব্ল্যাকমেইল', ১৫ আগস্ট ২০১৪, কালের কণ্ঠ, http://www.kalerkantho.com/print-edition/silalipi/2014/08/15/117305

৪. Bua, Ashley and O'Driscoll, Kura (2012). Paparazzi and Their Impact. Retrieved March 01, 2018, From: https://www.slideshare.net/buaa92/paparazzi-and-their-impact

৫. McNamara, Kim (2011). The Paparazzi Industry and New Media: The Evolving Production and Consumption of Celebrity News and Gossip Websites. International Journal of Cultural Studies. Issue: 14(5). UK: Sage Publications.

৬. Watson, Tallulah (2010). Paparazzi. Retrieved March 01, 2018, From: https://prezi.com/8-wtyvrs1rca/paparazzi-presentation/

লেখক: প্রভাষক, পিআইবি

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার দিকপাল এসএম পারভেজ

মাহফুজ সিদ্দিকী

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এসএম পারভেজ জন্মগ্রহণ করেন। এস এম পারভেজ জন্ম: ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ এবং মৃত্যু: ০২ এপ্রিল ১৯৭৯। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা মননে সমৃদ্ধ, মুক্ত মনের একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ। প্রজ্ঞা, মেধা ও অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষটি দেশ ও জাতির শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎকে দিয়ে গেছেন এক নতুন দিগন্তে পৌঁছানোর দিশা। তাঁর উদ্যোগ-উদ্ভাবনা-উৎসাহ এবং সক্রিয় কর্মধারা দেশজ শিল্প-সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গ্র্যাজুয়েট এসএম পারভেজ মনে মনে ভাবলেন তিনি এমন কিছু করবেন যা দেশজ শিল্প-সংস্কৃতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে, যা থাকবে ইতিহাস হয়ে–'রমনা পার্কে বসে বাদাম চিবুচ্ছি আর ভাবছি কী করা যায়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথায় খেলে গেল সিনেমা পত্রিকা বের করব আর পত্রিকার মাধ্যমেই আমার যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করব। আন্দোলন গড়ে তুলব।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গ্র্যাজুয়েট এসএম পারভেজ মনে মনে ভাবলেন তিনি এমন কিছু করবেন যা দেশজ শিল্প-সংস্কৃতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে, যা থাকবে ইতিহাস হয়ে

দৈনিক পত্রিকার আকারে চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি সাপ্তাহিক চিত্রালী প্রকাশিত হলো ১৯৫৩ সালের ১৩ জুন। সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুহম্মদ হাবিবুর রহমান। প্রকাশক রুহুল আমিন। প্রকাশনার সাথে আরো জড়িত ছিলেন শামসুল আলম, নূরুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান, এ এফ এম নূরুল ইসলাম। ছাপা হতো বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস, ৩০৪, পাটুয়াটুলী ঢাকা থেকে; প্রকাশিত হতো কাউসার হাউস, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা থেকে।

এসএম পারভেজ এমন সময় চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা বের করলেন যখন এদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে

এসএম পারভেজ (সর্বডানে), সৈয়দ শামসুল হক ও আহমেদ জামান চৌধুরী

চলচ্চিত্র নির্মাণ হওয়া তো দূরের কথা–এ ধরনের কোনো চিন্তা-ভাবনা সরকারি বা বেসরকারিভাবে কারো মাথায় ঢোকেনি। শুটিং ফ্লোর, ডাবিং থিয়েটার নির্মাণ আনুষঙ্গিক কোনোই যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়নি ; উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার এ চলচ্চিত্র নির্মাণহীন বিরান এলাকায় এসএম পারভেজ চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা চিত্রালী প্রকাশ করে বসলেন।

কিন্তু এসএম পারভেজের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব। আর চলচ্চিত্র নির্মিত হলে এদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রগতি হবে; দেশ ও বাঙালি জাতি অগ্রসরমান নব্য বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে। এ বিশ্বাসের ওপর ভর করে তিনি চিত্রালীর মাধ্যমে সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার একরূপ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

চিত্রালীতে লেখালেখি, সেমিনার-আলোচনা অনুষ্ঠান ও মতামত ব্যক্ত করায় কাজ হয়– তৎকালীন সরকারের টনক নড়ে, সরকার চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। প্রথমে বেসরকারি উদ্যোগে বন্যার ওপর (১৯৫৪) একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মিত হয়, প্রযোজনা করে ইকবাল ফিল্মস। নির্মাণ করেন আবদুল জব্বার খান। ধারা বিবরণীতে কণ্ঠ দেন ফতেহ লোহানী। ওই সালেই অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে ইকবাল ফিল্মসের পূর্ণাঙ্গ ছায়াছবি 'মুখ ও মুখোশ'-এর মহরত হয় তখনকার অভিজাত হোটেল শাহবাগে। মহরতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা উদ্বোধন ভাষণ দেন– I accepted the invitation to take part in this ceremony with great pleasure in order to demonstrate the importance Government give to the indigenous production of Cinema films and establishment of a first class studio. Cinema has an educative value, but its value as an agency which provides entertainment, for the people far transcends anything else. It is imperative for the people to have amusement and amenities of life in order to forget, for however short a time, the cares and worries of this world.

I hope this ventures of messers' Iqbal Films Limited will encourage art and music in this province which is so rich and which, with a little encouragement, can reach great heights.

এ ঘটনার পরপরই সরকারি উদ্যোগে ছবি নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রকল্প তৈরি হতে থাকে। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার নাজির আহমদকে ডেপুটি ডিরেক্টর করে একটি চলচ্চিত্র বিভাগ করে। বিজি প্রেসে তারা একটি এডিটিং টেবিল বসায়। তেজগাঁওয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয় স্টুডিও স্থাপনের এবং ১৯৫৬ সালে স্থাপিত হয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা এফডিসি। একটি মাত্র ফ্লোর নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। খুব সহজে বলা হলেও এফডিসি খুব সহজে হয়নি। এর পেছনে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

১৯৫৫ সালের শেষদিকে ইতালির একটি চলচ্চিত্র মিশন প্রতিষ্ঠান ঢাকায় আসে। ওই মিশন স্টুডিও স্থাপনের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেয়। ১৯৫৬ সালে সরকার এদেশে চলচ্চিত্র শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে।

১৯৫৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ওখানে একটি সংস্থা গঠনকল্পে এক কোটি টাকা বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য সমপরিমাণ অর্থবরাদ্দের দাবি তোলেন প্রাদেশিক চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান নাজির আহমদ। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তারা তখন পূর্ব পাকিস্তানে একটি চলচ্চিত্র সংস্থা গঠনের পরামর্শ দেন। নাজির আহমদ তখন শিল্প দফতরের সচিব আজগর আলী শাহ ও শিল্প দফতরের উপ-সচিব আবুল খায়েরের মাধ্যমে বিষয়টি তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নজরে আনেন। তিনি সব শুনে অতিসত্বর 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার বিলের একটি খসড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করার নির্দেশ দেন। তখন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন শেষ হতে মাত্র দু'দিন বাকি। এ অবস্থায় আবুল খায়ের ও নাজির আহমদ তাড়াতাড়ি এফডিসি বিলের কাগজপত্র তৈরি করেন। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনের শেষদিন (সকালে) শেখ মুজিবুর রহমান 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বিল উত্থাপন করেন।

এসএম পারভেজ (সর্বডানে), আহমেদ জামান চৌধুরী (মাঝে) ও লেখক (সর্ব বামে)

ওইদিন পরিষদে উপস্থিত ছিলেন ১১ জন মন্ত্রী ও ২৫০ জন সদস্য আর স্পিকার ছিলেন আবদুল হাকিম। বিল উত্থাপনের পর প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্য আবদুল মতিন, ইমদাদ আলী ও মনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বিলে সামান্য সংশোধনী আনেন। সংশোধনীর পর বিলটি বিনা বাধায় আইন পরিষদে পাস হয়।

এফডিসি স্থাপিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হলো। এসএম পারভেজ নির্মাণ করলেন 'মাটির পাহাড়', 'কারওয়া', 'বেগানা'। এ জে কারদার করলেন 'জাগো হুয়া সাভেরা', 'দূর হ্যায় সুখকা গাও'। বেবী ইসলাম করলেন 'তানহা'। নির্মিত হলো 'আকাশ আর মাটি', 'এদেশ তোমার আমার'।

আর এসব ছায়াছবির খবর ও ছবি চিত্রালীতে ঘটা করে ছাপা ও লেখা চলতে লাগল। এ যাবৎকাল চিত্রালীতে ভারতীয়, পাকিস্তানি ও হলিউডের ছায়াছবির খবর ও ছবি ছাপা হতো। এখন নিজ দেশের নায়ক-নায়িকা, শিল্পী-কুশলীর খবর ও ছবি চিত্রালীতে প্রাধান্য পেতে থাকে।

কিন্তু এসএম পারভেজ কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। দেনায় জর্জরিত হয়ে গেলেন। প্রেসে, কাগজের দোকানে, ব্লকের কারখানায়, সাংবাদিক-কর্মচারীদের কাছে তিনি এতটা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, চিত্রালী প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। ফলে চিত্রালীর কয়েক সংখ্যা কয়েক মাস প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। এসএম পারভেজ একরকম পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। একরকম উদভ্রান্তের মতো হয়ে পড়লেন। চিত্রালীর সাংবাদিক সৈয়দ শামসুল হক, ডি এ রশীদ, জিয়া হায়দার, ফজল শাহাবুদ্দিন, কাইয়ুম চৌধুরী, মুজিবুল হক, এটিএম হাই, লায়লা সামাদ ও জহির রায়হান যদিও এসএম পারভেজের কাছে পারিশ্রমিকের টাকা পান কিন্তু টাকা চাওয়ার পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দেন ও পত্রিকা প্রকাশের পথ বের করার খোঁজ-খবর ও পরামর্শ দেন।

এরকম একটি ক্রান্তিলগ্নে এসএম পারভেজের আলোচনা হয় ব্যারিস্টার হামিদুল হক চৌধুরীর সাথে। হামিদুল হক চৌধুরী তখন মতিঝিল থেকে ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার, উর্দু দৈনিক 'ওয়াতান' এবং সাপ্তাহিক বাংলা 'পূর্বদেশ' বের করেন এবং বাংলাবাজারে অ্যাসোসিয়েট প্রেস নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেসও পরিচালনা করেন। এসএম পারভেজ চিত্রালী প্রকাশের জন্য স্বত্ব তাঁর কাছে বিক্রি করে দেন। শর্ত থাকে–যতদিন পত্রিকা প্রকাশিত হবে ততদিন এসএম পারভেজ সম্পাদক থাকবেন। শর্ত থাকে পত্রিকার প্রকাশনা যে কোনোভাবে অব্যাহত থাকবে। ফলে চিত্রালী আবার আলোর মুখ দেখা শুরু করল। এবারে চিত্রালী বাংলাবাজার অ্যাসোসিয়েট প্রেস থেকে হ্যান্ডকম্পোজে ও ফ্ল্যাড মেশিনে ছাপা হতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে চিত্রালীর সোনালি সময় ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল এ ১২ বছর বা একযুগ। এ সময়ে চিত্রালী প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করে। ফলে ১৯৬৫ সালে যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সাংবাদিকদের জন্য প্রথম ওয়েজবোর্ড গঠন করেন তখন এসএম পারভেজ সাপ্তাহিক হওয়া সত্ত্বেও চিত্রালীকে মেট্রোপলিটন 'এ' ক্যাটাগরির পত্রিকা হিসেবে তুলে ধরেন। অর্থাৎ চিত্রালী একটি প্রথম শ্রেণির দৈনিকের সমমর্যাদা লাভ করে।

১৯৬৪ সালে দেশে অফসেট প্রিন্টিংয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় চিত্রালী চার রঙে ছাপা হতে শুরু করে এতে চিত্রালীর সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বেড়ে যায় ; চিত্রালীর চাহিদা বহুগুণে বেড়ে যায়। এ সময়ে চিত্রালীর প্রচার সংখ্যা লাখের ওপর চলে যাওয়ায় অবজারভার ভবনে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

এসএম পারভেজ নতুন উদ্যোগ নিলেন, চিত্রালী উর্দু ভাষায় বের করবেন। অবজারভার ভবনের তিনতলায় কাতিব বসানো হলো। লম্বা চৌকির ওপর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ১০/১২জন কাতিব বসে গেলেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে উর্দু চিত্রালী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও মূল বা বাংলাভাষার চিত্রালীর কোনো অধোগতি হয়নি। বরং আগের মতোই চিত্রালী দাপটে এদেশের চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির খবরাখবর পরিবেশন করতে থাকে। শুধু এ নয়, দেশজ শিল্প-সংস্কৃতি-চলচ্চিত্রের বিকাশ ও বিস্তারে এবং শিল্প ও চলচ্চিত্র অঙ্গনের বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানে চিত্রালী সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়। দেশের চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত, নৃত্য ও শিল্পকলা প্রভৃতির অগ্রগতি লাভে এবং শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশে চিত্রালী ক্রমাগত অনন্য ও ঈর্ষণীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এসএম পারভেজ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস)-এর প্রতিষ্ঠাতা হয়ে চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার পথ রচনা করেন।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭৯ এ ২৬ বছর এসএম পারভেজ চিত্রালী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এর বিকাশ বিস্তার দেশে-বিদেশে; এর সাথে সম্পৃক্ত চলচ্চিত্র-নাটক-সংগীত-নৃত্য-বেতার-টেলিভিশন ইত্যাদির নবতর পদ্ধতি প্রবর্তন; ধারা বিশ্লেষণ, আলোচনা-সমালোচনা, নির্দেশনা, উচিত-অনুচিত প্রকাশ করা এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার পরিচিতি বিকাশ-বিস্তার-পদ্ধতি ইত্যাদি চালু করা ও হাতে-কলমে দেখিয়ে তুলে ধরা; দেশ-বিদেশ থেকে নতুন আইডিয়া আনা এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা ছিল ২৬ বছরের অবিরাম ফসল।

যখন এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরুই হয়নি তখন এসএম পারভেজের মাথায় চলচ্চিত্র পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা আসে। তিনি তুলে ধরেন চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা কী, কেমন, কীভাবে করতে হয়; তা জানানো ও দেশজ চলচ্চিত্র শিল্পী-কুশলী ও শিল্পীদের সঠিক দিকনির্দেশনা লেখার মাধ্যমে, খবরের মাধ্যমে, আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে। মূলধারার সাংবাদিকতার সঙ্গে চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের সম্পৃক্ত করার মানসে স্বতন্ত্র সংগঠন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি গড়ে তোলেন দেশজ সংস্কৃতি অঙ্গন আপন এবং শ্রেষ্ঠ–এ মন্ত্র ড্রইং রুম থেকে মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া উল্লেখযোগ্য। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পণ্যের প্রচারণা চালু করতেই তাঁর অবদান।

লেখক : সাংবাদিক, লেখক ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক চিত্রালী

পত্রিকার পাতায় মঞ্চনাটক

বোরহান বিশ্বাস

বাংলাদেশে মঞ্চনাটকের প্রসার মূলত স্বাধীনতা-উত্তর কালে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে সেসময় সারা দেশেই একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মঞ্চনাট্য দল গঠন শুরু হয়। একে একে প্রতিষ্ঠা হয় থিয়েটার, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, নাট্যচক্র, আরণ্যক নাট্যদল, ঢাকা থিয়েটার, সুবচন নাট্য সংসদ, ঢাকা পদাতিক, লোক নাট্যদল, নাট্যকেন্দ্র, সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়, বহুবচন, দেশ নাটক প্রভৃতি।

গঠিত হয় গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও গ্রাম থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনসহ মঞ্চনাটকের নানা প্লাটফর্ম। অগ্রসরমাণ মঞ্চনাটক তখন এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, দর্শনীর বিনিময়ে মহিলা সমিতি কিংবা গাইড হাউস মঞ্চে প্রদর্শনী দেখার জন্য প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটত। টিকিটের জন্য অপেক্ষমাণ দর্শকের সারি চলে যেত অনেক দূর পর্যন্ত। পত্রিকাগুলোও তখন মঞ্চনাটক নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করেছে। শুধু সংবাদ প্রকাশই নয়। মঞ্চে আসা নতুন নাটক নিয়ে নাট্য সমালোচনাও ছিল লক্ষণীয় ব্যাপার। সংবাদ ও সমালোচনা পড়ে অনেক পাঠকই পরবর্তী সময় দর্শক হিসেবে মঞ্চনাটক দেখতে উৎসাহী হয়েছেন। কালের আবর্তে নানা বাস্তবতায় কমে এসেছে মঞ্চের দর্শক। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি পেলেও কমে গেছে মঞ্চ সম্পর্কিত সংবাদ। নাট্য সমালোচনা একরকম হয় না বললেই চলে। এসব বিষয়ে বাংলাদেশের খ্যাতিমান কয়েকজন মঞ্চশিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছেন সাংবাদিক বোরহান বিশ্বাস। তাঁদের কথায় উঠে এসেছে মঞ্চনাটকের বর্তমান অবস্থা এবং এ সংক্রান্ত পত্রিকাগুলোর ভূমিকা প্রসঙ্গ–

বাংলাদেশে মঞ্চনাটকের প্রসার মূলত স্বাধীনতা-উত্তর কালে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে সেসময় সারা দেশেই একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মঞ্চনাট্য দল গঠন শুরু হয়

দৃষ্টি কাড়ার মতো নাট্য সমালোচনা চোখে পড়ে নাঃ রামেন্দু মজুমদার, থিয়েটার বেইলি রোড

গতানুগতিকভাবে শুধু নিউজটা আমরা আশা করি না। এখন প্রচুর মঞ্চনাটক হচ্ছে। কিন্তু কোনো নাটক নিয়ে সেভাবে সমালোচনা চোখে পড়ে না।

সমালোচনা না আসায় সেটা সেভাবে আলোচনায় থাকছে না। এ ব্যাপারে পত্রিকাগুলো আরো নজর দিতে পারে। প্রতিদিনকার ও সাপ্তাহিক বিনোদন পাতার পরিসর বেড়েছে। সে অর্থে মঞ্চনাটক নিয়ে দৃষ্টি কাড়ার মতো সমালোচনা বা রিভিউ চোখে পড়ে না। বিষয়গুলো পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন।

রিভিউ করার মতো লোক নেইঃ আতাউর রহমান, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়

থিয়েটারের নিউজ এখন কম হচ্ছে। আগে এত চ্যানেল ছিল না। শুধু বিটিভি ছিল। ওই সময় যে দলগুলো মঞ্চে কাজ করত যেমন– নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার, আরণ্যক, ঢাকা পদাতিকসহ অন্য দলগুলোর নিউজগুলো গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো। পলিটিক্যাল নিউজের প্রতিই আমাদের সংবাদপত্রগুলোর বেশি ঝোঁক থাকে। বিনোদন পাতায় ফিল্মের খবরই বেশি প্রাধান্য পায়। মঞ্চ সংবাদ থাকে নাম-মাত্র। নতুন নাটক এলে সেটার যে পরিমাণ কাভারেজ পাওয়া উচিত, তা হচ্ছে না। তবে একেবারে যে হচ্ছে না তা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে হচ্ছে। যেমন– আমার নতুন নাটক 'হ্যামলেট' বেশ কাভারেজ পেয়েছে। হয়তো এটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাজ ছিল বলে এমনটি হয়েছে।

নাটক দেখে রিভিউ করার মতো লোক আসলে আমাদের নেই। যারা এ কাজটি করবেন, তাদের তো আমাদের কাছেই দ্বারস্থ হতে হয়। নাটক দেখে যিনি অভিনয়টি বুঝবেন, লাইটিং বুঝবেন, টেক্সটা বুঝবেন– এমন লোক বিরল। অনেক সহজভাবে তারা সবকিছু দেখেন।

কোনো রকম ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কেউ যখন কাজে নামেন, তখন সেটা কাঁচা কাজই হয়। যেমন– হ্যামলেট, ম্যাকবেথ অথবা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কথা বলতে হলে তাকে তো সেই সম্পর্কে আগে জানতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। হোমওয়ার্ক করতে হবে। শুধু দেখে এটা ভালো হয়েছে, ওটা ভালো হতে পারত লিখে দিলেই হলো না। নাটকের ওপর আমার একটি সমালোচনার বই আছে 'পাদপ্রদীপের আলোয়'। আমি সাংবাদিক নই। তবুও তরুণদের কিছু জানানোর উদ্দেশ্যে আমার ওই লেখা। হাফ নলেজ নিয়ে কোনো কাজ বিশেষত সৃষ্টিশীল কাজ করতে গেলে সেটা পূর্ণতা পায় না। কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়।

গঠনমূলক সমালোচনা দরকারঃ ফেরদৌসী মজুমদার, থিয়েটার বেইলি রোড

মঞ্চনাটক নিয়ে এখন আর রিভিউ হয় না। জাস্ট ইনফরমেশন জানিয়ে দেয়া হয়। রিভিউ হলে ভালো হতো। নাটকের জন্য গঠনমূলক সমালোচনার দরকার। আমাদের সময়ে নাটক নিয়ে বেশ সমালোচনা হতো। অমুক নাটকের প্রজেকশন ভালো নয়, গল্পের গাঁথুনি ভালো ইত্যাদি। এখন তো আর সেগুলো হয় না। জাস্ট ইনফরমেশন। নাটক না দেখে সেটার ওপর ভালো রাইটআপ হতে পারে না। কিন্তু এখন অনেক ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে। না দেখেই নাটক নিয়ে লেখার প্রবণতা লক্ষ করছি। এমনও প্রশ্ন আমাকে শুনতে হয়েছে যে, আপনি কি 'মেরাজ ফকিরের মা'তে অভিনয় করেন? এমন প্রশ্নে অবাক না হয়ে কি পারা যায়! মেরাজ ফকিরের মা হয়ে আমি শোর পর শো করেছি। অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আমি সেখানে অভিনয় করি কিনা! তাই আমার কাছে মনে হয়, কেউ যদি নাটক নিয়ে কোনো কিছু বলতে চায়, কিছু লিখতে চায়, তাকে অবশ্যই নাটকটি দেখতে হবে। ভালো-মন্দ মিলিয়েই নাটক। সেটি যদি যুক্তিযুক্তভাবে তুলে ধরা হয়, তাহলে নাটকের দলগুলো লাভবান হয়। নাট্যকার লাভবান হন। নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পান। টিভি নাটকে সংশোধনের সুযোগ নেই। সেটা প্রচার হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু মঞ্চনাটকে প্রতি শোতেই সংযোজন-বিয়োজন করা যায়।

মঞ্চনাটকে যিনি অভিনয় করেছেন, যিনি সত্যিকারের মঞ্চশিল্পী, মঞ্চকে যিনি ভালোবেসেছেন, তিনি কখনো মঞ্চের সঙ্গে আপস করেন না। নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমি তো টিভি ও মঞ্চ দুই জায়গাতেই অভিনয় করেছি। কেউ বলতে পারবে না যে, টেলিভিশনের জন্য আমার মঞ্চের কাজের ক্ষতি হয়েছে। মঞ্চ আমার কাছে উপাসনালয়। কোনো কিছুকে ভালোবাসলে ওইভাবেই বাসতে হয়। তাতে কোনো ফাঁক থাকলে চলবে না।

আবদুল্লাহ আল মামুন তো টিভি, মঞ্চ দুই জায়গায়ই দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। আমরা অবাক হয়ে দেখতাম, যেদিন উনার মঞ্চনাটক থাকত, সেদিন উনি অন্য কোনো কাজ করতেন না। আমার মনে হয়, সবাই এখন অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছেন। হাতে সময় কম। দেখে-বুঝে কিছু করার সময় যেন কারো হাতে সময় নেই। তবে শুধু নাটক নয়, যে কোনো বিষয় নিয়েই ভালো কিছু করতে গেলে সময় দিতেই হবে।

কর্তৃপক্ষকেই ভূমিকা রাখতে হবেঃ মামুনুর রশীদ, আরণ্যক নাট্যদল

সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা এখন বিনোদনের মধ্যে ঢুকে গেছে। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমি মনে করি, থিয়েটারের জন্য আরো স্পেস দরকার। শুধু থিয়েটার কেন, আমাদের দেশের নিউজই তো কমে যাচ্ছে। হলিউড-বলিউডের নিউজেই পত্রিকা ঠাসা। খেলাধুলার জন্য যে স্পেস বেড়েছে, থিয়েটারের জন্য তেমন স্পেস বাড়েনি। আরেকটা বাস্তবতা হচ্ছে, থিয়েটার নিয়ে এখন যারা লেখালেখি করছেন, তাদেরও জানার কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। কারণ কোনো নাটক বা ছবি নিয়ে রিভিউ লিখতে গেলে তাকে অবশ্যই ওই বিষয়ে জানা থাকতে হবে। না জেনেবুঝে কিছু লিখলে সেটা দায়সারা লেখাই হয়। আমার তো মনে হয়, যারা এভাবে লেখবেন, তারা নিজেরাও ওই বিষয়ে লিখে তেমন মজা পাবেন না। ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকরা হয়তো এ বিষয়ে কিছুটা জানতে পারবেন। কিন্তু থিয়েটারের নিউজের স্পেস বাড়ানোর ব্যাপারে তো সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকেই ভূমিকা রাখতে হবে।

এটা ঠিক যে, থিয়েটার একটি মাইনোরিটি এন্টারটেইনমেন্ট। থিয়েটার খেলাধুলার মতো বিশাল পরিসরের না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, 'ইটস্ লাইক ক্লাসিক্যাল মিউজিক'। উন্নত সভ্যতার জন্য আমাদের যেমন ক্লাসিক্যাল মিউজিককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তেমনি থিয়েটারকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে পত্রিকার সম্পাদক অথবা মালিকরা ভেবে দেখতে পারেন যে, তারা থিয়েটারকে বর্তমান অবস্থায় দেখতে চান কিনা! দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনটা এক্ষেত্রে জরুরি।

সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়া গেলে ভালো হতো: লাকী ইনাম, নাগরিক নাট্যাঙ্গন

আমি বলব, অবশ্যই মঞ্চের নিউজ কম হচ্ছে। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ২০ নভেম্বর ২০১৭ নাগরিক নাট্যাঙ্গন ইনস্টিটিউট অব ড্রামার যুগপূর্তি উৎসব পালিত হলো। আমরা চেষ্টা করেছি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে। কিন্তু সাংবাদিক উপস্থিতির হার এবং পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত নিউজ দেখে দুঃখ পেয়েছি। একটি মাত্র পত্রিকা আমাদের সংবাদ প্রকাশ করেছে। তা-ও আবার সংস্কৃতি অথবা বিনোদন পাতায় নয়, দেশের খবরের পাতায়। এ ঘটনায় একজন নাট্যকর্মী হিসেবে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি।

আমার চেয়ে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাদের অনেকেই এখন মঞ্চে আসতে পারেন না। মঞ্চে আমার ৪৬ বছর চলছে। পত্রিকাগুলোয় আগের মতো নাটকের সমালোচনা দেখি না। সবাই মিলে বসে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া গেলে ভালো হতো। একটি জাতীয় দৈনিক আমাদের খবরগুলো বিজ্ঞাপন আকারে দেয়। এর জন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সব পাঠক তো আর ওই একটি পত্রিকাই পড়েন না। অন্য পত্রিকাগুলোও যদি আমাদের সহযোগিতা করত, তাহলে কিছুটা হলেও এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটত।

নাটক না দেখেই কেউ কেউ রিভিউ করেন: শিমুল ইউসুফ, ঢাকা থিয়েটার

বয়সে এখন যারা নবীন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়েই থিয়েটারে কাজ করতে আসছে। সবার লক্ষ্য রেডিও অথবা টেলিভিশনে কাজ করা। যে ক'জন থিয়েটারে কাজ করছে, তাদের মধ্যেও তারকা হওয়ার ভাবনা থাকে। যে কারণে মঞ্চে কিছুদিন কাজ করার পর তারাও টিভি নাটকে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। আমরা যারা অনেকদিন ধরে থিয়েটারে কাজ করে আসছি, তারা কিছু পাওয়ার মোহে করছি না। আমার কথা বলতে পারি, গান ছেড়ে আমি মঞ্চ নাটককেই বেছে নিয়েছি। সুদীর্ঘ সময় সেটাই চর্চা করে আসছি।

নিজেকে সবার সামনে মেলে ধরা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তরুণ শিক্ষার্থীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তারাও পড়ালেখা শেষ করে কখন কোন চ্যানেলে কাজ করবে, সেই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ছে। যে কারণে এখন যারা পত্রিকাগুলোয় থিয়েটারের সংবাদ করছে তারা যে খুব একটা জেনে করছে তা নয়। আবার এমনও দেখা যায়, মঞ্চে আসা নতুন কোনো নাটক না দেখেই কেউ কেউ রিভিউ করে দিচ্ছেন। কোনো বিশেষ নাট্যদলের সঙ্গে হয়তো তাদের যোগাযোগ থাকতে পারে। আর সে কারণেই হয়তো তারা ধরেই নেন যে, অমুক দলের নাটক তো ভালো হবেই। এভাবেই চর্চাটা হয়ে আসছে। এটা ঠিক না। পূর্ণাঙ্গ নাটক না দেখে রিভিউ লেখাটা আমার যুক্তিতে সঠিক নয়। সেটা অনেকটা টেবিল ওয়ার্ক হয়ে যায়। আর আমাদের দেশে মঞ্চনাটক নিয়ে সমালোচনা সে অর্থে হয় না বললেই চলে। এজন্য থিয়েটারের ওপর বেশ জানাশোনা থাকা দরকার। যে কারণে আমরা এখন কোনো নাটক নিয়ে পত্রিকাগুলোকে সেভাবে সমালোচনা করতে দেখি না। শুধু কবে, কোথায়, কোন নাটক মঞ্চায়ন হবে, সেটিই পাঠকদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। তবে এটাও ঠিক যে, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ নানা পারিপার্শ্বিক কারণে দর্শকরা এখন আর আগের মতো মঞ্চনাটক দেখছেন না। একটা কমিটমেন্টের জায়গা থেকে নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানোর মতোই আমরা এখনো থিয়েটারটা করে যাচ্ছি।

আরো বেশি স্পেস আশা করি: লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও লোক নাট্যদল

মঞ্চ নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো আমার কাছে পর্যাপ্ত মনে হয় না। থিয়েটারকর্মী হিসেবে আরো বেশি স্পেস আমি আশা করি। প্রদর্শিত নাটক নিয়ে যদি কোনো রিভিউ করা যায়, সেটি অবশ্যই ভালো হয়। মঞ্চ নিউজ এবং রিভিউ বিষয়ে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করতে পারি। পত্রিকাগুলো এক্ষেত্রে শিল্পকলা একাডেমির দু'টি হলে কী কী নাটক প্রতিদিন প্রদর্শিত হচ্ছে, তার খবরাখবর যদি ছোট্ট পরিসরেও পাঠকদের আগাম জানিয়ে দিত, সেটা আমাদের জন্য ভালো হতো। দু'-একটি পত্রিকা এ কাজটি করছে। ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার ভিন্ন ভিন্ন পাঠক থাকে। যে কারণে আমরা আরো বেশি পত্রিকার কাছ থেকে এ বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করি।

বাণিজ্যিকভাবে আমাদের থিয়েটারের অবস্থা ভালো না। এজন্য পত্রিকাগুলো আমাদের সহযোগিতা করতে পারে।

পত্রিকার কালচারাল রিপোর্টারদের সঙ্গে আমরা প্রায়ই বসি, সংবাদ সম্মেলন করি। তারা তাদের অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পলিসি লেভেলে যারা আছেন, তাদের সঙ্গে আমরা বসতে চাইলেও তাদের হয়তো সময় বের করাটা কঠিন। তবে মাঝে-মধ্যে তাদের আমরা চিঠি দিয়ে নাটকের প্রচারণা বাড়ানোর অনুরোধ করি।

একটি মঞ্চনাটক নামাতে যে ব্যয় হয়, প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে তার মাত্র ১০ ভাগ বা সর্বোচ্চ ২০ ভাগ ফেরত আসে। যে কারণে পরবর্তী সময় প্রচারের জন্য আর্থিক খরচের ব্যাপারটা খুব বেশি ভাবা যায় না। এক্ষেত্রে পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া প্রচারণার ব্যাপারটা একটি দুরূহ কাজ।

থিয়েটারের নিউজ আরো বেশি হওয়া উচিত: ফাল্গুনী হামিদ, নাট্যচক্র

অন্যান্য খবরের তুলনায় থিয়েটারবিষয়ক খবর প্রকাশ আমার কাছে কম মনে হয়। স্বাধীনতার পরে একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে থিয়েটার আজ যে পর্যায়ে উঠে এসেছে, সেই তুলনায় পত্রিকাগুলোয় থিয়েটারের নিউজ আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। এতে করে থিয়েটারে আমাদের ছেলেমেয়েরা যে কষ্ট করে, তাতে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পেত। আমরা যখন থিয়েটারে নিয়মিত ছিলাম, তখন অনেক বেশি মঞ্চ নিয়ে লেখালেখি হতে দেখেছি। ওই সময় আমাদের নিয়ে বা আমাদের নাটক নিয়ে যে পরিমাণ লেখা হতো, সে তুলনায় এখনকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব কমই লেখা হচ্ছে। মঞ্চে নতুন নতুন নাটক আসছে। কিন্তু সেগুলো শুধু নিউজ আকারেই প্রকাশ হচ্ছে। আগে যেমন আমরা নাটকের সমালোচনা দেখতাম। এখন তেমন একটা চোখে পড়ে না। সেই চর্চার জায়গাটা পত্রিকাগুলো অনেক কমিয়ে দিয়েছে। আগে সাংবাদিকদের আমরা আমন্ত্রণ জানাতাম নাটক দেখার জন্য। পরে তা দেখে তারা রিভিউ লিখতেন। এখন সে রকম খুব একটা দেখা যায় না। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা আরেকটু সহজ করার দরকার আছে। তবে মূল কাজটা কিন্তু পত্রিকাকেই করতে হবে। তাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

লেখক: *সাংবাদিক, দৈনিক ভোরের কাগজ*

যতদিন পৃথিবীতে শোষণ-লুণ্ঠন থাকবে ততদিন গণসংগীত প্রাসঙ্গিক হয়েই থাকবে

—ফকির আলমগীর

প্রতিবেদক: বাংলাদেশে গণসংগীতের সূচনা সম্পর্কে বলুন।

ফকির আলমগীর: বাংলাদেশে গণসংগীত চর্চার এক উজ্জ্বল অধ্যায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের দান। ’৫২-এর ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত দলিল বুকে নিয়েই এই জনপদে গড়ে উঠেছে গণসংগীতের বিবর্তন। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানবিরোধী কত অগণিত গণআন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সেই রচনা ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’। প্রথমবার আবদুল লতিফ কবিতাটিকে সুরারোপ করেন এবং ঢাকা কলেজের এক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন। এই কালজয়ী গানটিতে পরবর্তী পর্যায়ে সুর করেন শহীদ আলতাফ মাহমুদ। এরপর আবদুল লতিফ নিজেও রচনা করেন– ওরা আমর মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়, এই ফাল্গুনের কথা আমরা ভুলি নাই, আমার মতো সুখী ভবে, সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা এবং কালজয়ী গান দাম দিয়ে কিনেছি বাংলাসহ অসংখ্য গান। তখন খুলনার বাগেরহাটের লোককবি সামসুদ্দিন আহমেদ লিখেছেন- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালি। রমেশ শীল গাইলেন তাঁর নিজের লেখা গান ‘আমি বাংলা ভালোবাসি’। কমরেড সত্যেন সেন লিখলেন ‘আগুন নিভাইবো কে রে’ এবং এ গানে সুর করলেন শেখ লুৎফর রহমান। খান আতা সুর করলেন ফজলে লোহানীর কথায় ‘শীতল পৃথিবী অবশ নগর’। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা ‘রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা’। ইন্দু সাহার ‘রক্ত শিমুল তপ্ত পলাশ দিলো ডাক সুনীল ভোরে’ এবং হাসান হাফিজুর রহমানের লেখা ‘মিলিত প্রাণের সংগ্রামে’ গণসংগীতে সুর দিলেন শেখ লুৎফর রহমান। সংগৃহীত একটি

বাংলাদেশে গণসংগীত চর্চার এক উজ্জ্বল অধ্যায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের দান। ’৫২-এর ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত দলিল বুকে নিয়েই এই জনপদে গড়ে উঠেছে গণসংগীতের বিবর্তন

গান 'এই পথ এই কালো পথ' সুর দিয়ে গেয়েছিলেন মাহমুদুন্নবী। গণসংগীতের পুরোধা হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভাষাসংগ্রামের ওপর তার বিখ্যাত 'ঢাকার ঢাক' লিখলেন। এরপর পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ১৯৫৪তে যুক্তফ্রন্টের আন্দোলন, ষাটের দশকের আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে মহান গণঅভ্যুত্থান। আসলে ষাটের দশকেই আন্দোলন-সংগ্রামে গণসংগীতের সোনালি ফসল ফলেছে। এরপর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। গণসংগীত এ দেশকে পদানত করে রাখার অপকৌশলকে প্রচণ্ড বিক্রমে পর্যুদস্ত করে বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তর এবং অবশেষে একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে লড়েছে। কৃষকের বিদ্রোহে কিংবা শ্রমিকের সংগ্রাম কিংবা জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামে গণসংগীত আমাদের জীবন জয়ের পাঠ শুনিয়েছে। এরপর বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে, স্বৈরাচার রাজাকারবিরোধী আন্দোলনে, শাহবাগ বসন্তে শুনিয়েছে দ্রোহের গান।

প্রতিবেদকঃ বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে গণসংগীত বর্তমান প্রজন্মকে কতটা আকৃষ্ট করছে বলে আপনি মনে করেন? গণসংগীতের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে?

ফকির আলমগীরঃ কোনো কোনো মহল থেকে কথা উঠছে গণসংগীতের আজ আর প্রয়োজন নেই। গণসংগীতের অস্তিত্ব অস্বীকার না করতে পারলেও তারা বলছেন এ গান আজ অপ্রাসঙ্গিক। কারণ কালিঝুলি মাখা অনাহারক্লিষ্ট যে শ্রমিকের বাঁচার তথা অধিকারের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণসংগীতের জন্ম হয়েছিল, সেই শ্রমিকশ্রেণি এখন আর নেই। কেউ বলছেন, অধিকাংশ শ্রমিক এখন মধ্যবিত্তে পরিণত। সুতরাং শ্রমিক আন্দোলনের প্রশ্নও অবান্তর। স্বাভাবিকভাবেই গণসংগীতকে এরা অবজ্ঞার চোখে দেখছেন এবং অপরিণত অবাস্তব ইত্যাদি বলে গালাগালি দিতে ছাড়ছেন না। এসব আলগা আলোচনা ছেড়ে চলুন আমরা গণসংগীতের জন্ম ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব তাতে বাড়তি মাত্রা ও অনুপ্রেরণা জোগান দিয়েছে। ফলে পৃথিবীর অসংখ্য দেশে এই সময় থেকে তীব্রগতিতে শ্রমিক আন্দোলন ও তার পাশাপাশি গণসংগীত আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। আমাদের দেশে গণসংগীতের সংগঠিত বিকাশ শুরু হয় এক বিশেষ মুহূর্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার অঙ্গীকার ও বাংলায় বুর্জোয়া মজুতদার সৃষ্ট কৃত্রিম মন্বন্তরের মোকাবিলা ও মানুষকে জাগানোর আহ্বানে রচিত হয় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও বিনয় রায়ের গান। মনে রাখতে হবে, ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ কিংবা মন্বন্তর মোকাবিলা কোনোটাই সরাসরি শ্রমিক সংগ্রাম ছিল না। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই তা ছিল শ্রমিক সংগ্রামের চেতনার বিস্তৃতি এবং শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শ ছিল তার প্রাণকেন্দ্র। তাই এই সংগ্রামের গান গণসংগীত ছাড়া আর কিছুই নয়। একইভাবে গণসংগীত ক্রমে বিস্তার লাভ করে তেভাগা ও তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামের গানে পরবর্তী সময়ে খাদ্য আন্দোলনের ময়দানে এবং তা পেরিয়ে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ও আধা ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের গানে। এইভাবে গণসংগীত ভারতবর্ষে বিশেষত পশ্চিম বাংলায় ধীরে ধীরে নানা রূপে ও রঙে বিকশিত হয়েছে এবং আমরা পেয়েছি বহু অসাধারণ সৃষ্টি। আজকের পৃথিবীতে এক ভয়ানক শঙ্কার মধ্যে মানুষ বাস করছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখন সব দাঁত, নখ বের করে পৃথিবীকে গ্রাস করতে চাইছে। আফগানিস্তান এবং ইরাক দখল তারই প্রমাণ। পৃথিবীর মানুষের আন্দোলন এই আক্রমণ রোধ করতে পারেনি; কিন্তু অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এই প্রতিবাদী আন্দোলনে আমেরিকা-ব্রিটেনের মতো পুঁজিবাদী দেশগুলোয় গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। একই সঙ্গে পৃথিবীকে দখল করার সর্বশেষ সাম্রাজ্যবাদী চাল বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রায় সব বিরোধী শক্তি মিলেমিশে কাজ

করছে। প্রতিদিন সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন গান। এই গানের ওপরে আক্রমণও অব্যাহত। ২০০১ সালে ইতালির জেনোয়া'য় জি-৮ ভুক্ত দেশগুলোর বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশ হয়েছিল, সেখানে শহীদ হন শ্রমিকের ছেলে ২৩ বছরের কার্লেস গিউলুয়ানি। তাঁকে নিয়ে গান রচনা ও পরিবেশনের অপরাধে ইতালির শিল্পী শ্রীমতী জেনিফার ক্যাথারিন গ্রিফিন আজও ইতালি থেকে নির্বাসিতা। কিন্তু শত আক্রমণ সত্ত্বেও আন্দোলন দিন দিন বাড়ছে, গানও চলছে। এই প্রসঙ্গে দু'-একটি কথা বলা যেতে পারে। পুঁজিবাদী দেশগুলোয় বিশ্বায়নের ধাক্কা লেগেছে কয়েক বছর আগে। ফলে প্রতিবাদী আন্দোলনও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ভারতবর্ষ এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় এ বিষয়ে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। পৃথিবীর সঙ্গে তাল মেলাতে হলে আমাদের আরো দ্রুত পায়ে এগোতে হবে। তাতে গণসংগীত কর্মীদের দায়িত্ব বড়, কম নয়। দিনের পর দিন গণসংগীত আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যতদিন পৃথিবীতে শোষণ-লুণ্ঠন থাকবে, ততদিন গণসংগীত প্রাসঙ্গিক হয়েই থাকবে। এটা ঠিক, বিগত একশ' বছরে শ্রমিকের চেহারা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। অতীতের তেল কালিমাখা শ্রমিকের একাংশকে আজ কারিগরি উন্নতির কারণে দেখতে পাওয়া যাবে না। হয়তো দেখা যাবে একদল মানুষ কম্পিউটারে বসে কাজ করছেন। কিন্তু তার জন্য বলা যাবে না তাঁরা প্রকৃত শ্রমিক নন। শ্রেণি সম্পর্কের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে তাঁরাও শ্রমিক। জার্মানির প্রখ্যাত গণসংগীতকার হানস্ এইসলার বলেছিলেন, আধুনিক শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের গান হলো গণসংগীত। আমি তার সূত্র ধরে বলতে পারি, যতদিন শ্রমিকশ্রেণি থাকবে, ততদিন গণসংগীত থাকবে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক হয়েই।

প্রতিবেদক: আপনার সংগীত শ্রোতা-সাধারণের মাঝে একটি জায়গা করে নিয়েছে। আপনি কি মনে করেন ভবিষ্যতেও আপনার সংগীতের আবেদন টিকে থাকবে?

ফকির আলমগীর: সংগীত কেবলই বিনোদন নয়। সংগীত মানুষকে নিয়ে যেতে পারে তার আত্মার কাছে। শুদ্ধ করে তুলতে পারে একজন অপবিত্র মানুষকে। তুলে ধরতে পারে একটি জনপদের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা আর বিজয়কে। তাই সংগীতকে কেবল বিনোদন না ভেবে সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছি সেই প্রথম থেকে। জনকল্যাণে সংগীত, মানুষের মুক্তির জন্য সেই গণসংগীতকেই বেছে নিয়েছি। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে মানুষের পাশে থেকেছি। তাই আমি মনে করি, অতীতের মতো আগামী দিনেও আমার গানের আবেদন থাকবে। আমি হয়তো থাকব না, কেউ না কেউ এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রতিবেদক: বর্তমানে আপনার সংগীত ভাবনা কী?

ফকির আলমগীর: সমাজের বিভিন্ন কিছু বদলের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত ভাবনারও বদল এসেছে। সংগীত বদ্ধ জলাশয় নয়, এটি একটি বহতা নদী। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা গ্রহণ করব, সেই সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্র, নজরুল, হাসন, লালন, রাধারমণ, শাহ আবদুল করিম, আব্বাস, আলীম, জসীমউদ্‌দীনসহ সোনালি অতীতের সঙ্গে সমকালীন ভাবনায় সমৃদ্ধ করব।

প্রতিবেদক: বাংলাদেশে সংগীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলুন।

ফকির আলমগীর: আমি আশাবাদী, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সংগীতের বিবর্তন হলেও এর চিরকালীন আবেদন কখনোই নষ্ট হবে না। সংগীত অতীতের মতোই আমাদের সমাজের রক্তশূন্যতায় রক্তের সঞ্চার করবে। ৫২, ৬২, ৬৯, ৭১-এ সংগীত যেমন আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে, তেমনি উদ্দীপিত করেছে আমাদের। অপসংস্কৃতি রুখে তারুণ্য সংগীতকে তুলে ধরবে তার বিজয় পতাকা হিসেবে।

প্রতিবেদক: আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

ফকির আলমগীর: ১৯৭৬ সালে গঠন করি ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সঙ্গে জড়িত থেকেছি সেই শুরু থেকে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক ছিলাম। গণসংগীত আমার বিষয়, লোকসংগীত শিল্পী হিসেবেও আমি গর্ববোধ করি। ভবিষ্যতেও গণসংগীত ও লোকসংগীত উন্নয়নে কাজ করে যাব। পরিকল্পনা আছে একাডেমি গড়ে তোলা। এর উন্নয়নে প্রচুর লেখালেখি করছি।

প্রতিবেদক: আপনি সাংবাদিকতার ছাত্র হয়ে সংগীত জগতে চলে এলেন। সাংবাদিকতার সঙ্গে আপনার কোনো সংশ্রব আছে কি?

ফকির আলমগীর: আমি কাগজে প্রচুর কলাম লেখি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই জীবন সদস্য, সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই উপদেষ্টা, সংগ্রাম করি বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে। যুক্ত থাকি সময়ের সংগ্রামে। আমি প্রচুর গ্রন্থ লিখেছি।

প্রতিবেদক: সংগীত জীবনে আপনার আনন্দ-বেদনার কথা বলুন।

ফকির আলমগীর: আমার বেদনা নিয়েই আমার সংগীত। শিষ্টাচার কি আছে আর ভালোবাসা ছাড়া, সবকিছু উজাড় করে হাতে একতারা। সেই কবেকার মল্লিকারা আজও আমার জীবনের এই বেলায় শেফালির সুমিষ্ট গন্ধ ছড়ায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: এফ রহমান রূপক

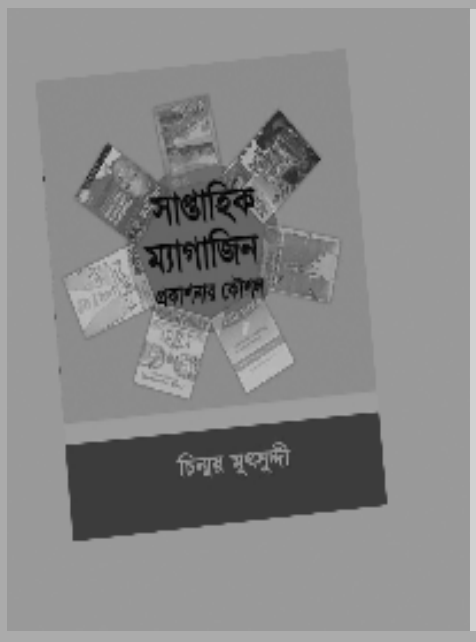

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বাংলা গানের মূলধারা

ড. শিল্পী ভদ্র দীপা

সহজ কথায় বাংলা গানের ধারা বিষয়ে বলা যায়, বাংলা গানের তিনটি ধারা আর সেগুলো হচ্ছে–

১. মার্গীয় সংগীত / শাস্ত্রীয় সংগীত বা ক্লাসিক মিউজিক।
২. দেশি সংগীত/ পল্লীগীতি/ লোকগীতি বা আঞ্চলিক গান এবং
৩. পূর্বোক্ত দু'ধারার সম্মিলনজাত গণসংগীত বা আধুনিক সংগীত।

১ম শ্রেণির গানের প্রধান বিভাজনে বলা যায়, 'ভাটিয়ালি, সারি, ভাওয়াইয়া, তরজা, গম্ভীরা, বাউল, জারি, ধামাইল, চট্‌কা, কীর্তন, ভজন, শাক্ত, ঝুমুর, হোলি ইত্যাদি।'[১]

২য় শ্রেণিতে 'ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, তারানা, ধামার, ঠুমরি ও যন্ত্রসংগীত লক্ষণীয়।'[২]

৩য় শ্রেণির গানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রাধান্যের কারণে এসব গানের সুরের আঙ্গিক উদার এবং স্বাধীন সত্তা এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু সংগীতের মূলধারার উৎস অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের সুদূর অতীতের দ্বারস্থ হতে হবে। কারণ মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, ঝুকর ইত্যাদি সিন্ধু উপত্যকার প্রত্নতত্ত্বীয় দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনমূলক উপাদানের মধ্যে সংগীতের কয়েকটি সামগ্রী অন্যতম। অনেকের মতে, এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩০০০ বৎসরের মধ্যে। সেখানে পাওয়া গিয়েছে 'হাড়ের বিকৃত বাঁশি, বীণা, চামড়ার বাদ্য, ব্রোঞ্জের একটি নৃত্যশীলা নারী ও দু'টি ভগ্নমূর্তি। তাছাড়া আরো বাঁশি, বিকৃত

সংগীতের মূলধারার উৎস অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের সুদূর অতীতের দ্বারস্থ হতে হবে। কারণ মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, ঝুকর ইত্যাদি সিন্ধু উপত্যকার প্রত্নতত্ত্বীয় দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনমূলক উপাদানের মধ্যে সংগীতের কয়েকটি সামগ্রী অন্যতম

বীণার অবয়ব, ব্রোঞ্জের আরো তিনটি নৃত্যশীলা নারীমূর্তি, করতাল জাতীয় যন্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। হাড়ের বাঁশি যেমন আদিমতম যন্ত্রের উদাহরণ, বীণা, মৃদঙ্গজাতীয় যন্ত্র, তন্ত্রীযুক্ত বাদ্য তেমন উন্নততর সংস্কৃতির উদাহরণ।'[৩]

এরপর আসে বৈদিক যুগের নাম। সময়টা খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ৬০০/৫০০। সেখানে গানের স্তর হিসেবে এসেছে পূর্বাচিক, আরণ্যক, সংহিতা, উত্তরার্চিক। 'এগুলো গ্রামগেয় বা প্রকৃতি গান, আরণ্যক গান, উহগান বা রহস্যগান। গ্রামগেয় গানগুলো সাধারণ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত।'[৪]

তবে পরবর্তীকালের সামগান– যেগুলো চতুর্বেদ অবলম্বনে নানা শ্রেণির গান। এরা স্বরযুক্ত ঋকমন্ত্র বা সামের সমষ্টি এবং ৩ স্বর, পরে ৫ স্বর ও ৭ স্বরে প্রচলিত। এই সংগীত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে লৌকিক সমাজে প্রচারিত হতো।

সামগানের পর আসে গন্ধর্ব গানের ধারা। ৬০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ সময়ে প্রচলিত এই সংগীতের বাহন হলেন 'দ্রুহিন ব্রহ্মা ও সদাশিব'।[৫]

ভারতীয় সংগীতের ধারাবাহিকতায় গান্ধর্বগীতের উত্তরকালে বাংলা ভাষা তৎকালীন অন্যান্য লৌকিক ভাষা যেমন মৈথিলী, অসমীয়া, ওড়িয়া, নেওয়ারি, দেবনাগরীর মতো একটি লৌকিক ভাষা হিসেবে পরিগণিত ছিল বলে ভারতীয় সংগীতের প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য বাংলাভাষার চর্যাপদেও ছড়িয়ে পড়ে। সুকুমার রায়ের মতে–

'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাগীতি সে যুগের লৌকিক ভাষায় রচিত গানের উদাহরণ। যে ভাষায় গানগুলো রচিত হয়েছে তাকে পূর্বাঞ্চলের বর্তমান মৈথিলী, বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার আদিপুরুষরূপে গণ্য করা হয়।'[৬]

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫০ থেকে ১২০০ শতক পর্যন্ত চর্যাগীতি রচনার সময় নির্ধারণ করেছেন। কারণ 'তখন অপভ্রংশের যুগ'[৭] এবং লৌকিক ভাষাও অপভ্রংশের স্তরেই ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সংগীতও তখন লৌকিক ভাষাতেই রচিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপমহাদেশীয় সংগীত সম্পর্কে অনুসন্ধানের সূত্র সিন্ধু-সভ্যতা থেকেই শুরু। কারণ এর আগে কোনো নিদর্শনে সংগীতের ইতিহাস-সংবলিত সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তবে সিন্ধু সভ্যতা, উপমহাদেশে পারস্য ও গ্রিক সভ্যতার অংশবিশেষ, ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন মন্দির গাত্রে খোদিত নর্তক-নর্তকীর এবং বাদ্যযন্ত্রের চিত্র, শিলালিপি, গুহাচিত্র থেকে প্রাচীনকালের নৃত্যানুষ্ঠান ও 'বাদ্যযন্ত্রের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।'[৮]

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উৎসকাল ৮ম থেকে ১২ শতাব্দী। এ সময়েই চর্যাগীতিকা রচিত হয়েছিল। তবে তারপরেও ২০০-৩০০ বছর গোপনে চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল। শশীভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে এ ধরনের শতাধিক পদ উদ্ধার করেন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'নব চর্যাপদ' নামে তা সংকলিত ও প্রকাশিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগীত **'চর্যাগীতিকা'** বাংলা গানের আদি নিদর্শন। বাংলা সাধন সংগীত শাখাটির সূত্রপাতও হয়েছিল এই চর্যাপদ থেকে। এই বিবেচনায় এটি একটি ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা হলেও এর পদগুলোতে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিও উজ্জ্বল। এর সাহিত্যগুণ আজও চিত্তাকর্ষক।

১৯০৭ খিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে চর্যার ১টি খণ্ডিত পুঁথি উদ্ধার করেন। পরবর্তীকালে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলা ভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিটিতে ৫০টি চর্যায় মোট ২৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন– 'লুই, কুক্কুরী, বিরু, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কম্বলাম্বর, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর আজদেব, ঢেন্ডন, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কন, জান্দি, ধাম, তান্তীপা, শবরপাদ, লাড়ীডোম্বী।'[৯] এদের মধ্যে লাড়ীডোম্বীর পদটি পাওয়া যায়নি। ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক পদগুলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিতে না থাকলেও ড. প্রবোদ চন্দ্র বাগচী আবিষ্কৃত তিব্বতি অনুবাদে এগুলোর রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়েছে যথাক্রমে কাহ্ন, তান্তী পা ও কুক্করী। এই নামগুলোর অধিকাংশই তাদের ছদ্মনাম এবং ভণিতার শেষে তারা নামের সঙ্গে 'পা' (>পদ) সম্ভ্রমবাচক অর্থে[১০] ব্যবহার করতেন।

চর্যার পুঁথিতে সর্বাধিক পদ রচয়িতা **কাহ্ন বা কাহ্নপাদ**। তিনি **কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপাদ** ও **কৃষ্ণবজ্র** নামেও পরিচিত। পুঁথিতে তার মোট ১২টি পদ পাওয়া যায়। ইনি ওড়িশার এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। শৌরীসেনী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশজাত বাংলায় তিনি পদ রচনা করেন। **ভুসুকপাদ** বাঙালি ছিলেন বলে অনেকের অনুমান। কেউ কেউ তাকে চর্যাগানের শান্তিপাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।

চর্যার ভাষা: চর্যাপদের ভাষা বাংলা কি-না; সে বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল; পরবর্তীকালে যার অবসান হয়েছে। এটি সৃজ্যমান বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। চর্যাপদের রচয়িতা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সংস্কৃতে পারদর্শী হলেও তারা তৎকালীন অপরিণত বাংলাতেই পদগুলো রচনা করেছিলেন। চর্যাপদের ভাষা বাংলা ভাষার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত আদিতম রূপ। অসমীয়া, ওড়িয়া বা মৈথিলি বিদ্বজনেরা এই ভাষায় নিজেদের পূর্বসূরিত্বের সন্ধান করলেও ভাষা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল বাংলা ভাষারই অনুকূল। এই ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের সাধন-সংগীতের ভাষা বিধায় অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। যদিও এতে উল্লিখিত ছন্দ ও রাগ-রাগিণী পরবর্তীকালে বাঙালি কবিদের পথ নির্দেশিকারূপে কাজে আসে। তবে প্রাচীন কবিদের মতে, এতে সন্ধ্যা বা আলো-আঁধারি ভাষা ব্যবহার করা হয়; সেইসাথে গদ্যছন্দ ব্যবহৃত হয়।

চর্যাসংগীত: চর্যাপদ একাধিক চরণবিশিষ্ট, অন্ত্যমিলযুক্ত ও গীতিধর্মী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্রধর্মী শ্লোক বাংলা সাহিত্যের ওপর কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বরং চর্যার গীতিকবিতাগুলোই পরবর্তী বাংলা কাব্যসংগীতের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আদর্শ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে চর্যার কবিরা যে তাদের ধর্মদর্শন ও সাধনপদ্ধতি রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করে গান বেঁধেছিলেন, পরবর্তীকালের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধক কবিরা সেই আদর্শেই তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। বৈষ্ণব পদাবলি, বাউল গান, সুফি, মুর্শিদি গান, নাথপন্থী, দেহযোগী গান বা শাক্তপদাবলি– সবই চর্যাসংগীতের উত্তরসূরি।

চর্যার পদগুলোতে পদকর্তার নামের সঙ্গে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নামও পাওয়া যায়। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, এই পদগুলো সুর সহযোগে গাওয়া হতো।

চর্যাগীতিতে যেসব রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে সেগুলো হলো– পটমঞ্জরী, মল্লারী, গুঞ্জরী, গুর্জরী, কহ্নগুঞ্জরী, কামোদ, বরাড়ী, ভৈরবী, গবড়া (গউড়া), দেশাখ, রামক্রী, শবরী, অরু, ইন্দ্রতাল, দেবক্রী, ধনসী, মালসী-গবড়া ও বঙ্গালী।[১১]

চর্যাগীতিতে প্রতি পদের প্রত্যেক ২ লাইনের শেষে 'ধ্রু' শব্দটি পাওয়া যায়, যার ধ্রুবপদের সংকেত বলে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেছেন। তিব্বতিতে এই পদকে 'ধু পদ' বলা হয়েছে। প্রত্যেক পদ গাইবার পর প্রত্যেক শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার জন্য বারবার ধ্রুবপদ গাইবার রীতি ছিল।

চর্যাগীতির উদাহরণ

ঢেণ্ঢণের পদে দেখা যায়–

'টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী,/
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।"[১২](পদ ৩৩, অর্থাৎ– টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে।)

আবার কখনও তত্ত্বের ব্যাখ্যায় যে প্রহেলিকার অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলিও অসমান্য সাহিত্য গুণমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যেমন: কুক্কুরীপাদ লিখেছেন– 'দুলি দুহি পিটাধরণ ন জাই।/ রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাআ।।'[১৩] অর্থাৎ মাদী কাছিম দোহন করে দুধ পাত্রে রাখা যাচ্ছে না। গাছের তেঁতুল কুমিরে খাচ্ছে।)

পরিশেষে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

'যত গুহ্য অধ্যাত্ম সাধনার গূহ্যতর তত্ত্বই ইহাদের মধ্যে নিহিত থাকুক না কেন, স্থানে স্থানে এমন পদ দু'চারটি আছে যাহার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, ও চিত্রগৌরব এক মুহূর্তে মন ও কল্পনাকে অধিকার করে। অথচ এ কথাও সত্য যে, সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীতগুলো রচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজ সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী জীবনাচরণের (চর্যার) আনন্দকে ব্যক্ত করিবার জন্য। সহজ সাধনার এই গীতিগুলি কর্তৃক প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সহজিয়াগণ, বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলি, আউল-বাউল-মারফতি-মুর্শিদি গানের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে।"[১৪]

বাংলা গানের আদি পর্বে চর্যাগীতি, আদি-মধ্যযুগে গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মধ্যযুগে মঙ্গলগীতি, চৈতন্যদেবের জীবনীকাব্য, প্রণয়-পাঁচালি, প্রাগাধুনিককালের রাম প্রসাদ, নিধুবাবু, লালন, রাধারমণ, মুকুন্দ দাসের মধ্য দিয়ে বাংলা সংগীতের ভাব ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা দেয়া হলো:

গীতগোবিন্দ

'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত রচনা হলেও বাংলা সাহিত্য-সমাজে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ। এর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত গভীর। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির জন্ম জয়দেবের **গীতগোবিন্দের** পদাবলি থেকে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে আধুনিককাল

পর্যন্ত বাংলাদেশে পদাবলির রচনা চলেছে। উনিশশ' সত্তরের দশকে কিশোর রবীন্দ্রনাথ **'ভানুসিংহের পদাবলী'** নামে পদাবলি রচনা করেন।

বস্তুত দ্বাদশ শতকের বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় সেন শাসকদের অধীনে এ সময় বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থান ঘটে। একদিকে ধর্মশাস্ত্র ও অন্যদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এ যুগকে অমর করে রেখেছে।**'গীতগোবিন্দ'** কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা **কবি জয়দেব** এ যুগের সার্থক রূপকার। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– তিনি এ যুগের লৌকিক সাহিত্যের গীতিকবিতাকে সংস্কৃত শ্লোকে সাজিয়ে, সংস্কৃত ভাষায় অভিনব গীতিকবিতার সৃষ্টি করেন। তার গীতিকবিতার আদর্শে বাংলার পদাবলি কীর্তন ও অনুরূপ গীতিকবিতার সৃষ্টি হয়। তিনি সর্বভারতীয় কবিদের অন্যতম। এছাড়া তিনি নৃত্যাচার্য এবং প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ। তার কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ **'গীতগোবিন্দ'** আজও দক্ষিণ ভারতের কলাকেন্দ্রসমূহ থেকে আলোকিত। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে নৃত্যরতা নারী – এই ভঙ্গিটির নেপথ্যে রয়েছে এক বাঙালি নৃত্যবিদের (জয়দেবের) সৃজনশীলতা। জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নের অন্যতম। তার স্ত্রী পদ্মাবতী গীত ও নৃত্যে পটিয়সী ছিলেন। পদ্মাবতী-জয়দেব যুগল শিল্পময় জীবনযাপন করতেন।

'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থের বিষয় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা। সেন আমলের রাজাদের ভাষা হিন্দু-সংস্কৃত দেবভাষা। এজন্যই **'গীতগোবিন্দ'** সংস্কৃত ভাষায় লেখা। **'বাংলা গানের বিবর্তন'** বইয়ে করুণাময় গোস্বামী লিখেছেন– 'বাংলা গানের ইতিহাস এবং বলতে গেলে ভারতবর্ষের সংগীত ও নৃত্যকলার ইতিহাসে এক অতুলনীয় স্থান অধিকার করে আছে 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থটি (পৃ.২৩)।'[১৫] অধ্যাপক সুনীল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন– 'ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কাব্যটির ওপর ৪০টিরও বেশি টীকা রচিত হয়েছে। তা থেকে এর সর্বভারতীয় খ্যাতির পরিমাপ করা যায় **(প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,** পৃ.৩৫৫)।'[১৬]

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, জয়দেবই প্রথম তার কাব্যগ্রন্থে দেবতার দিক থেকে মানুষের দিকটাকে বড় করে দেখালেন। অধ্যাপক সুনীল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন– 'অলৌকিক দেবতাদের মানবিকীকরণের ইঙ্গিত তিনিই প্রথম দেন **(প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,** পৃ. ৩৫৫)।'[১৭] এ কারণে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের গানগুলো বলা যায় মানুষের গান। এর অন্তর্গত গানগুলো **অষ্টপদী বা ৮ লাইনের**। 'গীতগোবিন্দ' ১২টি সর্গে ও ২৪টি গানে বিভক্ত। প্রতিটি গানের ওপর রাগ ও তাল লেখা আছে। চর্যাপদে কিন্তু তালের উল্লেখ নেই, রাগের উল্লেখ আছে। **গীতগোবিন্দর** তালগুলোর নাম– রূপক, নিঃসারয়তি, একতালী, অষ্টতাল। আর রাগের নাম– মালবগৌড়, গুজ্জরী, কর্ণাট, দেশাখ, ভৈরবী, বিভাস, বসন্ত। **গীতগোবিন্দ** সংস্কৃত ভাষায় লেখা বলে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত। তবে সংস্কৃত কাব্যের সাথে পার্থক্যও রয়েছে। যেমন- অন্ত্যমিল। গীতগোবিন্দের অন্ত্যমিল বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

দক্ষিণ ভারতে নারীদের নৃত্যে, ১৭ শতক থেকে তামিল নৃত্যে, অন্ধ্রের নৃত্যকলায়, কথাকলি নৃত্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে জয়দেবের গীত-নৃত্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রভাব বিস্তার করে।

পরবর্তীকালে বাংলা পদাবলি সাহিত্যে জয়দেবের গভীর প্রভাব পড়ে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবপন্থী বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জয়দেবকে আদিগুরু এবং রসিকদের অন্যতম বলে মর্যাদা দিয়েছেন। মনিপুরেও জয়দেবের সম্মান অপরিসীম। মণিপুরী ধর্মীয় জীবনে রাধাকৃষ্ণ লীলা অপরিহার্য বিষয়। ষোড়শ-শপ্তদশ শতক থেকে মণিপুরে গীতগোবিন্দ জনপ্রিয় হয়ে ওঠতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য** আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শন। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনেক। কারণ এটিই প্রথম বাংলায় রচিত কৃষ্ণকথা-বিষয়ক কাব্য। অনেকে মনে করেন, এই গ্রন্থের পথ ধরেই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলির সূত্রপাত ঘটে। তবে এই কাব্যের ভাব বৈষ্ণব-মোহান্তদের নির্দেশিত ভাব-ব্যঞ্জনার সাথে মেলে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন–

'জয়দেব ও ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে এ ধরনের কাব্য সমগ্র পূর্বভারতেই আর পাওয়া যাবে না। ...বোধহয় সেকালের শ্রোতারা এই পাঁচালি গানে বাস্তবতার সঙ্গে কিছু অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাও লাভ করত। কিন্তু আধুনিককালের পাঠক এ কাব্যের প্রত্যক্ষ আবরণ অধিকতর আনন্দের সঙ্গে আস্বাদন করবেন। রাধাকৃষ্ণলীলায় কিছু উত্তাপ ছিল, জয়দেবের গীতগোবিন্দে সেই উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে; সে উত্তাপ অভিনব জয়দেব, বিদ্যাতির পদেও কিছু স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করেছে। ভারতচন্দ্র সেই উত্তাপকে কামনার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে নর-নারীর প্রণয়-চর্চাকে আলোকিত করেছেন। দেহের সেই রহস্য চৈতন্য ও উত্তর চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলতিে উত্তাপ হারিয়ে স্থির দীপশিখায় পরিণত হয়েছে।'[১৮]

বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী দেবীর উপাসক ছিলেন। সম্ভবত বাসলী দেবী তথা চণ্ডী বা মনসা দেবীর বাৎসরিক পূজায় গীত হওয়ার জন্য দেবীর স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হয়ে কবি এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বিষ্ণুর অবতাররূপে কৃষ্ণের জন্ম, বড়ায়ির সহযোগিতায় বৃন্দাবনে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয় এবং অন্তে বৃন্দাবন ও রাধা উভয়কে ত্যাগ করে কৃষ্ণের চিরতরে মথুরায় অভিপ্রয়াণ– এই হচ্ছে **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'** কাব্যের মূল বিষয়। আখ্যানটি মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত– জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্র-খণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও বিরহ-খণ্ড।[১৯]

অন্তিম অংশ 'রাধাবিরহ'র শেষের পৃষ্ঠাগুলো পাওয়া যায়নি। পুঁথিটি খণ্ডিত বলে সন-তারিখও জানা যায় না। কাব্যের প্রধান চরিত্র ৩টি– কাহ্নাঞি, রাধা এবং বড়াঞি। এই কাব্যটি সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দম্' এর মতো আখ্যানধর্মী ও সংলাপের আকারে রচিত হওয়ায় এতে প্রাচীন বাংলা নাটকের (চিত্রনাট্যগীতি) আভাস মেলে। পূর্বতন লোকব্যবহারে অমার্জিত স্থূল রঙ্গরসের যে ধামালী গান প্রচলিত ছিল, তা থেকেই কবি এর আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছিলেন। কাব্যটিতে প্রকৃত প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ পালাগান বা নাটের ঠাটে উপস্থাপিত। এটি স্থানে স্থানে আদিরসে জারিত ও গ্রাম্য অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হলেও আখ্যান ভাগের বর্ণনানৈপুণ্য ও চরিত্রচিত্রণে মুনশিয়ানা আধুনিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিতে বেশ কয়েকবার উদ্ধৃত মর্মস্পর্শী ১টি পদ–

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে।
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হুআঁ তার পাএ নিশি বোঁ আপনা।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলো কোন দোষে।
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।' [২০]

চর্যাপদ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এরকম আর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আদিযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে ঠিক আদর্শ বাংলা ভাষায় রচিত কোনো কবিকৃতি বলা যায় কিনা, তা নিয়ে সংশয় আছে। তবে মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাস **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'** কাব্যের মধ্য দিয়ে বিষয়ের দিক থেকে যেমন, ভাষার দিক থেকে তেমন ব্যাপকতম পরিবর্তন সাধন করে বাংলা ভাষাকে ১টি মর্যাদার আসনে স্থান দেন এবং কবিতাকে খানিকটা শৈল্পিক তাৎপর্যে উন্নীত করতে সমর্থ হন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বের বলে অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছেন।

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে যে ভাষায় পদ রচিত হয়েছে, সেটিকে সংস্কৃতের বাংলা বলে মেনে নেওয়াই ভালো। এক্ষেত্রে জয়দেবের **গীতগোবিন্দের** ভাষার সঙ্গে এই পদসমূহের ভাষায় ১টি সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় বলে কারো কারো অভিমত। মধ্যযুগের এই পদসমূহের ভাষা এতটাই জটিল যে, তা সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য নয়। তবে উল্লেখ্য যে আদি-মধ্য যুগের কবিদের সব পদই গান হিসেবে গাওয়া হতো; তাই এসব পদে নানা ধরনের রাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সে পদগুলোতে তাই পাহাড়ি রাগ, কেদাররাগ, শ্রীরাগ, কোড়ারাগ, গুজ্জরীরাগ, রামগিরিরাগ, ধানুষী রাগ, দেশরাগ, মালব রাগ, ভৈরবি রাগ, মল্লার রাগ, বেলাবলি রাগ, আহের রাগ, দেশবড়ারি রাগ, ভাটিয়ালি রাগ, কুহুরাগ, শৌরীরাগ প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে।

মঙ্গলকাব্য

বাংলার নিজস্ব উাপাদান নিয়ে রচিত লৌকিক দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনিকাব্যকে **মঙ্গলকাব্য** বলা হয়। চৈতন্যপূর্ব যুগেই এদের উদ্ভব এবং নামকরণ নিয়ে রয়েছে মতভেদ। সচরাচর এর পালাগুলো এক মঙ্গলবার শুরু এবং আরেক

মঙ্গলবার শেষ হতো বলে **মঙ্গলকাব্য** নামকরণ হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। অন্য মতে, কাব্যগাথার মাধ্যমে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার এবং তা শ্রবণ– ধর্মীয় বিনোদনের সঙ্গে মঙ্গল কামনা বাঙালি হিন্দু কবিদের **মঙ্গলকাব্য** রচনার প্রেরণা।

প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাপূর্ণ বঙ্গদেশে স্বাভাবিকভাবেই এসেছেন পুরাণের দেবদেবীরা এবং ভক্তমনের কল্পনাপ্রসূত অসংখ্য মানব ও অতিমানব। সেজন্য চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে শাশ্বত বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া সংগ্রামী মানুষের প্রতীক। এ কাব্যগুলো থেকে বাংলাদেশের তৎকালীন ধর্ম, রাষ্ট্র, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য উঠে এসেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন **মনসামঙ্গল**। তন্মধ্যে বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ(১৪৯৪) সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। মনসামঙ্গল একসময় পূর্ববঙ্গের জাতীয় কাব্যের মর্যাদা পেয়েছিল। এ কাব্য-ইতিহাসে **চণ্ডীমঙ্গলকাব্যধারা** সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৬শ শতক) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যরচনার জন্য রাজা রঘুনাথ কর্তৃক 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন।[২১] অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হচ্ছে– **ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল** ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গলের আদিকবি **ময়ূরভট্ট** কিন্তু ধর্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন **খেলারাম চক্রবর্তী**। তার কাব্যের নাম **'গৌড়কাব্য'**; কিন্তু এগুলোর পুঁথি পাওয়া যায়নি। শুধু **রূপরাম চক্রবর্তীর** কাব্যই পাওয়া গিয়েছে। কাব্যটির রচনাকাল ১৬৪৯-৫৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বলে ধারণা করা হয়। রূপরাম বাস্তব জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজীবন বর্ণনা করেছেন। 'দেবতা শিব বাঙালি হিন্দুর জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাঙালির সুখ-দুঃখ ভরা সংসারের কথা স্থান পেয়েছে **শিবমঙ্গলে**।'[২২] এ ধারার ১ম কাব্য দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' (১৬৭৪)। কাব্যটি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামের পটিয়ায়। শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কাহিনি রচয়িতা রামেশ্বর চক্রবর্তী (১৭১০-১১)।

এছাড়া **শীতলামঙ্গল** ও **ষষ্ঠীমঙ্গল**নামে দু'টি মঙ্গলকাব্যের কথাও জানা যায়। ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের কথা নিয়ে রচিত শেষোক্ত কাব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কাব্যে সমাজ-ধর্মের সমন্বয় প্রয়াসে নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের কথা আছে। ফলে **দক্ষিণরায়ের** সঙ্গে মুসলমান পীর বড় **খাঁ গাজীর** পূজাও এতে স্থান পেয়েছে।

১৭৮৩– এ সময়ে নতুন দেবদেবী নিয়েও কিছু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়, যেমন– সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল প্রভৃতি।

১৮ শতকে মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। তার প্রধান রচনা অন্নদামঙ্গল। এটি ৮টি পালায়, ৩ খণ্ডে বিভক্ত। তার আরো কয়েকটি গ্রন্থ হলো সত্যনারায়ণের পাঁচালি, রসমঞ্জরী এবং সংস্কৃতে রচিত নাগাষ্টক ও গঙ্গাষ্টক। অন্নদামঙ্গল পরবর্তীকালের কবিদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। কালিকামঙ্গলের কবিরা এ কাব্যকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেন। 'তাছাড়া ১ম ব্যাকরণ রচনায় হ্যালহেড (১৭৭৮) ও লেবেদেফ (১৮০১) এবং বাংলা অভিধান রচনায় (১৭৯৯-১৮০২) ফরস্টার অন্নদামঙ্গলের ভাষার উদাহরণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্ত্যমধ্যযুগে উঁচুমানের সাহিত্য ভারতচন্দ্রের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে। ছন্দের চমৎকার প্রয়োগ, বিশাল শব্দ-সম্ভার, পদ-রচনায় লালিত্যগুণের সঞ্চার ইত্যাদি কারণে তার কাব্য অনুপম হয়ে উঠেছে।'[২৩]

চরিতকাব্য

শ্রীচৈতন্য ও তার কয়েকজন সহযোগীর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে বৈষ্ণবচরিত শাখা গড়ে উঠেছে। কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয়, মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই চরিতকাব্য একটি অভিনব ধারা। সমকালের অথবা ঈষৎ পূর্ববর্তীকালের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে এরূপ কাব্য অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। সংস্কৃতে ১ম রচিত জীবনীগ্রন্থ **চৈতন্যচরিতামৃত**। এর রচয়িতা মুরারী গুপ্ত ছিলেন চৈতন্যদেবের সতীর্থ। গ্রন্থটি গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে 'কড়চা' আকারে রচিত। 'এজন্য এটি **'মুরারী গুপ্তের কড়চা'**নামেও পরিচিত।'[২৪] এতে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা আছে। বাংলা ভাষায় রচিত ১ম জীবনী কাব্য **'চৈতন্য ভাগবত** (১৫৪৮) তার মৃত্যুর ১৫ বছর পরে রচিত হয়। শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর নিত্যানন্দের উৎসাহে বৃন্দাবন দাস প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) জোড় চরণে এ বিশাল কাব্য রচনা করেন। **মুরারী গুপ্ত** রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ হিসেবে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন; আর **বৃন্দাবন দাস** শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে চৈতন্যলীলা প্রচার করেন। সময়ের দিক থেকে **লোচনদাসের** চৈতন্যমঙ্গল (১৫৭৬) দ্বিতীয় এবং ১৬ শতকের শেষদিকে একই নামে **জয়ানন্দ** রচনা করেন তৃতীয় গ্রন্থ।

তুলনামূলকভাবে **লোচনদাসের** চৈতন্যমঙ্গল অধিক পরিশীলিত ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। তিনি নিজ বাসস্থান শ্রীখণ্ডের ভাবধারানুযায়ী **'গৌরনাগর'** রূপে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন। 'শ্রীচৈতন্যদেবের ৪র্থ জীবনীকাব্য **কৃষ্ণদাস কবিরাজ** রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৬১২)।'[২৫] কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবনের অন্যতম গোস্বামী **রঘুনাথ দাসের** শিষ্য ছিলেন। প্রামাণিক তথ্য, বিষয়-বৈচিত্র্য, রচনার পারিপাট্য প্রভৃতি গুণে কাব্যখানি পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। চৈতন্যজীবন মুখ্য হলেও এতে বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব, দর্শন, বিধিবিধান, সমকালের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের নানা তথ্য উঠে এসেছে। রাধাকৃষ্ণের যে ঐশীপ্রেম ও ভক্তিবাদের ওপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত , কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যদেবকে তারই বিগ্রহরূপে চিত্রিত করেছেন। পাঠক-নন্দিত এ কাব্যটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি গ্রন্থটি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সিডিমক ইংরেজি গদ্যানুবাদে এবং তা টনি কে স্টুয়ার্টের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

চৈতন্য পরিকরদের নিয়েও জীবনীকাব্য রচিত হয়েছে। সেজন্য অদ্বৈতাচার্যের জীবনী নিয়ে সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন অনেকে। অদ্বৈতাচার্যের বাল্যলীলা নিয়ে সংস্কৃতে 'বাল্যলীলাসূত্র' (১৪৮৭) রচনা করেন হরকৃষ্ণ দাম। **'অদ্বৈতপ্রকাশ'** (১৫৬৯) নামে ১ম বাংলা কাব্য রচনা করেন ঈশান নাগর। এরপর হরিচরণ দাসের **'অদ্বৈতমঙ্গল'** এবং এই নামেই শ্যামাদাস ৩য় কাব্য রচনা করেন, তবে কাব্যটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। ৪র্থ কাব্য হচ্ছে, ১৮ শতকে রচিত নরহরি দাসের **'অদ্বৈতবিলাস'**। এসব কাব্যে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। অদ্বৈতাচার্যের পত্নী সীতাদেবীর জীবনী **'সীতাচরিত'** ও **'সীতাগুণকদম্ব'** যথাক্রমে লোকনাথ দাস ও বিষ্ণুদাস আচার্য রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ সহচর শ্রীনিবাসের জীবনচরিত **'প্রেমবিলাস'** (১৬০১) রচনা করেন নিত্যানন্দ দাস। এছাড়া যদুনন্দন দাসের **'কর্ণানন্দ'** (১৬০৮), গুরুচরণদাসের **'প্রেমামৃত'** এবং মনোহর দাসের **'অনুরাগ বল্লরী'** কাব্যেও শ্রীনিবাসের কথা আছে। নরহরি চক্রবর্তী, নরোত্তম আচার্যের জীবনী নিয়ে **'নরোত্তম বিলাস'** রচনা করেন। তার অপর কাব্য **'ভক্তিরত্নাকর'**-এ একাধারে শ্রীনিবাস, নরোত্তম আচার্য ও শ্যামানন্দের জীবনী স্থান পেয়েছে। ১৭ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ বংশীবাদনের জীবনীকাব্য 'বংশীবিলাশ' রচনা করেন **রাজবল্লভ**। এগুলো ছাড়া ১৮ শতকে আরো কয়েকখানি চরিতকাব্য রচিত হয়। 'অকিঞ্চিৎকর হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ব্যতিক্রম ছাড়া চরিতকাব্যের সাহিত্যমূল্য কম কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম ও সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং বাংলার সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে সাধারণভাবে জানার জন্য এগুলি **আকরগ্রন্থ** হিসেবে বিবেচিত হয়। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও দেবদেবীর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভারাক্রান্ত মধ্যযুগের সাহিত্যাঙ্গনে মানুষ, মানুষের কথা লিখেছে। এতে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে।'[২৬]

প্রণয়-পাঁচালি বা পদাবলি

১৬ শতক থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত ৩০০ বছর ধরে বৈষ্ণব পদ রচিত হয়েছে। 'গীতোপযোগী ও ভণিতাযুক্ত ছন্দেবদ্ধ রচনা 'পদ' নামে অভিহিত। প্রেমের একেকটি ভাবকে অবলম্বন করে পদগুলি রচিত। প্রতিটি পদের শীর্ষে রাগ-তালের উল্লেখ আছে।'[২৭] চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদের ভাব ও রসের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাৎসল্য ও সখ্য রসের নতুন পদাবলি। বন্দনা, প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক সাধনাযুক্ত পদগুলোও নতুন মাত্রা যোগ করে। এ যুগের কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক পদে ঐশী মহিমা ও আধ্যাত্মিকতার রূপক আরোপ করেন। তাদের কাছে বৈষ্ণব কবিতা ছিল বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য।

এ পর্বে কতজন কবি, কী পরিমাণ পদ-রচনা করেছেন, তা সঠিকভাবে বলা দুষ্কর। দু'-চারজন ছাড়া অন্যান্য কবির রচনার পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি; সম্ভবত তারাও লিপিবদ্ধ করেননি। কীর্তন গায়কদের মুখে মুখে পদগুলো প্রচারিত হতো। ১৮ শতকের গোড়া থেকে কিছু পদ সংকলন পাওয়া যায়, যেমন– বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ' ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' (১৭০৫), রাধারমণ ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র', বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' (১৭৬০), নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' ইত্যাদি 'পদকল্পতরু'তে প্রায় ১৫০ কবির ৩০০০ বৈষ্ণবপদ সংকলিত হয়েছে। 'এতে পদগুলো বৈষ্ণব রসতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, দৌত্য, অভিসার, সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রেমবৈচিত্র্য, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি ক্রমে বিন্যস্ত।'[২৮] আবার নায়িকার অবস্থাভেদেও মানিনী, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা ইত্যাদি প্রকার বিভাজন আছে। ১৯ শতকের শেষ দিকে দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৫) গ্রন্থে ১৬৪ জন পদকর্তার নাম এবং ৪৫৪৮টি পদসংখ্যার উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে নতুন-পুরাতন কবির আরও অনেক পদ পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে বৈষ্ণব

পদের সংখ্যা ৭-৮ হাজার। এগুলোর মধ্যে মুসলমান কবির রচিত পদও রয়েছে। আফজল, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তজা, আলিরজা প্রমুখ মুসলমান কবি চৈতন্যলীলা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, ভজন, রাগানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ক পদ এমনভাবে রচনা করেছেন যে, বৈষ্ণব কবিকৃত পদাবলি থেকে সেগুলোকে পৃথক করা যায় না। মুসলমান কবিরা সম্ভবত সুফিতত্ত্বের আলোকে শ্রীচৈতন্যকে পীর-গুরু এবং রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীকরূপে দেখেছিলেন।

১৬ শতকে পদকর্তা হিসেবে মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস; ১৭ শতকে কবিরঞ্জন ছোট বিদ্যাপতি) কবি শেখর রাধাবল্লভ দাস, ঘনশ্যাম দাস, রামগোপাল দাস, ১৮ শতকে বৈষ্ণব দাস, চন্দ্রশেখর , রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী, যদুনন্দন প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাদের মধ্যে আবার জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জন, যদুনন্দন প্রমুখ শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

নানা ভাবের পদ রচনা করেও যেমন বিদ্যাপতি বিরহের পদ ও চণ্ডীদাস প্রেম-মিলনের পদ রচনায় অধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তেমনি জ্ঞানদাস অনুরাগের এবং গোবিন্দ দাস অভিসারের পদ রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাদের শিল্পগুণসম্পন্ন পদগুলো ধর্মের মোড়ক ভেদ করে সর্বজনীন সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বর্ণনা করতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা মর্ত্যের নরনারীর আবেগ-অনুভূতিকেও স্পর্শ করেছেন। তাদের ভাব এবং ভাষার কুশলতায় বৈষ্ণব কবিতার এক অর্থ– অপ্রাকৃতলোকে আধ্যাত্মিকতার দিকে গেছে। অপর অর্থ– মর্ত্যের মানব-মানবীর সুখ-দুঃখপূর্ণ চিরন্তন প্রেমের দিকে গিয়েছে। সমালোচকদের মতে, কিছু কিছু পদ ভাব, রস ও শিল্পগুণে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে সহজেই স্থান করে নিতে পারে। নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাসের পদাবলি এরূপ চিরায়ত কাব্যসৌন্দর্য ও মর্যাদার অধিকারী।

বিষয় ভিত্তিতে বৈষ্ণব পদগুলো ৪ ভাগে বিভক্ত– গৌরলীলা, ভজন, রাধাকৃষ্ণলীলা ও রাগাত্মিকা। ১ম শ্রেণির পদে গৌরলীলা ও চৈতন্যলীলার বর্ণনা আছে। ২য় শ্রেণির পদে গুরু-মহাজনের প্রতি বন্দনা-প্রার্থনা করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির পদে ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এ ধারার পদ রচনায় কবিরা সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন। আর এরূপ পদের সংখ্যাও সর্বাধিক। তত্ত্বভিত্তিক রাগাত্মিকা পদগুলোতে গুহ্য সাধনার কথা আছে। ফলে পদগুলো সরলতা হারিয়ে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সময়ের বিচারে ১৬ শতক বৈষ্ণবপদ রচনার শ্রেষ্ঠ সময়, ১৭ শতকে এর বিকাশ সাধিত হয়, ১৮ শতকে অবনতি ও সমাপ্তি ঘটে। বৈষ্ণব সাহিত্যের অপরাপর রচনা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। বস্তুত বৈষ্ণব আন্দোলনের উত্থান-পতনের সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যও সম্পৃক্ত।

মধ্যযুগে কৃষ্ণকথা, রাধাকৃষ্ণ প্রেম, চৈতন্য লীলা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি অবলম্বনে যে বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মূল প্রেরণা ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ধর্মবোধ। এসব বিচিত্র বিষয় রচনার অঙ্গীভূত হওয়ায় বাংলা ভাষাচর্চা ও প্রকাশ ক্ষমতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। কবিরা পদাবলির মাধ্যমে মানবমনের অতি সূক্ষ্মভাব, ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র ঘটনাপঞ্জি, শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করায় বাংলা ভাষা নানা মাত্রিকতায় বিকাশ লাভ করে। 'ফলে বৈষ্ণব পদাবলি ১টি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয় হলেও সাহিত্যগুণে কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বশ্রেণির পাঠক-গবেষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতার পাশাপাশি বাংলা ভাষার উন্নতি ও উৎকর্ষের কথাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যায়।'[২৯]

রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদ সেন আনুমানিক (১৭২০-১৭৮১) বাংলা ভক্তিগীতির, বিশেষত শ্যামাসংগীতের শ্রেষ্ঠ রূপকার, সাধক, কবি ও গায়ক। তিনি জন্মেছেন ২৪ পরগনা জেলার কুমারহট্ট গ্রামে। পিতা রামরাম সেনের ছিল আয়ুর্বেদিক ওষুধের ব্যবসা এবং তার পিতাও কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার পিতা তাকে ব্যবসা পরিচালনা এবং সাহিত্য-সংগীতে তার ব্যুৎপত্তির কথা চিন্তা করে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করেন। এভাবে রামপ্রসাদ ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। 'ফলে তার সাহিত্য ও সংগীত চর্চার পথ প্রসারিত হয়।'[৩০]

পিতার মৃত্যুর পর জীবিকা নির্বাহের জন্য কলকাতার এক জমিদারের কাচারিতে চাকরি পান। জমিদার রামপ্রসাদের ভক্তিভাব ও অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে প্রতিভার বিকাশ-ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাকে ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করে নিজগ্রাম কুমারহট্টে পাঠিয়ে দেন। জমিদার তাকে শক্তি সাধনা ও সংগীত রচনায় মনোনিবেশের পরামর্শ দেন। এরপর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে এসে, নিজের গানে নিজেই সুর দিয়ে মধুর কণ্ঠে গাইতেন। তখন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদের কবিত্ব ও খ্যাতির কথা শুনে তাকে তার রাজসভায় যোগদানের আহ্বান জানান। ভারতচন্দ্র তখন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। কিন্তু বিষয়বিমুখ রামপ্রসাদ রাজসভায় যোগদানে অস্বীকৃতি জানালে রাজা 'তার ভরণপোষণের জন্য ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন এবং তাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন।'[৩১]

সেকালের বৈষ্ণব দর্শনকেন্দ্রিক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক কীর্তনের পাশাপাশি রামপ্রসাদ, শাক্তপদাবিল তথা– শ্যামাসংগীত রচনার মধ্য দিয়ে মাতৃরূপে শক্তি সাধনার এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। তিনি ভক্তিভাব, রাগ এবং বাউল সুরের মিশ্রণে এক ভিন্ন সুরের সৃষ্টি করেন, 'যা বাংলা সংগীত জগতে 'রামপ্রসাদীসুর' নামে পরিচিত।'[৩২] এই সুর পরবর্তীকালে সকল সংগীতকারকেই কমবেশি প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথও এই সুরে অনেক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন। রামপ্রসাদের উদ্ভাবিত সুরেকালি বা শ্যামাকে নিয়ে রচিত অসংখ্য গান 'শ্যামাসংগীত' নামে পরিচিত। এই গানের রচয়িতা হিসেবে বাংলা গানের জগতে তিনি অমর হয়ে আছেন। তার গানের ভাষা সহজ কিন্তু ভাবগভীর আবেগমণ্ডিত। তিনি তার গানে প্রচলিত প্রাচীন সুরের পাশাপাশি রাগসুরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন।

বাস্তব জীবনের কর্মযোগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার এক অপূর্ব মিলনচিত্র রামপ্রসাদের সংগীতের পদে পদে অঙ্কিত। তিনি সংসারের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট-বাস্তবতার মধ্যে অন্তরে বৈরাগ্য নিয়েও গৃহত্যাগী হননি বরং তাকে গৌরবের মনে করে মায়ের উদ্দেশ্যে গান বেঁধেছেন–

'আমি কি দুঃখেরে ডরাই।'

রামপ্রসাদের রচিত অতুলনীয় অসংখ্য গানগুলোর বেশির ভাগই হারিয়ে গিয়েছে। তার জনপ্রিয় কয়েকটি গান হলো–

'মনরে কৃষিকাজ জানো না', 'ডুব দেরে মন কালি বলে', 'মা আমায় ঘুরাবি কত' ইত্যাদি। এগুলোর আবেদন চিরন্তন।

তিনি 'আগমনী গান' ধারারও প্রবর্তক। দুর্গাপূজায় দেবী দুর্গার পুত্রকন্যাসহ কৈলাস থেকে মর্ত্যে আগমনের কাহিনিকে কেন্দ্র করে এ গানগুলো রচিত। দুর্গা গৃহস্থ ঘরের কন্যার মতো স্বামীর ঘর থেকে পিতার ঘরে আগমন করেন। এ ব্যাপারে মা মেনকার যে উদ্বেগ, তা-ও গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'এছাড়াও রামপ্রসাদ কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, শিবকীর্তন নামে বিভিন্ন জনপ্রিয় পালা এবং 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন।'[৩৩]

শোনা যায়, কালীপূজা শেষে মায়ের বিগ্রহ সঙ্গে নিয়ে তিনি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জনও দেন 'তিলেক দাঁড়া ওরে শমন' গানটি গাইতে গাইতে।

টপ্পাগান

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকগীতি টপ্পাগানের প্রচলন শুরু হয়। তবে টপ্পা আফগানিস্তান থেকে এসেছে বলেও জনশ্রুতি আছে। প্রধানত উটের গাড়িচালকের মুখেই টপ্পাগান বেশি শোনা যেত। শোরী মিয়া (১৭৪২-১৭৯২) নামে একজন সংগীতজ্ঞ টপ্পাগানগুলোকে সাংগীতিক আদর্শে সাজিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ১টি গায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) বাংলা টপ্পা রচনা করেন। এখানেই ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের ধারার সঙ্গে বাংলা রাগসংগীত চর্চা শুরু হয়। পরবর্তীকালে টপ্পাকার কালীমীর্জা (১৭৫০-১৮২০), বাংলা ভাষায় ধ্রুপদরীতির প্রবর্তক রামশংকর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) এবং বাংলা ভাষায় খেয়াল রচয়িতা রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬)– বাংলা গানকে আরও সমৃদ্ধ করে হিন্দুস্থানি রাগসংগীতের ধারার সঙ্গে যুক্ত করেন। A. F. Strangways তার 'Music of India' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'পাঞ্জাবের উটচালকের লোকগান থেকে টপ্পার উৎপত্তি'।[৩৪] কিন্তু টপ্পার উৎপত্তি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে।

বাংলায় টপ্পার আদিপুরুষ কালী মীর্জা ১৭৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সংগীত শিক্ষা শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি হুগলীতে এসে বসবাস শুরু করেন এবং বাংলা টপ্পা গানের চর্চা শুরু করেন। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন এবং নিধুবাবুর অনেক আগে থেকে বাংলা-টপ্পার প্রচলন শুরু করেন। নিধুবাবু বাংলা টপ্পা শুরু করেন ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে।

তবে বাংলা টপ্পার জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল রামনিধি গুপ্ত তথা নিধুবাবুর সূত্রে। তিনি চাকরির সুবাদে বিহারের ছাপরা জেলার কালেক্টর অফিসে কেরানি হিসেবে কাজ শুরু করেন। ছাপরাতে তিনি এক ওস্তাদের কাছে তালিম নিতে

শুরু করেন। এই সময় তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন ধরনের গানের সাথে পরিচিত হন এবং বিভিন্ন সংগীতশিল্পীর কাছে রাগসংগীত শেখেন। তখন লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে শোরী মিয়ার টপ্পা জনপ্রিয় হয়েছিল। নিধুবাবু তার টপ্পার সান্নিধ্যেও শেখেন। এরপর তিনি ছাপরা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি শোভা বাজারে ১টি আটচালায় প্রতি রাতে সংগীতের আসর বসাতেন। এখানেই নিধুবাবু আনুষ্ঠানিকভাবে টপ্পার সূচনা করেন। পরে এ আসরের আয়োজন বাগবাজারের রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এসব আসরের মধ্য দিয়ে রামনিধি গুপ্তর গান হয়ে যায় 'নিধুবাবুর গান বা নিধুবাবুর টপ্পা।'[৩৫]

প্রধানত বিরহকে বিষয়বস্তু করে রচিত বলে টপ্পার উপযোগী বিশেষ কিছু রাগও আছে। যেমন– ভৈরবি, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, পিলু, বারোয়া ইত্যাদি। নিধুবাবু রচিত গানে বিরহের প্রকাশ হতো মার্জিত ও পরিশীলিতভাবে। এর উদাহরণ– 'বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা, প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না, হইয়ে বহিয়ে গেছে প্রেম ফুরায়েছে, রহিল কেবলি প্রেমেরি নিশানা'।
কিছু টপ্পার উদাহরণ–

১. নানান দেশের নানান ভাষা
২. পিরীতি কে জানে সখী।
৩. আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে
৪. সখি! কোথায় পাব তারে, যারে প্রাণ সঁপিলেম
৫. যাও! তারে কহিও সখি, আমারে কি ভুলিলে
৬. আমি আর পারি না সাধিতে এমন করিয়ে
৮. ভ্রমরারে! কি মনে করি আইলে প্রাণ নলিনী ভবনে।
৯. ঋতুরাজ! নাহি লাজ, একি রাজনীতি
১০. কি চিত্র বিচিত্র কুসুম ঋতুর চরিত্র গুণ
১১. মধুর বসন্ত ঋতু! হে কান্ত! যাবে কেমনে
১২. এ কি তোমার মানের সময়? সমুখে বসন্ত
১৩. শৈলেন্দ্র তনয়া শিবে, সদাশিবে প্রদাভবে
১৪. অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব

লালন (১৭৭২-১৮৯০)

বাউল সাধনার প্রধান গুরু, বাউলগানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা এবং গায়ক হলেন ফকির লালন। ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক তার জন্ম। তবে জন্মস্থান এবং তিনি হিন্দু না মুসলমান সম্প্রদায়ের– এ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। কথিত আছে ফকির লালন যৌবনকালে একবার তীর্থভ্রমণে বের হয়ে পথিমধ্যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। তখন সঙ্গীরা তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। এমতাবস্থায় সিরাজসাঁই নামে একজন মুসলমান ফকির তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করে তোলেন। পরে লালন তার নিকট বাউল ধর্মে দীক্ষিত হন এবং ছেউড়িয়াতে একটি আখড়া নির্মাণ করে স্ত্রী ও শিষ্যসহ বসবাস করেন। তার কোনো সন্তানাদি ছিল না, তার শিষ্যের সংখ্যা ছিল অনেক। লালনের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তিনি নিজ সাধনাবলে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তার রচিত গানে সেই জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় তিনি প্রায় ২,০০০ গান রচনা করেন। তার গান মরমি-ব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। সহজ, সরল শব্দময় অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী। এসব গানে মানবজীবনের আদর্শ, মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। লালন কোনো জাতিভেদ মানতেন না। তাই তিনি গেয়েছেন– **'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/ লালন কয় জাতির কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।'**[৩৬] এরূপ অসাম্প্রদায়িক, ভেদবুদ্ধিমুক্ত এক সর্বজনীন ভাবরসে সিক্ত বলে লালনের গান বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমান জনপ্রিয়। তার 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'বাড়ির কাছে আরশী নগর', 'আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে', 'জাত গেল জাত গেল বলে', 'সময় গেলে সাধন হবে না' ইত্যাদি গান বাউলতত্ত্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

লালনের গান একসময় এত জনপ্রিয় ছিল যে, তা সাধারণ মানুষ ও নৌকার মাঝি-মাল্লাদের মুখে মুখে শোনা যেত। এমনকি বর্তমানেও সব শ্রেণির মানুষের কাছে লালনগীতির কদর বেড়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতেও এসব গান নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। বহু তীর্থভ্রমণ এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গলাভের পর ছেউড়িয়ার আখড়ায় বসে লালন আজীবন সাধনা ও সংগীতচর্চা করেন। তার লেখা গানের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। সম্ভবত পরবর্তীকালে শিষ্যদের কেউ কেউ সেগুলো সংগ্রহ ও সংকলিত করেন।

কুষ্টিয়ায় কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-৯৬) এবং মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), ফকির লালন ও তার গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। হরিনাথ তার অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ছেউড়িয়া থেকে ৬ মাইল দূরে শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ, ফকির লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো থেকে ২০টি গান তিনি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'মানবধর্ম প্রবন্ধ (Religion of Man) বিষয়ক প্রবন্ধ ও বক্তৃতায়ও লালনের গানের উল্লেখ করেন।'[৩৭] ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক (১৭ অক্টোবর, ১৮৯০) ছেউড়িয়ায় লালন পরলোকগমন করেন। প্রতিবছর দোল পূর্ণিমা (মার্চ- এপ্রিল) ও মৃত্যুবার্ষিকীতে ভক্তরা তার মাজারে সমবেত হয়ে তিন দিনব্যাপী সাধুসেবা ও সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রাধারমণ দত্ত (১৮৩৩-১৯১৫)

'রাধারমণ দত্ত বা রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ হলেন একজন বাংলা সাহিত্যিক, সাধক কবি, বৈষ্ণব বাউল, ধামালি নৃত্যের প্রবর্তক'।[৩৮] সংগীতানুরাগীদের কাছে তিনি রাধারমণ বলেই সমধিক পরিচিত। তিনি বাংলা লোকসংগীতের পুরোধা লোককবি। তার রচিত ধামাইল গান সিলেট ও ভারতের বাঙালিদের কাছে পরম আদরের ধন। রাধারমণ নিজের মেধা ও দর্শনকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। কৃষ্ণ বিরহের আকুতি আর না পাওয়ার ব্যথা কিংবা পেয়েও হারানোর কষ্ট তাকে সাধকে পরিণত করেছে। তিনি দেহতত্ত্ব, ভক্তিমূলক, অনুরাগ, প্রেম, ভজন, ধামাইলসহ নানা ধরনের কয়েক হাজার গান রচনা করেছেন।

তার পূর্বপুরুষ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও ধনী ছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তারা দৈন্যদশায় পতিত হন। কিন্তু রাধারমণ দত্তের পিতা, রাধামাধব দত্ত অন্যের দ্বারস্থ না হয়ে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি জয়দেবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। 'এছাড়া 'ভ্রমর গীতিকা', 'ভারত সাবিত্রী', 'সূর্যব্রত পাঁচালি', 'পদ্ম-পুরাণ' ও 'কৃষ্ণলীলা' গীতিকাব্য তার উল্লেখযোগ্য' [৩৯]রচনা।

কবি রাধারমণের পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এবং উপাসনার প্রধান অবলম্বন হিসেবে সংগীতের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল শৈশব থেকেই। তার পিতার সংগীত ও সাহিত্য সাধন তাকে প্রভাবিত করেছিল।

তিনি চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ সেন শিবানন্দের বংশীয় নন্দকুমার সেন অধিকারীর কন্যা গুণময়ী দেবীকে বিয়ে করেন। পিতার আদর্শে কালক্রমে তিনি একজন স্বভাবকবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। হাজরা হাজার বাউল গান, কয়েকশ' ধামাইল গান রচনা করেন। ধামাইল গান সমবেত নারীকণ্ঠে বিয়ের অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। সিলেট, কাছাড়, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে একসময় এর প্রচলন ছিল খুব বেশি। রাধারমণ একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী ছিলেন। জানা যায়, মরমি কবি হাছন রাজার সঙ্গে তার অন্তরের মিল ছিল খুব। তাদের সঙ্গে পত্রালাপ হতো 'কবিতার মাধ্যমে'।

রাধারমণ একজন কৃষ্ণপ্রেমিক ছিলেন; কৃষ্ণ বিরহের অসংখ্য গান তিনি লিখেছেন, তার দু'টি বিখ্যাত গান–

১. কারে দেখাবো মনের দুঃখ গো আমি বুক চিরিয়া।
অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে...
২. ভ্রমর কইও গিয়া।

তিনি ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। শাস্ত্রীয় পুস্তকাদি চর্চা ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে এসে তিনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা মত ও পথের সঙ্গে পরিচিত হন।

কবির ৪ ছেলে ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় বিপিন বিহারী দত্ত ছাড়া ৩ পুত্র এবং স্ত্রী গুণময়ী দেবী অকালে মারা যান। তাদের হারিয়ে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে ৫০ বছর বয়সে কবি চলে যান মৌলভীবাজার জেলাধীন ঢেউপাশা গ্রামে সাধক রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কাছে। তিনি তার শিষ্যত্ব লাভ করেন। শুরু হয় বৈরাগ্য জীবন; আরম্ভ করেন সাধনা। গৃহত্যাগ করে জগন্নাথপুর উপজেলার নলুয়ার হাওরের পাশে একটি আশ্রম তৈরি করেন। এখানে চলে তার সাধন-ভজন। কবি গেয়েছেন–

'শ্যামের বাঁশিরে ঘরের বাহির করলে আমারে
যে যন্ত্রণা বনে যাওয়া গৃহে থাকা নালয় মনে।'[৪০]

নলুয়ার হাওরের আশ্রমে দিবারাত্র সাধনা ও ইস্ট নামে মগ্ন এবং অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি গান রচনা করে গেয়ে যেতেন। ভক্তরা শুনে শুনে তা স্মৃতিতে ধরে রাখত এবং পরে তা লিখে নিত।

বিভিন্ন সংগ্রাহকদের মতে, তার গানের সংখ্যা ৩০০০-এর ওপরে। তার কিছু গানের বই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য প্রথমে রাধারমণ দত্তের গান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে 'বাউল কবি রাধারমণ' নামে ৮৯৮টি গান নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রাধারমণের গান মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন, চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ, সম্পাদক সুমন কুমার দাসসহ আরো অনেকেই প্রকাশ করেছেন। তার গানের সংগ্রাহকও অনেক। গুরুসদয় দত্ত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, কেতকী রঞ্জনগুণ, মুহাম্মদ আবদুল হাই, হুছন আলী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, নরেশ চন্দ্র পাল, যামিনী কান্ত শর্মা, মুহম্মদ আসদ্দর আলী, মাহমুদা খাতুন, ড. বিজনবিহারী পুরকায়স্ত, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, মো. আজিজুল হক চুন্নু, জাহানারা খাতুন, নরেন্দ্র কুমার দত্ত চৌধুরী, অধ্যাপক সুধীর চন্দ্র পাল, অধ্যাপক দেওয়ান মো. আজরফ, নন্দলাল শর্মা, শামসুল করিম কয়েস, শুভেন্দু ইমামসহ আরো অনেক বিদগ্ধজন রাধারমণ দত্তের গান সংগ্রহ করেছেন।[৪১]

তার কয়েকটি জনপ্রিয় গান–

১. প্রাণ সখীরে ওই শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে
২. শ্যামল বরণ রূপে মন নিল হরিয়
কুক্ষণে গো গিয়াছিলাম জলের লাগিয়া
কারো নিষেধ না মানিয়া সখি গো ॥
৩. মান ভাঙ রাই কমলিনী চাও গো নয়ন তুলিয়া
৪. শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধু রে
নিরলে তোমারে পাইলাম না
আমার মনে যত দুঃখ
আমি খুলিয়া কইলাম না বন্ধুরে।
৫. আমারে আসিবার কথা কইয়া
মান করে রাই
রইয়াছ ঘুমাইয়া।
৬. আমার বন্ধু দয়াময়
তোমারে দেখিবার মনে লয়
তোমারে না দেখলে রাধার
জীবন কেমনে রয় বন্ধুরে।

মুকুন্দদাস (২২ ফেব্রু. ১৮৮৭-১৮ মে, ১৯৩৪)

মুকুন্দদাসকে বাঙালিরা 'চারণ কবি' বলে অভিহিত করেন। তিনি স্বদেশি ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু স্বদেশি বিপ্লবাত্মক গান ও নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই 'স্বদেশী যাত্রার'[৪২] প্রবর্তন করেন।

তিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার বানরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা গুরুদয়াল দে তার নাম রেখেছিলেন যজ্ঞেশ্বর দে এবং ডাক নাম ছিল যজ্ঞা। তাঁর জন্মের পর বানরী গ্রাম পদ্মা নদীতে তলিয়ে গেলে তারা সপরিবারে গুরুদয়ালের চাকরিস্থল বরিশাল শহরে চলে আসেন। বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে তার শিক্ষা শুরু হয়। বরিশালে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রামানন্দ অবধূত যজ্ঞেশ্বরের কণ্ঠে হরি-সংকীর্তন ও শ্যামাসংগীত শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে দীক্ষা দিয়ে তার নাম রাখেন মুকুন্দ দাস। '১৯ বছর বয়সের মধ্যে মুকুন্দ দাস 'সাধন-সংগীত' নামে ১০০ খানি গানসমৃদ্ধ একখানি বই রচনা করেন।'[৪৩] তিনি যাত্রাগানে সারা বরিশাল মাতিয়ে রাখতেন। তার লেখা বরিশাল 'হিতৈষী' পত্রিকায় ছাপা হতো।

বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের সংস্পর্শে মুকুন্দ দাস রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। তার আগ্রহে মুকুন্দদাস **'মাতৃপূজা'** নামে একখানি নাটক রচনা করেন। দুর্গাপূজা মহাসপ্তমীতে নবগ্রামে এই নাটকের ১ম প্রকাশ্য যাত্রাভিনয় হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মুকুন্দদাস একের পর এক গান, কবিতা ও নাটক রচনা করে বাঙালির জাতীয় জীবনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। এরপর ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহের অপরাধে তাকে গ্রেফতার করে ও বিচারে তাকে দিল্লি জেলে আড়াই বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

'মাতৃপূজা নাটকটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে।'[৪৪] কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে 'বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ সম্রাট মুকুন্দ' উপাধিতে ও সন্তান আখ্যায় ভূষিত করেন। মুকুন্দদাস কারাবাসে থাকাকলীন তার স্ত্রী সুভাষিণী দেবীর মৃত্যু ঘটে। মুক্তিলাভের পর চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসু তাকে সান্ত্বনা দেন এবং নতুন করে শুরু করতে বলেন। এতে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে পুনরায় রচনায় মনোনিবেশ করেন।

মুকুন্দদাসের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাতৃপূজা, সমাজ আদর্শ, পল্লীসেবা, সাথী, কর্মক্ষেত্র, ব্রহ্মচারিণী ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে, আদিপর্বের চর্যাগীতি থেকে ধারাবাহিকভাবে গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলগীতি, জীবনীকাব্য, প্রণয়-পাঁচালি, রামপ্রসাদের গান, নিধুবাবু, লালন, রাধারমণ, মুকুন্দদাসের সংগীতের মধ্য দিয়ে বাংলা গান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, পূজা-পার্বণের গান, পাঁচালি, ঝুমুর, গম্ভীরা ইত্যাদি গ্রামীণ সংগীতের বিপরীতে গড়ে ওঠা ধনী-জমিদারের চিত্তবিনোদন ও ভোগ-বিলাসিতার উপকরণস্বরূপ জলসাঘরে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, আখরাই, হাফ এবং নাচ-গানের আসর হতো। 'এভাবে আঠারো শতক পেরিয়ে উনিশ শতকে এসে বাংলা গানে অনেকটা অশ্লীলতা ও কুরুচির প্রাবল্য দেখা দেয়ায় এদের সংস্কারের চিন্তা, চেতনা ও অঙ্গীকারের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সংস্কারের হাল ধরেন রাজা রামমোহন রায় ও তার শিষ্যকূল।'[৪৫]

বাংলা সংগীতের এ দুরবস্থা নিরসনের নিরিখে বক্ষ্যসংগীত (সুস্থ, শ্লীল, রুচিসম্পন্ন সংগীত) নামের সংস্কারমূলক সংগীতের আবির্ভাব ঘটে। 'পরবর্তী সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুভট্ট, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেনের রচনায় সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা পায়'[৪৬] বাংলা গান।

তথ্যসূত্র

১. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,২০০৯। পৃ. ১৭৬।
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬।
৩, ৪, ৫, ৬, ৭ নং টীকা পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।
৯. bn.m.wikipedia (চর্যাপদ, উইকিপিডিয়া)।
১০. পূর্বোক্ত।
১১. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,২০০৯। পৃ.১১।
১২. bn.m.wikipedia (চর্যাপদ, উইকিপিডিয়া)।
১৩. চর্যাগীতি-পদাবলি, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, 'মূলপাঠ' ও 'টিপ্পনী অংশ দ্র.
১৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৪১০, পৃ.৬০৮।
১৫. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, পৃ. ২৩।
১৬. অধ্যাপক সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃ.৩৫৫।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৫।
১৮, ১৯, ২০ নং টীকা– bn.m.wikipedia (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, উইকিপিডিয়া)।
২১, ২২, ২৩ নং টীকা– মিটন আলম, বাঁধ ভাঙার আওয়াজ, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৬।
২৪, ২৫, ২৬ নং টীকা–bn.banglapedia.org/ind (বৈষ্ণব সাহিত্য, বাংলাপিডিয়া)।
২৭, ২৮,২৯ নং টীকা bn.banglapedia.org/ind (বৈষ্ণব সাহিত্য, বাংলাপিডিয়া), ওয়াকিল আহমদ। এবং

গ্রন্থপঞ্জি

ক. গোপাল হালদার/ বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৩।
খ. সুকুমার সেন, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৫।
গ. সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ১৯৮৮।
৩০,৩১, ৩২,৩৩ নং টীকা bn.banglapedia.org/ind (রামপ্রসাদ সেন, বাংলাপিডিয়া), খান মো. সাঈদ। এবং

গ্রন্থপঞ্জি

ক. রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলি, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।
খ. সুকুমার রায়, বাংলা সংগীতের রূপ, এ মুখার্জি কোং লি, কলকাতা, ১৯৬৯।
৩৪, ৩৫ নং টীকা bn.m.wikipedia (টপ্পাগান, উইকিপিডিয়া)।
৩৬, ৩৭ নং টীকা bn.banglapedia.org/ind (লালন শাহ বাংলাপিডিয়া), আনোয়ারুল করীম।
৩৮, ৩৯, ৪০ নং টীকা bn.m.wikipedia (রাধারমণ দত্ত, উইকিপিডিয়া)।
৪১. রাধারমণ দত্তের গান সংগ্রাহক তালিকা এবং বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত রাধারমণ গীতিমালা।
৪২, ৪৩, ৪৪ নং টীকা bn.banglapedia.org/w/i (মুকুন্দদাস, উইকিপিডিয়া)।
৪৫. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,২০০৯। পৃ. ২।
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২, ৩।

লেখক: গবেষক

এখনকার সময়ে সাংবাদিকরা আমাদের চেয়ে অনেক সাহসী রিপোর্ট করছে

রাহাত খান

রাহাত খান। বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক। ১৯৪০ সালে কিশোরগঞ্জে এই কথাশিল্পীর জন্ম। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। প্রায় আট বছর শিক্ষকতায় জড়িয়ে ছিলেন তিনি। এ পেশায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন এই কথাশিল্পী। ১৯৬৯ সালে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে সাংবাদিকতায় যোগ দেন। সে সময়কার প্রভাবশালী 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। দীর্ঘদিন দৈনিক ইত্তেফাকে সুনামের সঙ্গে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিরীক্ষা'র পাঠকদের জন্য এই গুণী সাংবাদিক-কথাশিল্পীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন **মো. কবির হোসেন কাব্য**।

আমি ছোটবেলায় যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, সেটা ছিল আউট বই। আমাদের সিলেবাসের বাইরে যেসব বই ছিল যেমন- রহস্য গল্প, ডিটেকটিভ গল্প। তারপর আরো ভালো ভালো বই পড়তে শুরু করি

প্রশ্ন : আপনার শৈশব ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বলুন?

রাহাত খান : ১৯৪০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জের পাড়াইল থানার জাওয়ার গ্রামে আমার জন্ম। অবশ্য জন্মসালটি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন আমার একজন স্কুলশিক্ষক। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নেয়ার সময় জন্মসালটি শিক্ষক দিয়েছিলেন। তবে আমার বাবা জন্মের তারিখটি ১৯শে ডিসেম্বর লিখে রেখেছিলেন। জন্মসালটি ১৯৩৯ বা ১৯৪১ হবে। শৈশব বেড়ে ওঠা জাওয়ার গ্রামে। মাইনর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। ১৯৫৫ সালে মেট্রিকুলেশন পাস করি মৃত্যুঞ্জয় স্কুল থেকে। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে আইএ পাস করি। আমরা দুই বন্ধু ছিলাম খুব ঘনিষ্ঠ। ওর নাম আতাউল হক। আমরা দুজন অর্থনীতিতে ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সময় একটা ঘটনা ঘটল। আতাউল হকের বড়ভাই তখন ঢাকা

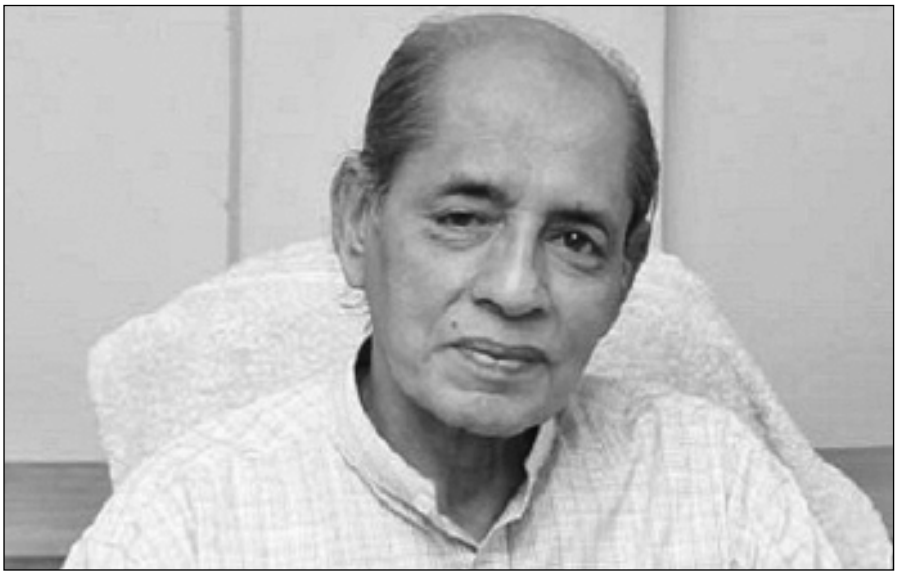

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। বন্ধুর বাবা ভর্তির কথা শুনে বললেন, আমি দুটো ছেলেকে একসঙ্গে ঢাকায় পড়াতে পারব না। পরে আমরা ফিরে গেলাম ময়মনসিংহে। দুজনে বিএ ক্লাসে ভর্তি হলাম আনন্দমোহন কলেজে। বিএ পাস করলাম দুজনে। মাস্টার্সের জন্য আবার দুই বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম। আমি বাঙলা সাহিত্য এবং সে দর্শনে ভর্তি হলো। ১৯৬১ সালে দুজনেই মাস্টার্স পাস করলাম।

আমি ছোটবেলায় যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, সেটা ছিল আউট বই। আমাদের সিলেবাসের বাইরে যেসব বই ছিল যেমন- রহস্য গল্প, ডিটেকটিভ গল্প। তারপর আরো ভালো ভালো বই পড়তে শুরু করি। তখন একটা বিষয় ছিল, প্রত্যেক জেলায় প্রচুর লাইব্রেরি ছিল। পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি এবং পাশে একটা করে ব্যায়ামাগার থাকত। আমার মনে পড়ে, ময়মনসিংহ শহরের সবকটি লাইব্রেরিতে বাংলা বই পড়েছি আমি। বইপড়া ছাড়া ফুটবল খেলতাম। তেমন উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় ছিলাম না। আমার মূল ব্রত ছিল বইপড়া। দুই-একটি লেখা তখন লিখেছিলাম যদিও, সেগুলো আলোর মুখ দেখেনি। আমি বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছি মানবতাবোধে। আমি সবসময় মানুষের পক্ষে ছিলাম। স্বাধীনতার পক্ষে, দারিদ্র্যের বিপক্ষে। একদল বিত্তশালী হচ্ছে, একদল মানুষ সম্পদহীন হয়ে পড়েছে। এগুলো মানবতাবোধের দৃষ্টিতে দেখতাম। বইপড়া, এই বইকে আমি পরে বলেছি, 'বই ছিল আমার অভিভাবক'। আমি লিখে কোনোদিন যা পাওয়া যায়, তা থেকে বঞ্চিত হয়নি। লেখাই আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। আমার পেছনে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নেই। আমার অভিভাবক ছিল লেখা। এটাই মনে হয় আমার।

প্রশ্ন: আপনার কর্মজীবনের শুরুটা বলুন?

রাহাত খান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এমএ শেষ করে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেই। প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় জামালপুর আশিক মাহমুদ কলেজে। সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর, যেখানে আমি বড় হয়েছিলাম জেলা শহর ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেই। তখন থেকে আমি নিয়মিত লেখালেখি করছি। আমার লেখা কখনো ফেরত আসেনি। আমি তখন গুরুত্ব সহকারে লিখছি, তখন ভাবলাম আমার তো কিছু করার নেই লিখে যদি আমার পরাজয়কে আড়াল করতে পারি। এখানে আমি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করি। পরে ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেই। দীর্ঘ আট বছর শিক্ষকতা পেশায় জড়িয়ে ছিলাম। তারপর জগন্নাথ কলেজের চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলাম ১৯৬৮ সালের শেষদিকে। ১৯৬৯ সালে ফেব্রুয়ারিতে সাংবাদিক হিসেবে চাকরি পেলাম আবার। গণআন্দোলনের পর তৎকালীন সরকার আবার ইত্তেফাক সংবাদপত্রকে ছেড়ে দিল। তখন আমার এক ছাত্র দেলোয়ার আসত বাসায়। একদিন আমার গিন্নি দেলোয়ারকে বলল, দেখ তো তোমার স্যারকে একটা চাকরি দেওয়া যায় কিনা? দেলোয়ার তখন সিরাজ ভাইকে বলল, 'রাহাত স্যারকে কি একটা চাকরি দেওয়া যায় ইত্তেফাকে?' অবশ্য সিরাজ ভাই আমাকে আগে থেকে চিনতেন। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সিরাজ ভাই তখন ইত্তেফাক পত্রিকা চালাতেন। আমার ছাত্র দেলোয়ার আমাকে সঙ্গে নিয়ে সিরাজ ভাইয়ের কাছে গেলেন। সিরাজ ভাই বললেন, 'ইত্তেফাকে চাকরি করবা?' উত্তরে আমি সিরাজ ভাইকে বললাম, আমাকে চাকরি দেয় কে? তখন সিরাজ ভাই বললেন, তুমি একদিন মানিক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করো। মানিক ভাই তখন ইত্তেফাকের সম্পাদক ছিলেন। একদিন আমি মানিক মিয়ার সঙ্গে দেখা করতে বেলা ১১টার দিকে তাঁর অফিসে গেলাম। তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দেখি, উনি ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। কক্ষে তখন একজন বলল স্যার, রাহাত খান স্যার এসেছেন। উনি আমার দিকে তাকালেন না, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন জগন্নাথ কলেজে কত বেতন পেতেন? উত্তরে বললাম ৫৫৫ টাকা। মানিক মিয়া বললেন, তুমি ৫০০ টাকা পাবে, আগামীকাল থেকে চাকরিতে জয়েন করো। তখন সিরাজ ভাই ছিলেন ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক। আমি সিরাজ ভাইকে সবকিছু বললাম। সিরাজ ভাই বললেন, তোমার আরেকটা কাজ করতে হবে, 'তুমি এবার আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করো।' আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তখন ইত্তেফাকের সম্পাদক বিভাগের প্রধান ছিলেন। সিরাজ ভাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কাছে গেলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, ও রাহাত খান, ইত্তেফাকে চাকরি করতে চায়। উত্তরে গাফ্ফার চৌধুরী বললেন, ওর লেখা আমি পড়েছি। ভালো হাত, ভালো লেখে। চাকরির ব্যাপারে কি কিছু লিখে দিতে হবে, না মৌখিক বললে হবে। উত্তরে আমি বললাম, মৌখিক বললেই হবে। তখন আমি বললাম, মানিক ভাইয়ের সঙ্গে যে আমার কথা হয়েছে, তা আপনাকে জানাতে এলাম। উত্তরে গাফ্ফার ভাই বললেন, ঠিক আছে আগামীকাল থেকেই কাজে এসো। আমার সাংবাদিকতা কর্মজীবনের প্রথম দিন ছিল ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। আমার প্রথম লেখা ইত্তেফাকে দুই কলামে ছাপা হয়েছিল। এভাবেই সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী আমার সাংবাদিকতায় অনেক বড় ভূমিকা রেখেছেন।

প্রশ্ন : আপনার সাংবাদিকতা জীবনের কোনো স্মরণীয় ঘটনার কথা বলবেন কি?

রাহাত খান : সাংবাদিকতায় উচ্চ ডিগ্রির জন্য জার্মানিতে যাই ১৯৭৬ সালে। আমি যে ইনস্টিটিউটে পড়তে গিয়েছিলাম, সেখানে আমার একজন গাইড ছিল। সে আমাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। একটা কমন কিচেন ছিল। কিচেনে নিয়ে গাইড দেখিয়ে দিচ্ছিল, এই ওভেনটি আপনার। আপনি এখানে এসে আপনার প্রয়োজনীয় রান্নার কাজগুলো সারবেন। হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে অপলকদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটু অবাক হলাম। আমার গাইডের নাম ছিল পিটার। পিটার আমাকে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটির নাম ছিল মারিয়া। আমি মারিয়াকে বললাম, তুমি আমাকে দেখে বিস্মিত হয়েছ কেন? মারিয়া বলল, উত্তরটা পরে বলব। দুইদিন পর কমন কিচেনে দেখা হলো মারিয়ার সঙ্গে। বলল, চা খাবেন নাকি? উত্তরে বললাম, হ্যাঁ খাব। কিচেনের কর্নারে একটি টেবিল ছিল। সেখানে বসে আমরা চা খাচ্ছি। তখন মারিয়া বলল, সেদিন আপনার দিকে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম তার কারণ, আমার সঙ্গে যার বাগদান হয়েছিল সে দেখতে হুবহু আপনার মতো। আমি বললাম, মানুষ কি হুবহু দেখতে হয়। উত্তরে মারিয়া বলল, আপনাকে তার ছবি দেখাব। এরপর আমাদের বন্ধুত্ব হলো, খুব ভালো একটা সম্পর্ক কাটছিল। কিছুদিন পর গাইড পিটার, আমি, মারিয়া এবং সতীর্থরা লিফটে করে নিচে নামছিলাম। পিটারকে আমি বলছিলাম, 'What means Mariya in Bangladesh? Mariya means killing.' সতীর্থরা হাসছে। পিটার মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'Yes, Why not. She is killing!' মারিয়া তখন আমাকে আস্তে করে চিমটি কাটল...। চলে আসার কিছুদিন আগে মারিয়াকে আর পেলাম না। কিছু না বলে চলে গেলে মারিয়া। তারপর মারিয়াকে স্মরণ করে একটি উপন্যাসও লিখেছি, 'এক প্রিয়দর্শিনী'।

প্রশ্ন : সাংবাদিকতা পেশায় অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা তফাত আছে বলে মনে করেন কি?
রাহাত খান : এখন তো অনেক বদলে গেছে প্রেক্ষাপট। বর্তমানে সাংবাদিক ইউনিয়ন কয়েক ভাগে বিভক্ত। আমাদের সময় এমনটা ছিল না। আমাদের সময় একটাই সাংবাদিক ইউনিয়ন ছিল। বর্তমানে বিভক্ত ইউনিয়নের কারণে সাংবাদিকতার নৈতিকতা কিছু নেই বললে চলে। সাংবাদিকতা কলুষিত হওয়ার কারণ বিভক্ত সাংবাদিক ইউনিয়ন। এখন সাব-এডিটরদের প্লাটফর্ম, রিপোর্টারদের আছে, প্রুফরিডারদের আছে, আছে ইন্টারন্যাশনাল সংবাদদাতাদের। এখন থাকল আর কী? ইউনিয়নের এখন আর কী কাজ? আমাদের সময় আমরা সিনিয়রদের খুব মেনে চলতাম। ওই সময় খুব আন্তরিকতা ছিল, এখন এই ব্যবহারটি ঠিক পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন: সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ে সাংবাদিক ইউনিয়ন যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কি?
রাহাত খান : তা অবশ্য কিছুটা করছে। আবার আপসও করছে। বর্তমানে সাংবাদিক ইউনিয়ন দুই পক্ষের সঙ্গেও থাকে। মালিকপক্ষের সঙ্গে আছে আবার সাংবাদিকদের সঙ্গেও আছে। তবে হ্যাঁ, সাংবাদিকদের স্বার্থ বেশি দেখে। এমন কোনো সাংবাদিক নেতা নেই যে, সাংবাদিকদের স্বার্থ ডুবিয়ে নিজের স্বার্থ দেখে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?
রাহাত খান: অবশ্যই ভালো দিকে যাচ্ছে, তবে এই ছোট ছোট পত্রিকা যেগুলো আছে ওখানে কিছু ভালো ও মন্দ দিকও আছে। ভালো দিক যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে এবং খারাপ দিক হলো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। বিজ্ঞাপনের নামে চাঁদা আদায় করছে। আমাদের সময় ছিল; কিন্তু পরিমাণে কম ছিল, এখন অনেক বেশি। এমন অনেক খবরের কাগজ আছে একটা আইডি কার্ড দেয়া হয়, বেতনের কথা বললে মালিকপক্ষ বলে আইডি দিয়েছি না, ওটা দিয়ে চলে খাও। উৎসাহ দেয়া হয়, তোমরা ব্ল্যাকমেইল করো! এটা খারাপ জিনিস। আমাদের কটা খবরের কাগজ আছে যে নিয়মিত বেতন দেয়?

প্রশ্ন: বর্তমান সময়ে সাংবাদিক সম্পর্কে আপনার মতামত?
রাহাত খান : এখনকার সময়ে সাংবাদিকরা আমাদের চেয়ে অনেক সাহসী রিপোর্ট করছে, অনেক উন্নত হচ্ছে। বর্তমানে অনলাইনে অনেক খবর পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে সাংবাদিকতা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে খেলার খবরগুলো। আগে কোনো খেলার খবর ছিল না। বর্তমানে খেলার খবর এত সুন্দর করে লেখা হয়, যা বর্তমানে সাংবাদিকতার সমৃদ্ধ অবদান। খেলার খবর সাংবাদিকতাকে উন্নতমানের দিকে নিয়ে গেছে।

প্রশ্ন: আপনি যে লেখালেখি করবেন, তা কবে থেকে অনুভব করলেন?
রাহাত খান : আমি যখন গ্রামে ছিলাম, আমাদের গ্রাম থেকে শহরের দূরত্ব ছিল ২৫ মাইল। এই ২৫ মাইল অতিক্রম করতে একটা দিন এবং রাতের খানিকটা অংশ লেগে যেত। কারণ রাস্তা নিজেকে তৈরি করে যেতে হতো। পুকুরপাড়, নদীর পাড়, জমির আইল দিয়ে যেতে হতো। কোনো রাস্তা ছিল না। তার মানে, সাহিত্যের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। সাহিত্য কাকে বলে, তা-ও জানতাম না। লেখা কেন হয়, তা-ও জানতাম না। তবে কোনো ঘটনা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে রসিদ বইয়ের পেছনের সাদা পৃষ্ঠায় লেখতাম। তখন তো কেউ আমাকে বলেনি লেখক হতে হবে বা আমিও ভাবিনি লেখক হব।

প্রশ্ন : আপনার প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্পের সংখ্যা কত? সব কি আপনার সংগ্রহে আছে?
রাহাত খান : আমার উপন্যাস ও গল্পের সংখ্যা সঠিক করে বলতে পারব না। সম্ভবত উপন্যাসের সংখ্যা ৫০। আমি খুবই অগোছাল। আর সংরক্ষণের কথা বলছেন, না তেমন নেই। অবশ্য এখন গোছানোর চেষ্টা করছি। নানাবিধ কারণে সব সংগ্রহে নেই।

প্রশ্ন: 'অবল-ধবল চাকরি' আপনার প্রথম উপন্যাস। এই যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, এটা কি আপনার চারপাশ নিয়ে দেখা নাকি কল্পনা থেকে।
রাহাত খান: না, দেখা। আমি বানিয়ে কিছু লেখার সুযোগ পাইনি।
প্রশ্ন: আপনার একটি গল্প কৃষ্ণপক্ষের নায়িকা হেনা সুলতানা। হেনা সুলতানার সঙ্গে পরিচয় হয় স্বাধীন নামে এক যুবকের। স্বাধীন একসময় জানতে পারে, হেনা সুলতানা এক রক্ষিতার মেয়ে। আশ্চর্যের বিষয়, স্বাধীন স্ত্রীর সঙ্গে হেনা সুলতানার পরিচয় করিয়ে দেয় এবং বন্ধুত্ব হয়– এটা কি হওয়া সম্ভব?
রাহাত খান: লেখক রবীন্দ্রনাথের কথা বলতেই হয়, 'যাহা রচিবে তুমি, তাহাই সত্য'। এমন তো নয় রক্ষিতার মেয়ের সঙ্গে 'ভালো' একটা মেয়ের বন্ধুত্ব হয় না। অসম্ভব কিছুই না।

প্রশ্ন: 'হে অনন্তের পাখি' এক দুর্দান্ত রাজনৈতিক উপন্যাস। একটা রাজনৈতিক গল্প বলা যায়, অন্তরের পাখির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র ও জীবনযাত্রা আপনি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটা কি আপনি চারপাশের দেখাচিত্র থেকে নিয়েছেন?
রাহাত খান: এটা একটি রাজনৈতিক গল্প। ওই সময়কার চারপাশে ঘটে যাওয়া চিত্র তুলে ধরেছি। আমার বানিয়ে লেখার কোনো সুযোগ ছিল না। আমি যখন লিখতে বসি, প্রথমে একটি থিমের কথা ভেবে বসি। তাগিদটা আসে অবচেতন মনে। আর বিন্যাসটা লেখককে রপ্ত করতে হয়।

প্রশ্ন: 'ছায়াদম্পতি' একটি নিবিড় ঘনিষ্ঠ প্রেমের গল্প। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় সম্পর্কটি টিকল না। কেন এমনটা হলো?
রাহাত খান: 'ছায়াদম্পতি' গল্পে দেখবেন, সম্পর্কটি পরে টিকল, শেষ পর্যন্ত টিকল না। ভালোবাসার একনিষ্ঠতা, প্রেমে একনিষ্ঠতা এই বিষয়টি প্রায় নেই, কারণ আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন: প্রেমে বিশ্বাস করেন না?
রাহাত খান: প্রেমে বিশ্বাস করি, কিন্তু ভালোবাসা বিশ্বাস করি না।
প্রশ্ন: প্রেম এবং ভালোবাসার মধ্যে কোনো তফাত আছে বলে মনে করেন আপনি?
রাহাত খান: অনেক তফাত আছে। ভালোবাসা হচ্ছে একনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক, গভীর এবং নির্ভীক। এটা একা চলতে পারে না। আমরা যে কল্পনায় লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ দেখি, এটা অনেকটাই কল্পনা। মানুষ যে রকম হয়, এই ধরনের ঠিক হয় না। আমাদের সিনেমায় যেমন প্রেমের গল্প বলা হলো, এত ভালোবাসা একজন আরেকজন ছাড়া থাকতে পারে না, আমার কাছে এমনটা মনে হয়। একটা পারস্পরিক আকর্ষণ, কিছুটা দেহজ, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক এগুলো আমরা বুঝব। কিন্তু এরা যে কোনো মুহূর্তে আলাদা হতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে প্রেমকে মুছেও দিতে পারে।

প্রশ্ন: আপনার একটা গল্প আছে 'শরীরের পক্ষে-বিপক্ষে', আবুল হাসনাত নায়ক, আয়শা আক্তার নায়িকা। এদের একটা সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক জোড়া লাগে না যখন আয়শা আক্তার চলে এলো সব ত্যাগ করে, তখন আর তার শরীরে গান গায় না। আবুল হাসনাত তাকে আর নিতে পারে না। সম্পর্কের ভেতর শরীর কি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?
রাহাত খান: আমি তো তা-ই মনে করি। আমি তো এটার উর্ধ্বে কিছুই দেখতে পেলাম না।

প্রশ্ন: আপনার প্রথম প্রেম এবং সংসার জীবন?
রাহাত খান: তখন আমি ময়মনসিংহ কলেজের শিক্ষক। একটা বাড়িতে গান শুনতে যেতাম। মেয়েটির নাম ছিল মঞ্জু ভৌমিক। মেয়েটির বড় ভাই আমার সহপাঠী ছিল। একদিন আমি কলেজে ক্লাস নিচ্ছি, এমন সময় পিয়ন এসে বলল, স্যার আপনার একটা ফোন এসেছে। টেলিফোনটি ছিল প্রিন্সিপ্যাল স্যারের কক্ষে। টেলিফোন ধরলে অপর প্রান্ত থেকে বলল, স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমি চিনতে পারছিলাম না। তখন ওর নাম বলল। আমি মঞ্জু ভৌমিক। তখন স্মরণে এলো। চিনতে পারলাম। মঞ্জু তখন বলল, আমরা একটা বসন্ত উৎসব করব। আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট লিখে দেবেন। বিকেলে আমি প্রেস ক্লাবে যাব, আপনি আসতে পারেন। বিকেলে দেখা হলো, কথা হলো আবার দাওয়াতও পেলাম। বলল, গান শুনতে আসবেন একদিন বাসায়। বললাম, কবে আসব। বলল, যে কোনোদিন। পরে একদিন ওদের বাসায় গেলাম। ওইদিন দুইটি গান শুনিয়েছিল। প্রথম

গানটি ছিল 'আমার মল্লিকা বনে প্রথম ধরেছে কলি', ওর কণ্ঠ আমার হৃদয় ছুঁয়ে যেত। প্রায়ই আমি গান শুনতে যেতাম। আমাকে গান শোনাত। আমাদের মধ্যে তেমন কোনো কথা ছিল না। শুধু গানই শোনা হতো। ১৯৬৪ সালে একটা ভয়াবহ দাঙ্গা হলো। আমরা তখন হিন্দুদের পাহারা দিতাম। আমার ভাগে পড়েছিল ওদের এলাকা। ওর বাবা ছিল সুরেল ভৌমিক, পেশায় একজন উকিল। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। রাতে যখন পাহারা দিতাম, ওর বাবাকে ডেকে বলতাম, উকিল সাহেব চা-টা হবে নাকি। বাবা মঞ্জুকে ডেকে বলতেন, 'মঞ্জু স্যার এসেছে চা দাও'। মঞ্জু বলত, স্যারকে বলুন অনেক রেস্টুরেন্ট খোলা আছে। তারপর এসে ঠিকই চা দিত। এসে বলত, ঘুমটা ভেঙে দিলেন তো। কিছুদিন পর গান শুনতে গেলাম। একটা গান গেয়ে মঞ্জু চুপ করে বসে আছে। হঠাৎ দেখি চোখে জলের ধারা। আমি বললাম, কী হয়েছে? কাঁদছ কেন? মঞ্জু বলল, স্যার ঘরের ভেতরে আসেন। ঘরে গিয়ে দেখি কোনো আসবাবপত্র নেই। সব বাঁধা শেষ। আমরা কাল সকালে চলে যাচ্ছি ভারত। মনে হলো আমার ওপর বজ্রপাত পড়ল। তখন বুঝলাম, আমি তাঁকে ভালোবাসি। বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, মঞ্জু হাতটা বাড়াও। হাত বাড়িয়ে দিল, কিছুক্ষণ হাতটা ধরে রেখে ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে চলে এলাম। এটাই ছিল ওকে আমার প্রথম স্পর্শ। বহুবছর পরে আমি যখন ইত্তেফাকে কাজ করি, তখন আবারও একটা ফোন। সেই সুরেলা কণ্ঠস্বর অপরপ্রান্ত থেকে বলছে, স্যার চিনতে পারছেন? বললাম এই কণ্ঠস্বর ভোলা যায় না।

প্রশ্নঃ ব্যক্তি রাহাত খান এবং কথাশিল্পী রাহাত খান, এ দুইয়ের মধ্যে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি-পার্থক্য কীভাবে টেনে দেবেন?

রাহাত খানঃ লেখকের অভিজ্ঞতা থাকে অথবা অন্যের অভিজ্ঞতার ভাগীদার হতে হয় যে, কাজেই তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ব্যক্তি ও পরিবেশগতভাবে পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু একজন সাহিত্যিক বা লেখক নিজের দিকে তাকিয়ে লেখে।

প্রশ্নঃ আপনার গল্প বা উপন্যাসে দুটো বিষয় প্রায় কমন থাকে– এক দারিদ্র্য অন্যটি প্রেম। এর বাইরে বা নিজেকে আরও বিস্তৃত করতে পারতেন না কি?

রাহাত খানঃ আমি যখন মানুষের কথা লিখেছি বা বলেছি, শুধু দারিদ্র্য নয়, সব অবস্থায় মানুষের কথা লিখেছি এবং সেক্সও এসেছে। সেক্সটা হচ্ছে একটা অপরিহার্য বিষয়, আসবে না কেন? এর সঙ্গে পরকীয়াও এসেছে। জীবনে সত্যকে লুকিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না।

প্রশ্নঃ আপনি সাহিত্যিক ও গল্পকার হিসেবে সুপরিচিত। এক্ষেত্রে আপনার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি সম্পর্কে বলুন।

রাহাত খানঃ আমার স্ত্রী ২০ বছর ধরে সারেগামা করছে। প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি বলে আমাকে দোষ দেয়, 'তুমি আমাকে সাহায্য করনি।' আমি যখন লেখালেখি শুরু করি, তখন আমাকে তো কেউ সাহায্য করেনি? আমি দুই বছরের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলাম। আমি যখন 'চুড়ি' গল্পটি লিখলাম, তখন আবদুল হক বাংলা একাডেমিতে কাজ করেন। তিনি তখন বিখ্যাত লোক ছিলেন। নির্দয়ভাবে সমালোচনা করতেন। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি রাহাত খান? আমি তো ভাবছিলাম রাহাত খানের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। রাহাত খান আপনি। চুড়ি গল্পটা কীভাবে লেখলেন? এই গল্পটা আমাদের দেশের কেউ লিখতে পারবে না।' আমার সাফল্য হলো এই। আমার কোনো লেখা কোনোদিন ফেরত আসেনি। আমার একটা মাত্র গল্প ফেরত এসেছিল, আহসান হাবীব ছিলেন তখন বাংলা একাডেমির সম্পাদক। তিনি আমাকে বললেন, 'রাহাত একটা গল্প দেন তো আমাকে।' দিলাম একটা গল্প; কিন্তু ছাপা হলো না। আমি টেলিফোনে বললাম, হাবীব ভাই আপনাকে একটা গল্প দিয়েছিলাম ছাপলেন না যে? উত্তরে বললেন, না ছাপাইনি। ছাপব না। আপনি যদি দয়া করে একদিন আসতেন চা খেতে, কথা বলব আপনার সঙ্গে। উনি বললেন, গল্পটা খুব ভালো হয়েছে, আমি ছাপব না। গল্পটি ছিল 'আমগর টাকা'। কারণটা ছিল আদর্শগত কারণে গল্পটা ছাপতে পারব না। পরে সংবাদে ছাপা হলো।

প্রশ্নঃ আপনার অধিকাংশ উপন্যাস ও গল্প প্রেমের। এই লেখনীতে কি আপনার ছায়া আছে?

রাহাত খানঃ যে কোনো লেখা লেখকের আত্মজীবনী। তবে এর মধ্যে অনেক কল্পনা মেশাতে হয়। অন্যান্য চরিত্র থাকে, বিন্যাস থাকে। এদিক-ওদিক নিতে হয়। শেষ পর্যন্ত লেখাটা তার জীবনের অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরা দেয়।

প্রশ্নঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার একটা অসাধারণ স্মৃতি আছে, সেই গল্পটা বলুন।

রাহাত খানঃ যখন জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করি, আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর। তার আগে আমি দুইটি কলেজে চাকরি করে চলে এসেছি। বঙ্গবন্ধু জগন্নাথ কলেজে যেতেন, তিনি জানতেন এটা শিক্ষায়তন। বঙ্গবন্ধু বসতেন আহমদের একটা রেস্টুরেন্ট ছিল সেখানে। সঙ্গে থাকতেন মোজ্জাফর রহমত। আমি ও শামসুজ্জামান খান, আরও অনেকেই ওই রেস্তোরাঁয় যেতাম, তখন থেকে বঙ্গবন্ধু আমাকে একটু আলাদা চোখে দেখতেন। ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন করলাম। খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মাজহারুল ইসলাম ছিলেন আমাদের গুরু। এসব অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে প্রয়োজনবোধ করতাম। আমরা সাধারণত কয়েকজন মিলেই যেতাম এবং একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে ওঠে। অনেক সময় একাও গিয়েছি আমি। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছি আমি।

প্রশ্নঃ আপনি একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক হিসেবে নবীন সাংবাদিক ও লেখকদের কী বার্তা দেবেন।

রাহাত খানঃ লেখকদের বলি পড়, পড়, পড়। বেশি বেশি ধ্রুপদি সাহিত্য পড়তে হবে এবং নানা ধরনের বই পড়তে হবে। অর্থনৈতিক বই, রাজনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান এই সবকিছুর সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা উচিত লেখকদের। লেখকদের Home Work করতে হবে। একটা বিষয় লিখলে সে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে হবে। এগুলোয় আজকাল লেখকদের মধ্যে ঘাটতি দেখা যায়। আর সাংবাদিকদের এখন সুবিধা আছে, প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ আছে। এরা সাংবাদিক হওয়ার জন্য পড়াশোনা করে। বাস্তব জীবন থেকে, বাস্তব সাংবাদিকতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে অর্থাৎ সাংবাদিকতার যে বাস্তবতা, সেটা মেনে চলতে হবে।

প্রশ্নঃ আপনি বর্ণাঢ্য জীবনযাপন করছেন। আপনার সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেছেন, 'রাহাত খান যেখানে আছে, সেখানে প্রজাপতির ভিড়' তো হবেই।' কেন এ কথা বলেছিলেন?

রাহাত খানঃ হেনা ভাই, আমার পঞ্চাশতম জন্মদিন অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন চিত্রনায়িকা কবরী। উপস্থাপনার ফাঁকে ফাঁকে হেনা ভাই গল্প করছিলেন। অবশ্য গল্পটা ছিল আমার যৌবনকালের। একটি অপরূপ সুন্দরী এসে হেনা ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কি রাহাত খান? উত্তরে হেনা ভাই বললেন, না, আমি রাহাত খান নই, তবে হলে ভালোই হতো।

প্রশ্নঃ 'মাসুদ রানা' সিরিজের হিরো রাহাত খান, আপনি কি সেই রাহাত খান?

রাহাত খানঃ আমি মোটেই সেই মেজর রাহাত খান নই। আমি শুধুই রাহাত খান। তবে আমার বন্ধু কাজী আনোয়ার হোসেন 'মাসুদ রানা' সিরিজগুলো লিখেছেন। আমি যখন মফস্বল শহরে পড়াতাম, তখন তিনি একটা সিরিজ আমাকে দেখিয়েছিলেন। সেখানে নামের কোনো বালাই ছিল না। দ্বিতীয়বার যখন আমার সঙ্গে কাজী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে দেখা হলো, আমি বললাম এটা কী করেছেন আপনি? তখন তিনি আদরের সঙ্গে বলল, চুপ। কাজী আনোয়ার হোসেন যখন লিখতেন কুয়াশা, ভয়াল সিরিজ শুরুর দিকে এগুলো খুব অবহেলার বিষয় ছিল। কিন্তু পরে এত জনপ্রিয় হলো তার লেখাগুলো যে, বাবা পড়ত এবং ছেলেও পড়ত। অবশ্যই তিনি লেখনীতে তাঁর সঙ্গে যারা শত্রুতা করেছেন, লেখনীর মাধ্যমে তাদেরকে তার গল্পের খলনায়কের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মাসুদ রানা' সিরিজটা ছিল ফেলোমেনা। আমাদের দেশে এত দীর্ঘসময় ধরে কোনো সিরিজ চলেনি।

প্রশ্নঃ এত ব্যস্ততার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ সময় দেওয়ায় আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ?

রাহাত খানঃ আপনাকেও ধন্যবাদ।

বাংলাদেশে বিনোদন সাংবাদিকদের সংগঠন

অদ্বৈত মারুত

বাংলা সংবাদপত্রে বিনোদন সাংবাদিকতার শুরুটা হয়েছিল ১৮৮৫ সালের দিকে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১২৭ বছর আগে; সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ'র মধ্য দিয়ে। 'ঢাকা প্রকাশ'ই বিনোদন সাংবাদিকতার সুতিকাগার বলে ধরে নেয়া যায়। মূলত বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ বিনোদন সাংবাদিকতা। পর্যায়ক্রমে বিনোদন সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে 'ঢাকা প্রকাশ'সহ স্থানীয় ও আঞ্চলিক কাগজগুলো। তবে বিনোদন সংবাদ প্রকাশের বিস্তৃতি লাভ করে মাসিক সিনেমাসহ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ফজলুল হকের সম্পাদনায় প্রথম চলচ্চিত্র মাসিক পত্রিকা 'সিনেমা' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালের দিকে বগুড়া থেকে। ১৯৫১ সালে পত্রিকাটি ঢাকা থেকে বের হতে থাকে। মূলত গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকেই চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন কাগজে এ সময় চলচ্চিত্র বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন ওবায়েদ-উল হক, সন্তোষ কুমার বসাক, ফজলুল হক, রাবেয়া খাতুন, হুসনা বানু খানম, ফতেহ লোহানী, রুহুল আমিন নিজামী, ইফতেখারুল আলম, মঈদ-উর-রহমান, মীজানুর রহমান, আসিরুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ, আজিজ মিসির, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ, মহিউদ্দিন, সৈয়দ শামসুল হক, সুরেন রায়, ফজল শাহাবুদ্দিন, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, শাদাত আলী খান, অসিত মুখোপাধ্যায়, সাঈদ আহমদসহ আরও অনেকে।

১৯৫০ সালে 'উদয়ন' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে। পত্রিকাটি সিনেমার মতো শতভাগ চলচ্চিত্র কাগজ ছিল না। তবে তার মান ছিল কলকাতার 'রূপাঞ্জলী,

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে 'পূর্ববঙ্গ চলচ্চিত্র দর্শক সমাজ' প্রতিষ্ঠালাভের মধ্য দিয়ে বলা যায়, বিনোদন সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটতে থাকে। বিকশিত হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আকাশ সংস্কৃতি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এবং প্রযুক্তির আধুনিকতায় বর্তমানে বিনোদন সাংবাদিকতা অন্যান্য যে কোনো পেশার মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা

'দিপালী', 'সচিত্র ভারত' ইত্যাদির সঙ্গে তুলনামূলক প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ। রুহুল আমিন নিজামী ছিলেন পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক। ১৯৫০ সালে আরেকটি চলচ্চিত্র কাগজ প্রকাশিত হয় 'ছায়াবাণী' নামে। এটি সম্পাদনা করেন বলিয়াদি জমিদার পরিবারের খালেদ সিদ্দিকী। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় অপর চলচ্চিত্র কাগজ 'রূপছায়া'। মীজানুর রহমান ১৯৫১ সালের জানুয়ারিতে এটি সম্পাদনা করেন। রূপছায়া'য় লেখা থাকত 'পূর্ববঙ্গ' চলচ্চিত্র দর্শক সমাজের মুখপত্র এটি। 'রূপছায়া'র প্রকাশক ছিলেন তাঁর বড়ভাই মঈদ-উর-রহমান। এ কাগজের সঙ্গে অনেকের মধ্যে ছিলেন বিপরীত চৌধুরী, কাজী মাসুম, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বটু মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, কাজী খালেক, আহমদ মীর, শামসুর রাহমান, উদয়ন চৌধুরী, শহীদ কাদরী, পিটু সুলতান, প্রেমেন্দ্রে মিত্র, শংকর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ। ১৯৫৩ সালের ১৩ জুন প্রথম সাপ্তাহিক চিত্রালী প্রকাশিত হয়। তখনো বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়নি। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা এরই মধ্যে বিকশিত হতে শুরু করেছে। ১৯৫৪ সালের ৬ আগস্ট প্রথম বাংলা সবাক ছবি 'মুখ ও মুখোশ'র মহরত অনুষ্ঠিত হয়। এফডিসি প্রতিষ্ঠালাভ করে আরও পরে ১৯৫৭ সালে। তদানীন্তন বাণিজ্যমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবনায় এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে বিনোদন সাংবাদিকতা মোড় নেয় চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক এবং তা ছিল বাস্তবসম্মত। ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা পায় প্রথম বিনোদন সাংবাদিকদের পেশাজীবী সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি' বা বর্তমান বাচসাস।

প্রসঙ্গত, গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে 'পূর্ববঙ্গ চলচ্চিত্র দর্শক সমাজ' প্রতিষ্ঠালাভের মধ্য দিয়ে বলা যায়, বিনোদন সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটতে থাকে। বিকশিত হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আকাশ সংস্কৃতি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এবং প্রযুক্তির আধুনিকতায় বর্তমানে বিনোদন সাংবাদিকতা অন্যান্য যে কোনো পেশার মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা।

বর্তমানে এ পেশায় নিয়োজিত সাংবাদিকদের রয়েছে বেশ কয়েকটি সংগঠন; যদিও কোনো কোনোটি ভেঙে দু'টুকরো, তিন টুকরো হয়ে গেছে। কয়েকটি সংগঠনের পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস)

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কার বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার। ১৯৭২-'৭৩ সাল থেকে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্যান্য কলাকুশলীকে এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। বাচসাস পুরস্কার মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে প্রদান করা শুরু হয়। এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রবিষয়ক পুরস্কার। জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ পুরস্কারের প্রতীক। ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম ১৯৭২-'৭৩ সালের চলচ্চিত্রের জন্য এ পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। তখন থেকে সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, পার্শ্বচরিত্রে অভিনেতা, পার্শ্বচরিত্রে অভিনেত্রী, সংগীত পরিচালক, গীতিকার, পুরুষ কণ্ঠশিল্পী, নারী কণ্ঠশিল্পী, কাহিনীকার, চিত্রনাট্য, সংলাপ, চিত্রগ্রাহক, শিল্প নির্দেশক ও সম্পাদনার জন্য পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও টেলিফিল্ম, টিভি সিরিয়াল, টিভি নাটক, টিভি অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপনচিত্র, মঞ্চনাটক, সংগীত, নৃত্যের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ পুরস্কার নিয়মিত দেয়া হয়। সাত বছর পর ১৯৯৫ সাল থেকে এটি আবার নিয়মিত দেয়া শুরু হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা জুরি বোর্ড নির্বাচন করে। সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক-প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাধারণত জুরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

পুরস্কার: আজীবন সম্মাননা পুরস্কার, চলচ্চিত্র, সংগীত, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সম্মাননা পুরস্কার, বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার।

সাংবাদিকতা পুরস্কার : আজিজ মিসির স্মৃতি পুরস্কার, এসএম পারভেজ স্মৃতি পুরস্কার, ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার, আহমদ জামান চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, বেলাল আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার, ওবায়েদ-উল হক-স্মৃতি পুরস্কার, ফজল শাহাবুদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার, আলমগীর কবির স্মৃতি পুরস্কার, বেলায়েত হোসেন বেলাল স্মৃতি পুরস্কার।

চলচ্চিত্র: সেরা চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রী, সেরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনেতা, সেরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনেত্রী, সেরা সংগীত পরিচালক, সেরা গীতিকার, সেরা পুরুষ কণ্ঠশিল্পী, সেরা নারী কণ্ঠশিল্পী, সেরা কাহিনীকার, সেরা চিত্রনাট্যকার, সেরা সংলাপ রচয়িতা, সেরা চিত্রগ্রাহক, সেরা শিল্পনির্দেশক, সেরা সম্পাদক, সেরা শব্দগ্রাহক, সেরা রূপসজ্জাকর।

টেলিফিল্ম: সেরা টেলিফিল্ম, সেরা পরিচালক, সেরা নাট্যকার, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রী।

টিভি সিরিয়াল: সেরা টিভি সিরিয়াল, সেরা পরিচালক, সেরা নাট্যকার, সেরা চিত্রগ্রাহক, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রী, সেরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনেতা, সেরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনেত্রী।

টিভি নাটক: সেরা টিভি নাটক, সেরা পরিচালক, সেরা নাট্যকার, সেরা চিত্রগ্রাহক, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রী, সেরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনেতা, সেরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনেত্রী।

টিভি অনুষ্ঠান: সেরা উপস্থাপক, সেরা টকশো উপস্থাপক, সেরা রিয়্যালিটি শো উপস্থাপিকা, সেরা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, সেরা তথ্যমূলক অনুষ্ঠান, সেরা তারুণ্যের অনুষ্ঠান, সেরা স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান, সেরা সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন অনুষ্ঠান।

বিজ্ঞাপনচিত্র: সেরা বিজ্ঞাপনচিত্র, সেরা বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা, সেরা মডেল (পুরুষ), সেরা মডেল (নারী), আলোচিত মডেল (পুরুষ), আলোচিত মডেল (নারী)।

মঞ্চনাটক: সেরা মঞ্চনাটক, সেরা মঞ্চদল, সেরা নাট্যকার, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রী, সেরা সেট ডিজাইন।

সংগীত: সেরা পুরুষ কণ্ঠশিল্পী, সেরা নারী কণ্ঠশিল্পী, সেরা সংগীত পরিচালক, সেরা গীতিকার, সেরা ব্যান্ডদল, সেরা সম্ভাবনাময় পুরুষ কণ্ঠশিল্পী, সেরা সম্ভাবনাময় নারী কণ্ঠশিল্পী।

নৃত্য: সেরা নৃত্যশিল্পী (পুরুষ), সেরা নৃত্যশিল্পী (মহিলা), সেরা নৃত্যশিল্পী জুটি (পুরুষ), সেরা নৃত্যশিল্পী জুটি (মহিলা)।

পুরস্কার প্রত্যাখ্যান: একের পর এক লেখক-প্রকাশক হত্যা এবং তাদের ওপর হামলার প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে নিজের পাওয়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির পুরস্কার ফিরিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেন কবি ও লেখক বরকতউল্লাহ মারুফ। হুমায়ুন আহমেদ রচিত উপন্যাস অবলম্বনে মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত প্রিয়তমেষু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার জন্য এ পুরস্কার পেয়েছিলেন মারুফ বরকত।

বাংলাদেশ মিউজিক জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএমজেএ)

দেশের জাতীয় দৈনিক, পাক্ষিক, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিনোদন সাংবাদিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ মিউজিক জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমজেএ) নতুন কমিটি গঠিত হয় ২০০৫ সালে। সম্প্রতি খন্দকার আলমগীরকে সভাপতি ও সাখাওয়াত ওসমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। দ্বি-বার্ষিক এ সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে রয়েছেন সহ-সভাপতি অঞ্জন দাশ (দৈনিক আলোকিত সময়), তৌহিদুল ইসলাম অপু (দ্য পেজেস), সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউর রহমান রিজভী (দৈনিক মানবকণ্ঠ), অর্থ সম্পাদক রুহুল সাখাওয়াত (বলা না বলা), আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেজাউল করিম খোকন (দৈনিক ইত্তেফাক), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রাহাত সাইফুল (রাইজিংবিডি), মহিলা ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইরানী বিশ্বাস (আনন্দ কাগজ), সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখ রাজিয়া সুলতানা (দৈনিক বর্তমান) ও দফতর সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ (দৈনিক সংবাদ)।

এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে রয়েছেন আলমগীর কবির (দৈনিক নয়াদিগন্ত), চপল মাহমুদ (দৈনিক আমাদের সময়), খায়রুল বাবুই (বাংলাভিশন) ও আশিষ সেনগুপ্ত (দৈনিক আলোকিত সময়)।

যাত্রা শুরুর পর থেকে সংগঠনটি মিউজিক তারকাদের সম্মাননা প্রদান, সেমিনার আয়োজন ও প্রকাশনা বের করাসহ নানা কাজ করে আসছে।

বিটিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিআরএ)

বাংলাদেশ টেলিভিশন সংবাদের মানোন্নয়ন ও কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিভি'র বার্তা শাখায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে বিটিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিআরএ)। ২০১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি রামপুরা বিটিভি ভবনে আয়োজিত এক সভায় সুজন হালদারকে আহ্বায়ক করে বিটিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৫৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিটিভি সংবাদ আরও বস্তুনিষ্ঠ ও দর্শকমহলে গ্রহণযোগ্য করতে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

বান্দরবান টেলিভিশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

২০১৫ সালের ১০ জানুয়ারি বান্দরবানে গঠিত হয় 'টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'। সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে বান্দরবান জেলায় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে কর্মরত সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সদস্যদের কণ্ঠভোটে ১৫

সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন ফরিদুল আলম সুমন (চ্যানেল ২৪) এবং সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন শাহরিয়ার (এনটিভি)। কমিটির অন্যরা হলেন সহ-সভাপতি মিনারুল হক, সহ-সভাপতি আল ফয়সাল বিকাশ, যুগ্ম-সম্পাদক এস বাসু দাশ, অর্থ সম্পাদক শাফায়াত হোসেন, দফতর সম্পাদক জহির রায়হান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সৈকত দাশ। এছাড়া সংগঠনের নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন মোহাম্মদ ইসহাক, চবাথুই মারমা, রফিকুল আলম, নুরুল কবির, উসিথোয়াই মারমা, নজরুল ইসলাম টিটু, এন এ জাকির।

সিনেমা জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিসিজেএ)

'চলচ্চিত্রের জয়গান, তারুণ্যের হাত ধরেই' এ স্লোগান নিয়ে ২০১৭ সালের ৩১ জানুয়ারি গঠিত হয় বাংলাদেশ সিনেমা জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিসিজেএ)। জাতীয় দৈনিক, পাক্ষিক, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের চলচ্চিত্র সাংবাদিকরা এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন।

সংগঠনের সদস্যদের সম্মতিক্রমে দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক শফিক আল মামুনকে সভাপতি ও এনটিভি অনলাইনের সাংবাদিক মাজহার বাবুকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে এক বছর মেয়াদি ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির আহ্বায়ক নাসিরউদ্দিন দিলু, বিশেষ উপদেষ্টামণ্ডলীতে রয়েছেন মধুমিতা সিনেমা হলের কর্ণধার ইফতেখার উদ্দিন নওশাদ, পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার ও মহাসচিব বদিউল আলম খোকন। উপদেষ্টা পরিষদে আরও রয়েছেন মঈনুল হক রোজ (বিনোদন২৪), এম এস রানা (অনুষ্ঠান গবেষক-এইচডি টিভি প্রজেক্ট) সংগঠন ও বাণিজ্য পরামর্শক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ইসহাক ফারুকী (ফিচার সম্পাদক, আলোকিত সময়)।

দৈনিক মানবজমিনের চলচ্চিত্র প্রতিবেদক কামরুজ্জামান মিলুকে সহ-সভাপতি এবং যমুনা টেলিভিশনের সিনিয়র সাংবাদিক কামরুল ইসলাম রিফাতকে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে গৌতম পাণ্ডে (দৈনিক জনকণ্ঠ), সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাকসুদুল হক ইমু (চ্যানেল ২৬), আন্তর্জাতিক সম্পাদক জনি হক (বাংলানিউজ২৪), সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক নাজমুল আলম রানা (চ্যানেল ২৪), অর্থ সম্পাদক রাহাত সাইফুল (রাইজিংবিডি), দফতর সম্পাদক এ এইচ মুরাদ (আরটিভি অনলাইন), উন্নয়ন ও ইভেন্ট– নাহিদ ন্যাস (নিউজনেক্সট ডটকম), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রতিক আকবর (ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আহমেদ জামান শিমুল (পরিবর্তন), যুগ্ম প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক নাহিয়ান ইমন (জাগো নিউজ), সরকারি ও বেসরকারি বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ (আমাদের সময়), ক্রীড়া সম্পাদক রিমন (জাগো এফএম), তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক সাকিব শুভ (যমুনা টিভি), নিউ মিডিয়া সম্পাদক এমদাদুল হক মিল্টন (সকালের খবর), লিগেসি মিডিয়া সম্পাদক রাজন হাসান (জিটিভি), নারীবিষয়ক সম্পাদক ফাহমিদা তাপসী (বণিক বার্তা), আইনবিষয়ক সম্পাদক তানজিল আহমেদ জনি (বিডিনিউজ)। কার্যকরী সদস্যরা হলেন বুলবুল আহমেদ জয় (৭১টিভি), মাসুম (দেশটিভি), আশিকুর রহমান (বৈশাখী টিভি), তরিকুল হাসান আশিক (সময় টিভি), মাহাতাব হোসেন (কালের কণ্ঠ অনলাইন), মোস্তাফিজ মিঠু (ইত্তেফাক), সুদীপ্ত সাঈদ খান (নিউজ বাংলাদেশ), মাসুম আওয়াল (পরিবর্তন), হিমু (রেডিও ধ্বনি), অপু (বাংলাভিশন), অধরা রেজা (চ্যানেল২৪), মুষান্না জাহান (অলরিপোর্ট২৪), মাজহার মুন্না (কারুনিউজ), শেখ রাখি (বর্তমান), জিয়াউর রহমান সুমন (দেশরিপোর্ট), আফসানা আশা (ইন্ডিপেনডেন্ট), দেওয়ান পারভেজ (আলোকিত সময়), রোমান (ইটিভি), নাইস নূর (এনটিভি অনলাইন)।

কালচারাল জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সিজাব)

দেশের জাতীয় দৈনিক, পাক্ষিক, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিনোদন সাংবাদিকদের এক ফ্রেমে সংগঠিত করার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে কালচারাল জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সিজাব)। বিনোদন সাংবাদিকদের স্বার্থরক্ষাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তৈরি ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনটির জন্ম। এ সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার জন্য দেশের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন পোর্টালের বিনোদন সাংবাদিকরা সম্মতি জানিয়েছেন। সম্প্রতি সংগঠনের সদস্যদের সম্মতিক্রমে দৈনিক যুগান্তরের বিনোদন বিভাগীয় প্রধান এফ আই দীপুকে সভাপতি এবং দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিনোদন বিভাগের প্রধান আলী আফতাবকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-২০১৮ দু'বছর মেয়াদি ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন সেলিম কামাল (দৈনিক যুগান্তর), অনুরূপ আইচ (নিউজজি২৪ডটকম), তানভীর তারেক (দৈনিক ইত্তেফাক), মঈনুল হক রোজ (বিনোদন২৪.কম), আলাউদ্দিন মজিদ (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন), মঈন আবদুল্লাহ (দৈনিক আমাদের সময়), সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মুকাদ্দেম বাবু (এটিএন বাংলা), সহ-সাধারণ সম্পাদক রুদ্র মাহফুজ (পাক্ষিক বিনোদন), সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর বিপ্লব (দৈনিক ভোরের কাগজ), সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহসান (বিডিনিউজ২৪.কম), অর্থ সম্পাদক কামরুজ্জামান মাসুম (এটিএন বাংলা), দফতর সম্পাদক তারেক আনন্দ (দৈনিক আমাদের সময়), সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক লিমন আহমেদ (জাগোনিউজ২৪ডটকম), সহ-সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক অনিন্দ্য মামুন (দৈনিক যুগান্তর), ক্রীড়া সম্পাদক তানজিল আহমেদ জনি (বিডিনিউজ২৪.কম), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামরুল ইসলাম রিফাত (যমুনা টিভি), সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মারুফ কিবরিয়া (দৈনিক মানবজমিন) কার্যকরী সদস্যরা হলেন রাজীব আহমেদ (চ্যানেল আই), এনামুল হক (একুশে টিভি), রেজা হোসেন (বাংলাভিশন), সুদীপ কুমার দ্বীপ (দৈনিক কালের কণ্ঠ), ফারুক হোসেন শিহাব (নিউজজি২৪.কম), সাদিয়া ন্যান্সি (দৈনিক যুগান্তর), জিয়াউদ্দিন আলম (পাক্ষিক বিনোদন), জুম্মাতুল বিদা (চ্যানেল টোয়েন্টিফোর), মুনিফ আম্মার (নিউজবাংলাদেশ.কম), মিঠু হালদার (প্রিয়.কম), এন আই বুলবুল (যায়যায়দিন), এ এইচ মুরাদ (আরটিভি), নাহিয়ান ইমন (জাগোনিউজ২৪.কম)।

কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি)

দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক, পাক্ষিক, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিনোদন সম্পাদকদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ-সিজেএফবি'র নয়া কমিটি গঠিত হয় ২০১৭ সালে। সংগঠনের কার্যনির্বাহী সদস্যদের উপস্থিতিতে সব সদস্যের সম্মতিক্রমে দৈনিক নয়াদিগন্তের বিনোদন বিভাগীয় প্রধান তামিম হাসানকে সভাপতি এবং দৈনিক ইত্তেফাকের ফিচার সম্পাদক খালেদ আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-২০১৯ দুই বছর মেয়াদি ২৯ সদস্যবিশিষ্ট নতুন এ কমিটির উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন এনাম সরকার (সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব), অনুরূপ আইচ (সম্পাদক, নিউজজি২৪ডটকম), এম এস রানা (প্রোগ্রাম গবেষক, এইচডি টিভি প্রজেক্ট)। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মাসুম অপু (স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো), রাশেদুল মজিদ মামুন (এমডব্লিউ বাংলাদেশ), জনি হক (বিশেষ সংবাদদাতা, বাংলানিউজ২৪ডটকম), মঈনুল হক রোজ (সম্পাদক, বিনোদন২৪ডটকম), দ্বীন ইসলাম (বিশেষ সংবাদদাতা, দৈনিক মানবজমিন)। সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল আজাদ বিদ্যুৎ (সাব-এডিটর, দৈনিক সমকাল), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জাহিদ শাওন (নির্বাহী সম্পাদক, আনন্দ লহরী), দফতর সম্পাদক এমদাদুল হক মিলটন (বিনোদন ইনচার্জ, দৈনিক সকালের খবর), সাহিত্য সম্পাদক এস এম মুন্না (স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল), সাংস্কৃতিক সম্পাদক নিপু বড়ুয়া (সেকশন এডিটর, পূর্বপশ্চিম.কম), ক্রীড়া সম্পাদক দীপঙ্কর দীপক (বিভাগীয় প্রধান, দৈনিক যায়যায়দিন), অর্থ সম্পাদক আলমগীর কবির (সাব-এডিটর, দৈনিক নয়াদিগন্ত), আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মেহনাজ পারভীন (সিনিয়র নিউজরুম এডিটর, এটিএন নিউজ)। নির্বাহী সদস্য নাসির আহমেদ (বাংলাদেশ টেলিভিশন), কামরুজ্জামান মাসুম (এটিএন বাংলা), রাজীব আহমেদ (চ্যানেল আই), মুজাহিদ সামিউল্লাহ (দৈনিক মানবজমিন), মাহবুব হাসান জ্যোতি (নাগরিক টিভি), শেখ আরিফ বুলবন (নিউ নেশন), এনামুল হক (একুশে টেলিভিশন), নাহিদ হোসেন (চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর), আলী আফতাব (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন), তানজিল আহমেদ জনি (বিডিনিউজ২৪.কম), এন আই বুলবুল (দৈনিক যায়যায়দিন)। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে গঠিত হয় কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি)।

বিনোদন সাংবাদিকদের আরও কয়েকটি সংগঠনের নাম হলো বাংলাদেশ বিনোদন সাংবাদিক সমিতি (বাবিসাস), বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিআরএ)। বর্তমানে সংগঠনটি দু'ভাগে বিভক্ত। টেলিভিশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ট্রাব), বাংলাদেশ মিউজিক জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ডিসিআরএ), বাংলাদেশ মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

সম্প্রতি সিজেএফবি ভেঙে আরও দু'টি সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এটির একটির নেতৃত্বে রয়েছেন এফ আই দিপু এবং আরেকটির নেতৃত্বে রয়েছেন কামরুজ্জামান মিলু।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক আমাদের সময়

দুই দিকপালের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা

জাহিদা পারভেজ ছন্দা

বাংলাদেশের দুই দিকপাল তাদের সাক্ষাৎকারে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা সম্বন্ধে তাঁদের সুদীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাদের কথনে উঠে এসেছে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের নানা প্রসঙ্গ এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার নানা বিষয়। এ দুইজন সাংবাদিক হলেন মাহফুজ সিদ্দিকী ও অনুপম হায়াৎ।

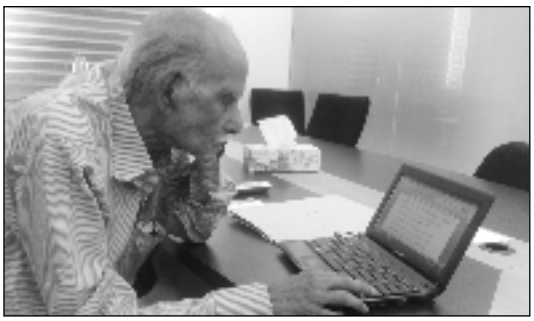

মাহফুজ সিদ্দিকী

কান উৎসব থেকে দেশের সাংস্কৃতিক উৎসব, সোফিয়া লরেন থেকে শুরু করে শাবানা, ববিতা কিংবা রাজ্জাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যাকে এখনো স্বপ্নলোক করে তোলে তিনি '৭০-'৮০র দশকের দাপিয়ে বেড়ানো একজন সাংবাদিক। যাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি ১৯৬৫ সালে। ৫২ বছরের

দেখা হয়েছে রাজকাপুর, হেমা মালিনী, সোফিয়া লরেনের সঙ্গে। সোফিয়া লরেনকে তো পান খাইয়েছি। আমার পান খাওয়া দেখে সোফিয়া লরেন বলে, 'কি খাও।' বললাম, 'পান'। খেতে চাইলে বললাম 'এটা খাইলে মাথা ঘুরবে।'

সাংবাদিকতার চমৎকার স্মৃতি তাঁকে আজ স্মৃতিকাতর করে তোলে, তৈরি করে ভালোলাগা। চলচ্চিত্র বা বিনোদন সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিতই শুধু নন, তিনি বিনোদন জগতের স্মৃতির ভাণ্ডার হিসেবেও বিশেষ পরিচিত ।

তিনি হলেন বর্তমান সাংবাদিকদের অভিভাবক সিনিয়র সাংবাদিক মাহফুজ সিদ্দিকী।

নিরীক্ষা: কেমন আছেন?

মাহফুজ সিদ্দিকী: ভালোই আছি, চশমা ছাড়া সব পড়তে পারি, তার মানে চোখ ঠিক আছে। কানেও যন্ত্র নেই। তবে হাঁটতে একটু সমস্যা হয় মাঝেমধ্যে। অবশ্য আগে থেকেই হাঁটতে পছন্দ করতাম না।

নিরীক্ষা: এখন কী করছেন?

মাহফুজ সিদ্দিকী: কী আর করব। কেউ তো কাজ দেয় না। লেখালিখি করছি। কিছু সম্পাদনা আর যে কাজটা করছি তা হলো গবেষণা। বর্তমানে ফিল্ম আর্কাইভের তত্ত্বাবধানে চিত্রালীর সম্পাদক বিনোদন সাংবাদিকতার পথিকৃৎ এস এম পারভেজকে নিয়ে একটি গবেষণা করছি আর যোগাযোগ ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে শিশুশ্রম নিয়ে আরেকটি গবেষণার কাজ করছি। নিজের লেখা তো আছেই।

নিরীক্ষা: আপনার বিনোদন সাংবাদিকতায় শুরুর কাহিনীটা বলুন।

মাহফুজ সিদ্দিকী: সালটা ১৯৬৫। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্র। সবে মাস্টার্সের রেজাল্ট বেরিয়েছে। কী করব, কিছুই ভাবিনি। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজবে ব্যস্ত, এমন সময় একজন লম্বা সুদর্শন পুরুষ এলেন। দরাজ গলায় আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছ? কাজ করবে, আমি কিছু বলার আগেই বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।' কোনো কিছু না ভেবেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো উনার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠি। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে এক নম্বর সাপ্তাহিক পত্রিকা চিত্রালীর অফিসের সামনে গিয়ে গাড়ি থামে। যিনি ডেকে আনলেন তিনি ছিলেন চিত্রালীর সম্পাদক এস এম পারভেজ। চিত্রালীর অফিসে গিয়ে বলেন, 'বাংলায় লেখাপড়া করেছ, লেখার হাতও শুনেছি ভালো, কাল থেকে চিত্রালীতে কাজে লেগে যাও, বেতন ৪৫০ টাকা।' সব মিলিয়ে আমি তো মহাখুশি। কেননা লেখার প্রতি আগ্রহ আমার বরাবরের। এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। ওই সময় সচিবদেরও এত বেতন ছিল না। তখন সরকারি চাকরির থেকে চিত্রালীতে কাজ করাটা ছিল বেশি রোমাঞ্চকর ও সম্মানের। চিত্রালীর অফিসে এমন কেউ নেই যে যেতেন না, আড্ডা দিতেন না। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন থেকে শুরু করে শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আমজাদ হোসেনসহ লেখক, শিল্পী, নায়ক-নায়িকা এমনকি রাজনীতিবিদরাও নিয়মিত এই অফিসে আসতেন। বিখ্যাত মানুষদের আনাগোনার বিষয়টি জানা ছিল, সেখানে কাজ পাওয়া তো স্বপ্ন পূরণ হওয়া। তাই কোনো চিন্তা না করে রাজি হয়ে গেলাম। ব্যস, সেই ১৯৬৫ সালে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে শুরু হলো চাকরি হিসেবে সাংবাদিকতা জীবন।

নিরীক্ষা: ১৯৬৫ থেকে ১৯৯১ টানা ২৬ বছর সাপ্তাহিক চিত্রালীতে কাজ করার পর দৈনিক পত্রিকায় কাজ শুরু করলেন, কেমন ছিল আপনার প্রথম ২৬ বছর?

মাহফুজ সিদ্দিকী: প্রথমে বলি, চিত্রালী ছেড়ে দেইনি, বাধ্য হয়েছি ছাড়তে। অকালে চিত্রালীর সম্পাদক এস এম পারভেজ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রালীর ভাগ্যে তথা এই সাপ্তাহিকে কর্মরত সবার ভাগ্যে নেমে আসে দুর্যোগ। নানা সমস্যাসহ বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয় মালিকপক্ষ। অনেক চেষ্টা করেও চিত্রালীতে থাকতে পারিনি।

নিরীক্ষা: আপনি বিনোদন সাংবাদিক হিসেবে শুরু করেছিলেন। কখনো মূলধারার রিপোর্টার হতে চেয়েছিলেন কি?

মাহফুজ সিদ্দিকী: না, কখনোই না। আমি মনে করি, বিনোদন সাংবাদিকতা মূলধারারই একটি অংশ। আমি যে জায়গায় কাজ করেছি তা অত্যন্ত সম্মানজনক এবং আনন্দের ছিল। তাই কখনো এভাবে কিছু মনে হয়নি। তাছাড়া চলচ্চিত্র বা বিনোদন রিপোর্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। কখনো এভাবে ভাবিইনি। তবে বলতে পারি মূলধারার সাংবাদিকতার পাশাপাশি চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার যে নবধারার সূচনা হয়েছে, তা গতিশীল করেছি। মূলধারার সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিনোদন সাংবাদিকতা দাঁড়িয়ে যাক, নবধারার সূচনা হোক, সে হিসেবে কাজ করে গেছি। এই ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এস এম পারভেজকে প্রথম ব্যক্তি বলা হয়ে থাকে। উনি প্রথম ব্যক্তি হলে আমি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে এই নতুনধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করে গেছি নিরলসভাবে।

নিরীক্ষা: 'বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা-বাচসাস' পুরস্কার প্রবর্তনে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, এ সম্পর্কে কিছু বলেন।

মাহফুজ সিদ্দিকী: ১৯৭২-'৭৩ এ বাচসাস পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। এই পুরস্কার প্রবর্তনের মূল নায়ক ছিলেন চিত্রালী সম্পাদক এস এম পারভেজ। তাঁর কথা না বললেই নয়। উনার (এস এম পারভেজ) সঙ্গে কাজ করে দেখেছি একজন অসাধারণ মানুষ, কী করে চলচ্চিত্র তথা চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের ভালো হবে– এই চিন্তা করতেন সবসময়। এই চিন্তা থেকেই বাচসাস পুরস্কার প্রবর্তন। কারণ হলো শিল্পী-কুশলীদের আরো ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া। এককথায় সংস্কৃতি জগৎটাকে আরো উজ্জীবিত করতে, উদ্দীপ্ত করতে মূলত বাচসাস পুরস্কারের প্রবর্তন। এর পেছনে কোনো নেতিবাচক উদ্দেশ্য ছিল না। একজন চলচ্চিত্র শুভাকাঙ্ক্ষীর চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নেওয়ার একটা প্রয়াস, যা এখন অত্যন্ত সম্মানজনক পুরস্কার হিসেবে স্বীকৃত। আমি মনে করি, 'বাচসাস' পুরস্কারের দেখাদেখি জাতীয় পুরস্কারের প্রবর্তন হয়েছে। কারণ জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তনের সময় ওই কমিটির সঙ্গে জড়িতরা এসেছিলেন এস এম পারভেজের কাছে, আমার কাছে পরামর্শ নিতে।

নিরীক্ষা: আপনি তো কান উৎসবে গিয়েছিলেন নিউজ কাভার করতে, কেমন ছিল সে অভিজ্ঞতা?

মাহফুজ সিদ্দিকী: এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সুখের, আনন্দের, গর্বের। প্যারিস, ইতালি ও রাশিয়ায় গিয়েছিলাম। দেখা হয়েছে রাজকাপুর, হেমা মালিনী, সোফিয়া লরেনের সঙ্গে। সোফিয়া লরেনকে তো পান খাইয়েছি। আমার পান খাওয়া দেখে সোফিয়া লরেন বলে, 'কি খাও।' বললাম, 'পান'। খেতে চাইলে বললাম 'এটা খাইলে মাথা ঘুরবে।' কিন্তু সে তো নাছোড়বান্দা পান খাবেই, দিলাম। পান খেয়ে তো বমিটমি করে একাকার। তারপরও সোফিয়া কী খুশি, কী আগ্রহ। এসব অসাধারণ স্মৃতি বলে বোঝানো যাবে না।

নিরীক্ষা: এত চমৎকার স্মৃতি কোথাও কি লিখেছেন?

মাহফুজ সিদ্দিকী: প্রথমত আমি এসব পছন্দ করি না। এসবই আমার ব্যক্তিগত ভালোলাগা। এসব মানুষ কেন জানতে চাইবে। তারপর আপনি বললেন। কিন্তু আমার জীবনী যদি লিখি, এর ছাপার পয়সা কে দেবে(?), আমি গরিব মানুষ। সংসারই চালাতে পারি না। কেউ যদি বিনিয়োগ করে, তাহলে লেখা যেতে পারে।

নিরীক্ষা: আপনার সময়ের সঙ্গে এখনকার সাংবাদিকদের মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে কি? থাকলে তা কী?

মাহফুজ সিদ্দিকী: এখনকার সাংবাদিকতার ধরন-ধারণ আমার পছন্দ হয় না। প্রশ্ন করতে পারেন, কেন পছন্দ নয়– কারণ লেখার ভেতরে অনুভব কম, গভীরতা কম, নতুনত্ব কম। একই খবর দাঁড়ি, কমা পর্যন্ত এক রকম, প্রকাশিত হয় ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায়। তার মানে, কপি আর পেস্ট হয়। কেউ খবরের পেছনে যেতে চায় না। খবরের গভীরে যাওয়ার সংখ্যা খুবই কম। এছাড়া বর্তমানদের চালচলন ভালো না, ঠিক না, শোভন নয়। সর্বোপরি প্রায় লেখকের মনোভাবটা সাজানো, মেকি। এগুলোকে মেরামত করতে হবে।

নিরীক্ষা: কীভাবে মেরামতের কথা বলছেন?

মাহফুজ সিদ্দিকী: মেরামতের জন্য দরকার অনেক বেশি মতবিনিময় সভার, প্রশিক্ষণের। তাহলে আসল নবধারার সাংবাদিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। নবধারার সাংবাদিকতার জন্য যা দরকার, এর নমুনা দেখাতে হবে। (উষ্মার সঙ্গে বলেন) প্রয়োজনে নবধারার সাংবাদিকতার নমুনা মাহফুজ সিদ্দিকী দেখাবে।

নিরীক্ষা: তাহলে এই নতুন প্রজন্মের কাছে আপনার পরামর্শ কী?

মাহফুজ সিদ্দিকী: পরামর্শ একটাই– কাজে আন্তরিক হওয়া। আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। একজন সাংবাদিক সে যা-ই লিখুক, খুব কম হলেও যেন তথ্য থাকে, সেদিকে নজর দিতে হবে।

নিরীক্ষা: সংবাদ বা সাংবাদিকতা নিয়ে কোনো বই লিখেছেন কি?
মাহফুজ সিদ্দিকী: না। এমন বই লেখার মতো বিদ্যা-জ্ঞান আমার নেই। আমি গল্প-উপন্যাস লেখি। মনের মধ্যে যখন ঢেউ এসে যায় তখন লিখি।

নিরীক্ষা: বর্তমানে দেশে সিনেমা একটা সংকটকালীন অবস্থায় পাড়ি দিচ্ছে, চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে আপনার এ বিষয়ে অভিমত কী?
মাহফুজ সিদ্দিকী: মুক্তিযুদ্ধে দেশের ৯৯ ভাগ মানুষ যুদ্ধ করেছিল। এই রকম মুক্তিযুদ্ধ আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ তখন মানুষের মানসিকতা ছিল ইতিবাচক। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মানসিকতা বদলে গেছে, নৈতিকতা হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে- মূল্যবোধ ও মানবিকতা। এখন সংকট হলো মানসিকতার। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আধুনিক তো দূরে, ভালো যন্ত্রপাতিও ছিল না, কিন্তু ছবি হয়েছে ভালো। যেমন, জীবন থেকে নেয়া, যে নদী মরুপথে, কাঁচের দেয়াল– এই ছবিগুলো মানুষের হৃদয়ে দাগ কেটেছে। কারণ ছবির কাহিনী লেখা থেকে শুরু করে নির্মাণ পর্যন্ত যে আন্তরিকতা ছিল এখন আর তা নেই। পরস্পরের মধ্যে অন্তরের বন্ধন থাকতে হবে তা তো নেই। অনুশীলন নেই, রিহার্সেল নেই। যন্ত্রনির্ভর হয়ে গেছে সব। কে কাকে বসিয়ে দেবে সেই চিন্তা। নায়ক-নায়িকা, কলাকুশলী সবার মধ্যে সম্মান-শ্রদ্ধার অভাব, তাই ভালো পরিবেশও তৈরি হয় না, এসব না হলে ভালো ছবি আশা করা কী ঠিক! আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, তা হলো ভারতের চ্যানেলগুলোর অবাধ প্রদর্শন। এটিও আমাদের চলচ্চিত্র মাধ্যমের অন্তরায়।

নিরীক্ষা: এজন্য কী করা উচিত বলে মনে করেন।
মাহফুজ সিদ্দিকী: এর থেকে উত্তরণে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা খুব জরুরি।

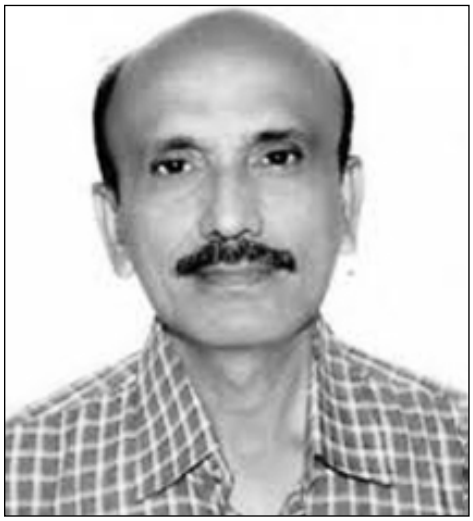

অনুপম হায়াৎ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু জানতে, শুনতে বা বলতে চাইলে প্রথম যাঁর কথা বলতে হয় বা যার নামটি চলে আসে তিনি হলেন অনুপম হায়াৎ।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর অনুপম হায়াৎ যেন একে অপরের পরিপূরক। যেখানে চলচ্চিত্র নিয়ে কথা, সেখানেই অনুপম হায়াৎ যেন অবধারিত। শুধু চলচ্চিত্র নয়, ঢাকা শহর এবং কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টি নিয়েও তিনি চর্চা ও গবেষণা করে চলেছেন নিরন্তর। উদ্ধার করে চলেছেন চলচ্চিত্র এবং নজরুল সংক্রান্ত অনেক অজানা তথ্য ও নিদর্শন। একজন সরকারি চাকরিজীবীর ভালোবেসে চলচ্চিত্র নিয়ে লেখা লিখিই যে তাকে এমন নাম-যশ-খ্যাতি দেবে যখন শুরু করেছিলেন, তখন কি বুঝেছিলেন। এসব জানতেই তাঁর মুখোমুখি এই প্রতিবেদক।

নিরীক্ষা: কেমন আছেন?
অনুপম হায়াৎ : মাত্র কদিন আগে রিং পরানো হয়েছে হার্টে। তাই একটু নিয়ম করে চলতে-ফিরতে হয়। এছাড়া সব মিলিয়ে আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি।

নিরীক্ষা: চলচ্চিত্র নিয়ে লেখালেখিতে এলেন কেন?
অনুপম হায়াৎ: প্রথমেই বলি, সাংবাদিকতা কিন্তু আমার পেশা ছিল না। আমি ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান ভূমি রাজস্ব বোর্ডে চাকরি শুরু করি। ২০০৭ সালে উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী হিসেবে অবসরে যাই। লেখার অভ্যাস তো কিশোরবেলা থেকে। মনের আনন্দে লিখতাম। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ছাপা হতো। ভীষণ ভালো লাগত।

আর চলচ্চিত্র, সেটা তো ছিল আমাদের সময়কার একমাত্র বিনোদন। নায়ক-নায়িকা আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল। চলচ্চিত্রের প্রতি ভালোবাসা বলা চলে শিশুকাল থেকে। যখন স্কুলে পড়ি, তখন নারায়ণগঞ্জ থেকে সিনেমা দেখতে আসতাম দল বেঁধে। সেই সময়ের বাংলা ছবি দেখে মুগ্ধ হতাম আর মনের অজান্তেই লেখতাম। সেই কিশোর বয়সের চলচ্চিত্রপ্রেম পরিণত বয়সে সাংবাদিকতায় মোড় নিয়েছে।

১৯৭৩ সালের ২২ জুন চলচ্চিত্রবিষয়ক একটি চিঠি পাঠাই চিত্রালীতে। চিঠিটি ছাপা হলো। এই চিঠির আলোচনা-সমালোচনা চলচ্চিত্র নিয়ে লিখতে উৎসাহ দিল। আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত হলাম আর লেখা শুরু করলাম। সেই লেখা থেকেই বলা চলে সাংবাদিকতার শুরু। এরপর বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা ছাপতে থাকলে আমার উৎসাহ বাড়তে থাকে। আবার লেখা ছাপা হলে বাড়তি কিছু অর্থও আসে। তবে এসবের পেছনে একজনের নাম না নিলেই নয়, তিনি হলেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আলমগীর কবির। যার লেখা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল আমাকে।

নিরীক্ষা: এখানে-সেখানে লিখছিলেন, পুরোদস্তর সাংবাদিক হলেন কবে থেকে, মনে আছে?
অনুপম হায়াৎ: ১৯৭২ সাল থেকে সাপ্তাহিক চাবুক, সাপ্তাহিক দেশবাংলা ও দৈনিক স্বদেশে নিয়মিতভাবে লিখতে থাকি। এরপর সাপ্তাহিক মুক্তবাণীতে চলচ্চিত্র প্রবন্ধ লেখা শুরু করলাম। এ পত্রিকা, সে পত্রিকা করে ১৯৭৭ সালের ১ ডিসেম্বরে সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় নিজস্ব চলচ্চিত্র প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দেই। চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার পেছনে বিচিত্রা আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট বলা চলে। বিচিত্রা আমাকে একটা প্লাটফর্ম দিয়েছিল।

এখনো মনে আছে, '৭৮ সালের ২৩ জুন 'স্মৃতির মুখ হারানো : ঢাকার ছবির অকথিত অধ্যায়' শিরোনামে আমার একটা লেখা বের হয়, কাকতালীয়ভাবে এর আগের দিন সরকার ফিল্ম আর্কাইভের ঘোষণা দেয়। এই লেখা আর সরকারের ঘোষণা মিলে যাওয়ায় রাতারাতি আমার কদর বেড়ে গেল। চলচ্চিত্রের মতো এমন রঙিন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকতা করতে নিজেকে তৈরি করলাম।

নিরীক্ষা: অনেকেই চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করে আজ হতাশ অথচ আপনি এখনো প্রবল উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছেন, এর রহস্য কী?
অনুপম হায়াৎ: চলচ্চিত্রের মতো বিষয় নিয়ে কেন হতাশ হবে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও সৎ থাকলে কোনো কাজই হতাশ করবে না, যা এখন অনেকের মধ্যে দেখি না। সাংবাদিকতা করতে গেলে চোখের সংখ্যা বাড়াতে হয়। এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ধৈর্য কম। একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ে।

এখন যারা এ কাজের সঙ্গে জড়িত, তারা ইতিহাস জানতে চায় না। বড় ফাঁক এইটা। আমি ইতিহাসের আলোকে সাংবাদিকতা করেছি। যার জন্য আমার নিউজের নিউজ ভ্যালু ছিল, আছে। আর এখন চলচ্চিত্র ইতিহাসই আমার গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রহস্য আর কিছুই না, রহস্য কাজকে ভালোবাসা। আর সাংবাদিক হয়ে টিকে থাকতে হলে চর্চা করতে হবে। নেতিবাচক লেখা থেকে দূরে থাকতে হবে।

নিরীক্ষা: চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন কবে থেকে, কেন? গবেষণার ফল কি পেয়েছেন?
অনুপম হায়াৎ: আমার মনটা হলো অনুসন্ধানী। আমি যখন বেশ ভালোভাবেই জড়িয়ে গেছি চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায়, তখন খেয়াল করলাম, আমাদের চলচ্চিত্রের এত সমৃদ্ধ গৌরবের ইতিহাস আছে, যা আমরা জানি না। আর ইতিহাস না জানলে আমরা এগোবো কী করে। যেই ভাবা সেই শুরু। ১৯৭৮ সালে শুরু করলাম চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা। আর গবেষণার ফল হলো ১৯৮১ সালে চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রথম বই 'চলচ্চিত্রের খোলা জানালা' এবং ১৯৮৭ সালে 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস' প্রকাশিত হলো। এরই ধারাবাহিকতায় একে একে ২০টি চলচ্চিত্রবিষয়ক বই লিখেছি। এর মধ্যে 'চলচ্চিত্র বিদ্যা' বইটি এখন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। আর ফল

হিসাব করলে বলতে হয়, এখন প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র নিয়ে পড়ানো হয়। একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

নিরীক্ষা: 'বিনোদন সাংবাদিকতা মূলধারার সাংবাদিকতা নয়', আপনি কি এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত?

অনুপম হায়াৎ: একদমই না। অবশ্যই এটি মূলধারার সাংবাদিকতার একটি অংশ। একটি দেশের চলচ্চিত্র একটি সমাজের জন্য, একটি দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য বিরাট হাতিয়ার। সমাজ পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

মনে রাখতে হবে, চলচ্চিত্র অবশ্যই একটা বিনোদন মাধ্যম। তার আগে এটি একটি প্রযুক্তিগত ব্যয়বহুল মাধ্যম। এটি শুধুই বিনোদন মাধ্যম নয়, এটি শিল্প (Art), ইন্ডাস্ট্রি, ইতিহাস কিপার। জনশিক্ষায় চলচ্চিত্র মাধ্যম তথা সাংস্কৃতিক মাধ্যম একটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

নিরীক্ষা: বর্তমানে চলচ্চিত্র বা বিনোদন সাংবাদিকদের নিয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই।

অনুপম হায়াৎ: প্রথমেই বলি, সিনেমাকে পাঠ করতে হবে। তাহলে এ বিষয়ে লেখা যাবে। বর্তমানে চলচ্চিত্র নিয়ে খবর খুব কম। সরকার চলচ্চিত্র বানানোর জন্য বই লেখার জন্য নানাভাবে যে পৃষ্ঠপোষকতা করছে এ খবরগুলো অনেকে দেয় না, অনেকে আবার দিলেও ছোট করে দেয়। ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কোনো খবর ছাপা হয় না। ফলাও প্রতিবেদন হচ্ছে না বললেই চলে। এককথায় চলচ্চিত্রচর্চা হচ্ছে না।

নিরীক্ষা: সাংবাদিকতা করতে গিয়ে আপনার ভালো-মন্দ কোনো স্মৃতি যদি বলতেন...

অনুপম হায়াৎ: সত্যি কথা বলতে কী খারাপ স্মৃতি নেই বললেই চলে। সবটাই ভালো। এই মুহূর্তে একটা ঘটনা মনে পড়ছে– ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করতেন গুই, তাঁকে নিয়ে লেখার কারণে তিনি আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন।

নিরীক্ষা: সাংবাদিকদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ...

অনুপম হায়াৎ: দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করে যাওয়া, নেতিবাচক কিছু না বলে ইতিবাচক খবর মানুষকে বেশি উজ্জীবিত করে, সেদিকে খেয়াল রাখা। সাধারণ পাঠকদের বিবেচনায় রাখা। সময়কে গুরুত্ব দেয়া, এসব মেনে চললে কোনো কাজ কঠিন হবে না। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে অনুশীলন করতে হবে, পড়তে হবে।

নিরীক্ষা: সাংবাদিকতা, গবেষণা, শিক্ষকতা ছাড়াও আপনি বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন। কাজ করছেন।

অনুপম হায়াৎ: পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়েছি। কাজ করছি। এর মধ্যে ১৯৯৪ সালে আমি প্রতিষ্ঠা করি চলচ্চিত্র গবেষণা শিক্ষা ও গবেষণামূলক একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের গবেষণা ফেলো হিসেবে গবেষণা করেছি মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নিয়ে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি দীর্ঘদিন। ফিল্ম আর্কাইভের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সক্রিয় আছি এর অগ্রগতির সব কাজে।

নিরীক্ষা: এখনকার কাজ নিয়ে যদি বলেন।

অনুপম হায়াৎ: সাংবাদিক লেখকদের তো অবসর নেই। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে গবেষণার কাজ করছি। চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষকতা করছি গ্রিন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে।

নিরীক্ষা: আপনার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কতটি?

অনুপম হায়াৎ: ৪২টি বই বেরিয়েছে, এর মধ্যে ২০টিই চলচ্চিত্রবিষয়ক।

নিরীক্ষা: শুনেছি আপনার পুরস্কারের তালিকাটাও বেশ বড়।

অনুপম হায়াৎ: না তেমন বড়ো না। পুরস্কার মাথায় রেখে তো কাজ করি না। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে গবেষক হিসেবে বাচসাস পুরস্কারের কথা, নজরুল পদক, ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার, নজরুল একাডেমির চুরুলিয়া পুরস্কার, আরো বেশ কিছু সম্মাননা পেয়েছি।

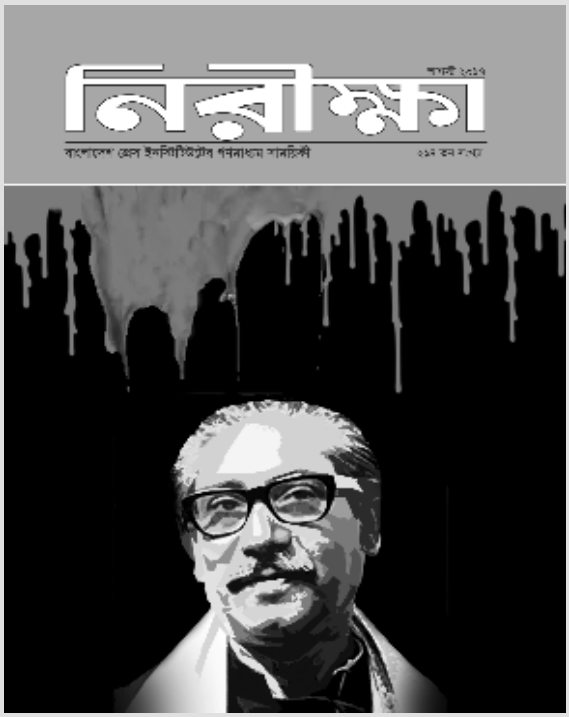

গণমাধ্যম বিষয়ক আপনার লেখাটি নিরীক্ষার পাতায় মুদ্রণ করতে চাই। এর জন্য উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে। লেখাটি নিম্নঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

গণমাধ্যম সংবাদ

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন

রাষ্ট্রপতির বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা নিশ্চিত করা এবং সাংবাদিকতা পেশায় বাস্তবতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্যরা ১৬ অক্টোবর বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি তরুণ গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, তরুণরা দেশের শক্তি। তাদের আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। তরুণরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করলে দেশ আরও দ্রুত এগিয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি সমিতির সদস্যদের প্রশংসা করেন।

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ফরহাদ উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক ফররুখ মাহমুদ, সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য চ্যানেল আই অনলাইনের ইব্রাহিম সুজন, ইন্ডিপেনডেন্টের আনিসুর রহমান, ঢাকা ট্রিবিউনের আরিফ আহমেদ, বণিক বার্তার সাইফ সুজন, যুগান্তরের মাহমুদুল হাসান নয়ন, দৈনিক করতোয়ার মোহতাসিম বিল্লাহ ও আলোকিত বাংলাদেশের ইরফান এইচ সায়েম প্রতিনিধিদলের সাথে ছিলেন। *(সূত্র: ১৭ অক্টোবর ২০১৭, সমকাল)*

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে ডিআরইউ নেতাদের শ্রদ্ধা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নেতারা। ২৩ ডিসেম্বর ডিআরইউ সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শুকুর আলী শুভর নেতৃত্বে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় ডিআরইউ নেতারা বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ, দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করেন। পরে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন ডিআরইউ সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শুকুর আলী শুভ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম হাসিব, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল হক ভুঁইয়া, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক মো. মহসিন হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক আরাফাত দাড়িয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজান চৌধুরী, কল্যাণ সম্পাদক কাওসার আজম এবং কার্যনির্বাহী সদস্য আবদুল হাই তুহিন, কামাল মোশারেফ ও ডিআরইউ সদস্য জিয়াদুর রহমান জিহাদ। *(সূত্র: ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭, ইত্তেফাক)*

ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার প্রদান

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার পথিকৃৎ ও প্রথম চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা 'সিনেমা'র সম্পাদক এবং বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'প্রেসিডেন্ট'-এর পরিচালক ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'ফজলুল হক স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। এ বছর এ পুরস্কার পেয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালনায় আবদুল লতিফ বাচ্চু এবং চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় নরেশ ভূঁইয়া।

রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি নাট্যব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যজন মামুনুর রশীদ। কেকা ফেরদৌসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ, মোরশেদুল ইসলাম, আলী ইমাম, আজিজুর রহমান, নুরুল আলম বাবু, আল মনসুর, আবু সায়ীদ, কণা রেজা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ফজলুল হকের জীবন ও কর্ম নিয়ে শহিদুল আলম সাচ্চু নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'সম্মুখযাত্রী' প্রদর্শন করা হয়। (সূত্র: ২৭ অক্টোবর ২০১৭, কালেরকণ্ঠ)

পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিককে সম্মাননা

বিজয় দিবসের প্রাক্কালে পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিককে সম্মাননা দিয়েছে পাক্ষিক প্রতিপক্ষ সম্মাননাপ্রাপ্ত পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক হলেন- কামাল লোহানী, হারুন হাবীব, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, কার্ত্তিক চ্যাটার্জি ও তরুণ তপন চক্রবর্তী। পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর উপলক্ষ্যে ১৩ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় তাদের সম্মাননা দেওয়া হয়।

'মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব ওমর ফারুক, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব পীরজাদা শহীদুল হারুন প্রমুখ। (সূত্র: ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭, সমকাল)

পাঁচ সাংবাদিক পেলেন ক্র্যাবের পুরস্কার

নারী ও শিশু নির্যাতনবিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) বর্ষসেরা প্রতিবেদনের পুরস্কার পেয়েছেন সমকালের স্টাফ রিপোর্টার বকুল আহমেদ। 'অনৈতিক সম্পর্কে মূল্য দিচ্ছে শিশুরা' শিরোনামে ১৮ নভেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদনের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। ২৯ ডিসেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ক্র্যাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় বকুলসহ মনোনীত পাঁচজনের নাম ঘোষণা করা হয়। অপর চারজনের মধ্যে কালের কণ্ঠের এস এম আজাদ মাদকবিষয়ক, ডেইলি স্টারের রাফিউল ইসলাম মানবাধিকারবিষয়ক, একাত্তর টিভির পারভেজ রেজা দুর্নীতিবিষয়ক এবং মাছরাঙা টিভির আবু জায়েদ মো. সেলিম অপরাধবিষয়ক টিভি রিপোর্টিং শাখায় সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। *(সূত্র: ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭, সমকাল)*

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

ডিআরইউ পুরস্কার পেলেন ২৯ সাংবাদিক

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের ২৯ সাংবাদিক। ২৬ নভেম্বর ডিআরইউয়ের স্বাধীনতা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

প্রিন্ট, টিভি, অনলাইন ও রেডিও– এই চার বিভাগে এবার ২৭টি ক্যাটাগরিতে ২৯ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দিয়েছে ডিআরইউ। এর মধ্যে দুটি ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে চারজন সাংবাদিক পুরস্কার পেয়েছেন।

বিজয়ীদের সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট ৫০ হাজার টাকা এবং যৌথভাবে নির্বাচিতদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআরইউ সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, সাধারণ সম্পাদক মুরসালিন নোমানী, জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ডিআরইউয়ের সাবেক সভাপতি শাহজাহান সরদার, ডিআরইউয়ের অর্থ সম্পাদক মানিক মুনতাসির প্রমুখ।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যারা পুরস্কার পেলেন– সংসদ ও নির্বাচন কমিশন ক্যাটাগরিতে কালের কণ্ঠের কাজী হাফিজ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ডেইলি স্টারের মাকসুদুল আলম জাকির, অবজেকটিভ ইকোনমিকে ঢাকা ট্রিবিউনের ইব্রাহিম হোসেন, নগরীর সমস্যা ও সম্ভাবনায় ডেইলি স্টারের হেলি-মুল আলম বিপ্লব, অপরাধ ও আইনশৃঙ্খলায় প্রথম আলোর রোজিনা ইসলাম, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের আজিজুর রহমান রিপন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে যৌথভাবে ডেইলি স্টারের শাখাওয়াত হোসেন লিটন ও ইনাম আহমেদ, শিক্ষায় নয়াদিগন্তের মেহেদি হাসান, ক্রীড়ায় প্রথম আলোর মাসুদ আলম, স্বাস্থ্য খাতে ডেইলি স্টারের পরিমল পালমা, রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় সমকালের আবু সালেহ রনি, কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনায় জনকণ্ঠের কাওসার রহমান, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে মানবকণ্ঠের এম মাসুদ হোসেন, ব্যাংক ও পুঁজিবাজারে ভোরের কাগজের মনিরা শিল্পী, নারী ও শিশু ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে যুগান্তরের শিপন হাবিব এবং সমকালের সাজিদা ইসলাম পারুল। এছাড়া টেলিভিশন বিভাগে অর্থনীতি ক্যাটাগরিতে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ফারুক আহমেদ মেহেদি, নগরীর সমস্যা ও সম্ভাবনায় মাছরাঙা টেলিভিশনের বদরুদ্দোজা বাবু, অপরাধ ও আইনশৃঙ্খলায় ৭১ টেলিভিশনের পারভেজ নাদির রেজা, তথ্য ও যোগাযোগে এনটিভির এম এম ইসলাম মওদুদ, ক্রীড়ায় এসএ টিভির শফিকুল ইসলাম শিপলু, সুশাসন ও দুর্নীতিতে ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের মাহবুবুল আলম লাবলু, নারী, শিশু ও মানবাধিকারে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের মাসুদুর রহমান এবং স্বাস্থ্যে এনটিভির হাসান জাবেদ পুরস্কার পেয়েছেন। অনলাইন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন নারী, শিশু ও মানবাধিকার ক্যাটাগরিতে বাংলানিউজ-টোয়েন্টিফোরের সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে জাগো নিউজের সাঈদ শিপন এবং উন্নয়ন ও সম্ভাবনায় রাইজিং বিডির রফিকুল ইসলাম মন্টু। আর রেডিও রিপোর্টিং ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন বিবিসির মো. আহরার হোসেন। *(সূত্র: ২৭ নভেম্বর ২০১৭, কালের কণ্ঠ)*

ক্র্যাব নির্বাচন
সভাপতি আবু সালেহ, সম্পাদক সরোয়ার আলম

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) কার্যনির্বাহী কমিটি-২০১৮ নির্বাচনে দৈনিক নয়াদিগন্ত-এর আবু সালেহ আকন সভাপতি ও কালের কণ্ঠ-এর সরোয়ার আলম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিতদের মধ্যে আছেন মিজানুর রহমান (সহ-সভাপতি), এস এম নূরুজ্জামান (যুগ্ম-সম্পাদক), খালিদ আহমেদ (প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক)। এছাড়া আজিজুল হাকিম (অর্থ সম্পাদক), এম এম বাদশাহ (সাংগঠনিক সম্পাদক), শাহরিয়ার আরিফ (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক), আসলাম রহমান (ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক) এবং রুদ্র রাসেল (দপ্তর সম্পাদক) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদে নির্বাচিতরা হলেন– আলাউদ্দিন আরিফ, খন্দকার হানিফ রাজা ও মোহাম্মদ জাকারিয়া। *(সূত্র: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭, প্রথম আলো)*

জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

নবীন-প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২০ অক্টোবর সন্ধ্যায় কেক কাটার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহম্মদ শফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ফরিদা

কেক কেটে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ক্লাব সভাপতি শফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন

ইয়াসমিন, সাবেক সভাপতি হাসান শাহরিয়ার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্বপন সাহা, একুশে টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মনজুরুল আহসান বুলবুল, যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম প্রমুখ। নৈশভোজ ও র‍্যাফেল ড্রর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। *(সূত্র: ২১ অক্টোবর ২০১৭, সমকাল)*

৪৯ জন গণমাধ্যমকর্মী পেলেন মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড

শিশুবিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য ইউনিসেফের 'মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০১৭' পেয়েছেন ৪৯ জন গণমাধ্যমকর্মী। ১৪ ডিসেম্বর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুসহ অন্য অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর এদুয়ার্দ বেগবেদার, ইউনিসেফ বাংলাদেশের শুভেচ্ছাদূত অভিনেত্রী আরিফা হাসান মৌসুমী ও জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী রাজাকারদের 'মানুষরূপী দানব' আখ্যায়িত করে বলেন, দেশের শত্রু রাজাকারদের সবসময় ঘৃণা করতে হয়। তাদের সমাজ থেকে দূরে রাখতে হয়। 'মীনা' কার্টুনের মীনার চেয়ে বেশি বয়সি কিশোরীর সমস্যাগুলো নিয়ে একটি কার্টুন তৈরি করা হবে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী।

'শেখানো হচ্ছে না ভিন্ন ধর্মের বন্ধুর সঙ্গে আচরণ' শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনের জন্য অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সিদের প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার প্রতিবেদন বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন ঢাকা পোস্ট বিডি ডটকমের মো. রাজন সিকদার। এ বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন বিডিনিউজের শিশু সাংবাদিকতার ওয়েবসাইট 'হ্যালো'র সাদিক ইভান। আর তৃতীয় পুরস্কার উঠেছে বাংলাদেশ বাণীর রাবেয়া বর্ষী অনিতার হাতে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের যথাক্রমে ৫০ হাজার, ২৫ হাজার ও ১৫ হাজার টাকা এবং ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়।

অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সিদের প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার সৃজনশীল বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে মাসিক ফুলকড়ি পত্রিকার মীম নওশীন নাওয়াল খান, মাসিক মোহনা পত্রিকার মিশকাত রাসেল ও বাংলানিউজের আনিকা তাবাসসুম।

এবার মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে রেডিও'র সৃজনশীল বিভাগে (অনূর্ধ্ব ১৮) প্রথম ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন রেডিও পল্লীকণ্ঠের গোলাম মোস্তফা তারেক ও হামীম রহমান খান। আর দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন রেডিও ঝিনুকের আল মামুন রাজু।

রেডিও'র সংবাদ প্রতিবেদন বিভাগে (অনূর্ধ্ব ১৮) রেডিও ঝিনুকের মো. সাজাদুল ইসলাম প্রথম এবং রেডিও সারাবেলার সেঁজুতি হাসান অদিতি ও ইসমে আজম প্রসন্ন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। টেলিভিশনে সৃজনশীল বিভাগে (অনূর্ধ্ব ১৮) চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির সৈয়দা আবরার তোহা ধারা প্রথম, ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০১৭-এর মো. তৌফিকুল ইসলাম দ্বিতীয় এবং ফিল্ম ফেস্ট 'পরিবর্তন চাই'র রাজিয়া সুলতানা ও শরিফুল ইসলাম তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

টেলিভিশন সংবাদ প্রতিবেদন বিভাগের (অনূর্ধ্ব ১৮) তিনটি পুরস্কারই পেয়েছেন এটিএন বাংলার সাংবাদিকরা। এ বিভাগে নজিবুর রহমান ছোটন ও মো. সেলিম মিঞা প্রথম, এহতেশামুল হক লিখন ও আবদুর রহিম দ্বিতীয় এবং তানজিলা আক্তার মীম ও মো. শামীম তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। মোট ১৩টি বিভাগে ৪৯ জন পুরস্কার পেয়েছেন। *(সূত্র: ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৭, সমকাল)*

অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার প্রদান

বিজয়ের মাসে এবার 'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪২৪' তুলে দেওয়া হলো বিশিষ্ট লেখক, নারীনেত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা বেগম মুশতারী শফীকে। ২ ডিসেম্বর অনন্যা সম্পাদক তাসমিমা হোসেন এক অনুষ্ঠানে বেগম মুশতারী শফীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। এ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের টিআইসি মিলনায়তনে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবি-সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, মুশতারী শফীর মতো একজন যথার্থ লেখক, মুক্তিযোদ্ধা এবং নারীনেত্রীকে পুরস্কার প্রদানের জন্য চট্টগ্রামে এসে অনন্যার এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। অনন্যা সম্পাদক তাসনিমা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক মালেকা বেগম। *(সূত্র: ৪ ডিসেম্বর ২০১৭, ইত্তেফাক)*

পোলট্রি মিডিয়া পুরস্কার পেলেন ৯ সাংবাদিক

'পোলট্রি মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড' পেলেন দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন, অনলাইন ও দৈনিক পত্রিকার নয়জন সাংবাদিক। ২৫ ডিসেম্বর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি) দ্বিতীয়বারের মতো এ পুরস্কার দেয়। পাঁচটি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

'দৈনিক সংবাদপত্র' ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার রহিম শেখ। দ্বিতীয় হন কালের কণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার আবুল কাশেম এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দি ইন্ডিপেনডেন্টের বিজনেস রিপোর্টার শরীফ আহমেদ। ঢাকার বাইরে থেকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ক্যাটাগরিতে একমাত্র পুরস্কার লাভ করেন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশের প্রধান প্রতিবেদক ভূঁইয়া নজরুল।

'টিভি ও রেডিও' ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। দ্বিতীয় হয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের স্টাফ করেসপনডেন্ট মাসুম খান এবং তৃতীয় হয়েছেন এটিএন নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার গোলাম কাদির রবু। 'বার্তা সংস্থা/অনলাইন' ক্যাটাগরিতে একমাত্র পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) স্টাফ রিপোর্টার মহিউদ্দিন কাদের। 'অনলাইন' ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন এগ্রিলাইফের এস এম মুকুল।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীরা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন যথাক্রমে ৫০ হাজার, ৪০ হাজার এবং ৩০ হাজার টাকা।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম, একুশে টেলিভিশনের এডিটর ইন চিফ মনজুরুল আহসান বুলবুল, দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমান এবং যমুনা টেলিভিশনের বিজনেস এডিটর সাজ্জাদ আলম খান তপু। (সূত্র: ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭, সমকাল)

ডিআরইউর সভাপতি সাইফুল ও সাধারণ সম্পাদক শুভ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বৈশাখী টেলিভিশনের সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাসসের সৈয়দ শুকুর আলী শুভ। ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার বিএফইউজের সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল। নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন দৈনিক সমকাল সম্পাদক ও পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার। নির্বাচনে যুগ্ম-সম্পাদক পদে দৈনিক নয়াদিগন্তের মো. মঈন উদ্দিন খান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিডিনিউজ২৪ নূরুল ইসলাম হাসিব, দফতর সম্পাদক পদে মো. জেহাদ হোসেন চৌধুরী, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক পদে মো. মহসিন হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে আরাফাত দাড়িয়া, আপ্যায়ন সম্পাদক পদে কামাল উদ্দিন সুমন ও কল্যাণ সম্পাদক পদে কাওসার আজম নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যনির্বাহী সদস্য পদে আবদুল্লাহ আল কাফি, মাহমুদা ডলি, জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না, মো. জাফর ইকবাল, আবদুল হাই তুহিন, কামাল মোশারেফ ও এস এম এ কামাল নির্বাচিত হয়েছেন। (সূত্র: ১ ডিসেম্বর ২০১৭, ইত্তেফাক)

এনবিআরের পুরস্কার পেলেন ১৩ সাংবাদিক

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেরা রিপোর্টার পুরস্কার পেয়েছেন সমকালের বিশেষ

প্রতিনিধি আবু কাওসার প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও নারী– এ চার ক্যাটাগরিতে মোট ১৩ জন এ পুরস্কার পান। ৮ নভেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ভবনে এনবিআর আয়োজিত সেরা করদাতা ও কর বাহাদুর পরিবার সম্মাননা অনুষ্ঠানে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আবদুর রাজ্জাক পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন।

পুরস্কার পাওয়া অন্য সাংবাদিকরা হলেন প্রিন্ট মিডিয়ায় দৈনিক মানবকণ্ঠের বিজনেস এডিটর সৈয়দ শাহনেওয়াজ করিম, ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ-এর সিনিয়র রিপোর্টার জসীম উদ্দিন ও বণিক বার্তার স্টাফ রিপোর্টার আব্বাস উদ্দিন নয়ন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা হলেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বিজনেস এডিটর ফারুক মেহেদী, চ্যানেল আইয়ের সিনিয়র রিপোর্টার রিজভী নেওয়াজ ও সময় টিভির সিনিয়র রিপোর্টার সাজেদুল ইসলাম। নারী ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আকতার মালা, দৈনিক কালের কণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার ফারজানা রশিদ লাবনী ও ৭১ টেলিভিশনের শামীমা আক্তার দোলা। অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা হলেন অর্থসূচক ডটকমের সিনিয়র রিপোর্টার রহমত রহমান, রাইজিংবিডি ডটকমের সিনিয়র রিপোর্টার এমএ রহমান (মাসুম) ও পরিবর্তন ডটকমের সিনিয়র রিপোর্টার ফরিদ আহমেদ। *(সূত্র: ৯ নভেম্বর ২০১৭, সমকাল)*

বেগম রোকেয়ার সঙ্গে ভারতের প্রথম নারী আলোকচিত্র সাংবাদিককে শ্রদ্ধা জানাল গুগল

ডুডুলের মাধ্যমে গুগল ৯ ডিসেম্বর দুই ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। দুজনই নারী। দুজনই ভারতীয় উপমহাদেশের। একজন বাংলাদেশের বেগম রোকেয়া, আরেকজন ভারতের প্রথম নারী আলোকচিত্রশিল্পী হোমাই বিয়ারাওয়ালা।

১৯১৩ সালে এক পার্সি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হোমাই। বেড়ে ওঠেন মুম্বাই শহরে। ১৯৪২ সালে দিল্লিতে চলে আসেন। সেখানেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ।

হোমাই যখন তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এ রকম একটি সময়ে ক্যারিয়ার শুরু করায় হোমাইয়ের ছবির বিষয়বস্তুও হয়ে ওঠে স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোমাই তাঁর ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির জন্য নেতাদের পরিকল্পনার ছবি, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট লালদুর্গে প্রথম ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের ছবি, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিদায় অনুষ্ঠান, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানের মতো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি ক্যামেরাবন্দি করেছেন হোমাই।

চার দশকের ক্যারিয়ারের পর ১৯৭০ সালের শুরুতে পেশাজীবন থেকে অবসর নেন হোমাই।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পুরস্কার পেয়েছেন গণমাধ্যমের নয়জন কর্মী। ধানমন্ডিতে মাইডাস সেন্টারের মেঘমালা কনফারেন্স কক্ষে গণমাধ্যমকর্মীদের 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার-২০১৬' প্রদান করা হয়

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'পদ্মভূষণ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয় এই নারী সাংবাদিককে। ২০১২ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতের প্রথম নারী আলোকচিত্র সাংবাদিক হোমাই বিয়ারাওয়ালা। (সূত্র: ১০ ডিসেম্বর ২০১৭, কালের কণ্ঠ)

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় টিআইবি পুরস্কার পেলেন ৯ জন

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পুরস্কার পেয়েছেন ৯ সাংবাদিক। ৮ ডিসেম্বর টিআইবি'র কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার-২০১৭' দেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন প্রিন্ট মিডিয়ায় স্থানীয় ক্যাটাগরিতে দৈনিক পূর্বাঞ্চলের খুলনার স্টাফ রিপোর্টার এইচ এম আলাউদ্দিন, জাতীয় ক্যাটাগরিতে প্রথম আলো স্টাফ রিপোর্টার (সাভার) অরূপ রায়। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে মাছরাঙা টেলিভিশনের সাংবাদিক বদরুদ্দোজা বাবু ও ক্যামেরা পারসন হিসেবে একই টেলিভিশনের সিনিয়র ক্যামেরা পারসন মেহেদী হাসান সোহাগ পুরস্কার পেয়েছেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার মো. সবুজ মাহমুদ, ক্যামেরা পারসন রাকিবুল হাসান ও গোলাম কিবরিয়া, ক্যামেরা পারসন মহসীন মুকুল, কাজী মোহাম্মাদ ইসমাইল, গোলাম কিবরিয়া। একই ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার মো. জাহিদ মামর ইসলাম সাদ ও যমুনা টেলিভিশনের ক্যামেরা পারসন তানভীর মিজান। *(সূত্র: ৯ ডিসেম্বর ২০১৭, ইত্তেফাক)*

তিন আলোকচিত্র পেল আন্তর্জাতিক পুরস্কার

পৃথক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের তিনটি আলোকচিত্র পুরস্কার পেয়েছে। এর মধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনে মৌয়ালদের মধু সংগ্রহের ছবিটি 'কনসালটেটিভ গ্রুপ টু অ্যাসিস্ট দ্য পুওর' (সিজিএপি) বার্ষিক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতে নিয়েছে। ছবিটি তুলেছেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়া বিশ্বে ছবি তোলার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা উইকি লাভস মনুমেন্টসের (ডব্লিউএলএম) চূড়ান্ত তালিকায় তৃতীয় ও সপ্তম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দুটি ছবি। এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া। ১৪ ডিসেম্বর দুটি প্রতিযোগিতারই চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়।

তৃতীয় হয় আজিম খান রনির তোলা বায়তুল মোকাররমের একটি ছবি। সপ্তম স্থান অর্জন করে জুবায়ের বিন ইকবালের তোলা জাতীয় মসজিদের অপর একটি ছবি। পুরস্কার হিসেবে আজিম ১২০০ ইউরো সমমূল্যের ক্যামেরা-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি আর জুবায়ের বিন ইকবাল ৪০০ ইউরো সমমূল্যের যন্ত্রাদি। (সূত্র: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭, সমকাল)

৬৫ বছরে ইত্তেফাক

৬৫ বছরে পা দিল দৈনিক ইত্তেফাক। এ এক দীর্ঘ পথচলা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দৈনিক ইত্তেফাক বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে চলেছে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া যে আপসহীন যাত্রা শুরু করেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে তা আজও এগিয়ে চলেছে।

১৯৪৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কলকাতা প্রত্যাগত তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে তিনি এই পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ইত্তেফাক দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। (সূত্র: ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭, ইত্তেফাক)

২০১৭ সালে বিশ্বে ২৬২ সাংবাদিক আটক

চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রেকর্ডসংখ্যক সাংবাদিক জেলে আটক রয়েছেন। তাদের সংখ্যা ২৬২। গত ১৩ ডিসেম্বর কমিটি টু প্রটেক্ট

জার্নালিস্ট বা সিপিজে তাদের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। বিভিন্ন দেশের সরকারের কর্তৃত্বপরায়ণতার জেরেই এমন ঘটেছে বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক এই সংস্থাটি।

আটক সাংবাদিকের সংখ্যার দিক দিয়ে শীর্ষে তুরস্ক। দেশটিতে ৭৩ সাংবাদিক কারাবন্দি। ৪১ সাংবাদিককে জেলে আটকে রেখে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন। আর তৃতীয় অবস্থানে থাকা মিসরে জেলে আছেন ২০ জন।

সিপিজে জানায়, জেলে থাকা সাংবাদিকদের ৭৫ শতাংশই আটক আছেন রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায়। আর সন্ত্রাসের বানোয়াট মামলায় আটকে আছেন অন্যরা। (সূত্র: ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭, সমকাল)

২০১৭ সালে দায়িত্ব পালনকালে নিহত ৬৫ সংবাদকর্মী

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২০১৭ সালে দায়িত্ব পালনকালে অন্তত ৬৫ সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন। ১৯ ডিসেম্বর সংবাদমাধমের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

সংগঠনটির প্রতিবেদন অনুসারে, নিহত সংবাদকর্মীদের মধ্যে ৫০ জন ছিলেন পেশাদার সাংবাদিক। বাকিদের মধ্যে সাতজন নাগরিক সাংবাদিক এবং আটজন ছিলেন সংবাদকর্মী। ২০১৭ সালে সংবাদকর্মীদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর দেশ ছিল সিরিয়া, মেক্সিকো, আফগানিস্তান, ইরাক ও ফিলিপাইন। (সূত্র: ২০ ডিসেম্বর ২০১৭, সমকাল)

মাল্টায় পানামা পেপারস দুর্নীতি ফাঁসকারী নারী সাংবাদিক নিহত

ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র মাল্টার পানামা পেপারস দুর্নীতি ফাঁসকারী সাংবাদিক ডেফনে কারোয়ানা গালিজিয়া খুন হয়েছেন। গত ১৭ই অক্টোবর নিজ বাড়ির অদূরে গাড়ী বোমা হামলায় নিহত হন এ সাহসী সাংবাদিক। তিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রী জোসেফ মোসকাতের স্ত্রীর দুর্নীতি ফাঁস করেছিলেন। কারোয়ানা নিহত হওয়ার খবরে নিন্দা জানিয়ে মাল্টার প্রধানমন্ত্রী জোসেফ বলেছেন, কাপুরুষোচিত আক্রমণে তার মৃত্যু হয়েছে। (সূত্র: ১৮ অক্টোবর ২০১৭, সমকাল)

শোক সংবাদ

তসলিমউদ্দিন চৌধুরী

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণের সম্পাদক তসলিমউদ্দিন চৌধুরী (৬৪) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ১৫ নভেম্বর রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন তসলিমউদ্দিন চৌধুরী। ১৯৮৯ সালের ১

ফেব্রুয়ারি দৈনিক পূর্বকোণের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার নেন। ২০০৭ সালের এপ্রিল থেকে পূর্বকোণ গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং পরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের পরিচালক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নগর উন্নয়ন কমিটি সদস্য, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বারের সাবেক সহ-সভাপতি, বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেন স্থপতি তসলিমউদ্দিন চৌধুরী। শিক্ষা, সেবামূলক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি।

রায় ডোট্রিস

কাল্পনিক উপন্যাসের ভিত্তিতে নির্মিত বহুল জনপ্রিয় মার্কিন টিভি সিরিজ 'গেম অব থ্রোনস'-এর দুর্দান্ত অভিনেতা রায় ডোট্রিস ১৬ অক্টোবর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। ৯৪ বছর বয়সি এই অভিনেতা লন্ডনে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবদ্দশায় তিনি টনি অ্যাওয়ার্ড, ড্রামা ডেস্ক অ্যাওয়ার্ড ও ব্রিটিশ একাডেমি টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ডসহ আরও বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পুরস্কার অর্জন করেন।

পুলক সরকার

চট্টগ্রামের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পুলক সরকার (৪৮) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি দৈনিক নয়াবাংলাসহ বিভিন্ন সংবাদ সংস্থায় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে কাজ করছিলেন। নিজ গ্রাম বাঁশখালী

উপজেলার কালীপুর ইউনিয়নের গুনাগরি গ্রামে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মাসুদুল হক

বিশিষ্ট লেখক ও দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক সিনিয়র সাব-এডিটর মাসুদুল হক (৭৬) আর নেই। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৩০ নভেম্বর বিকালে রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

মাসুদুল হক সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৭৫ সালে সাপ্তাহিক পূর্বাণীর মাধ্যমে। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাব ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির স্থায়ী সদস্য।

আবুল হোসেন

রাজশাহীর প্রবীণ সাংবাদিক আবুল হোসেন মালেক (৭২) ২৯ অক্টোবর ঢাকার উত্তরায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। আবুল হোসেনের জন্ম নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার পাঁচবাড়ীয়া গ্রামে।

তিনি দৈনিক আজাদ, ইত্তেফাক ও জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক সোনার দেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় নাটোরের বড়াইগ্রাম থানার পাঁচবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। দ্বিতীয় জানাজা শেষে গৌরহাঙ্গা কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: আমাদের গণমাধ্যম' শীর্ষক আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুসহ অতিথিরা

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: আমাদের গণমাধ্যম' শীর্ষক আলোচনাসভা

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: আমাদের গণমাধ্যম' শীর্ষক আলোচনাসভা ২৮ ডিসেম্বর পিআইবি'র সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

আলোচনায় অংশ নেন দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনীরুজ্জামান, একাত্তর টিভি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল বাবু, আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান, প্রথম আলোর যুগ্ম-সম্পাদক সোহরাব হাসান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিআইবি'র প্রভাষক শুভ কর্মকার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু গণমাধ্যমকে উল্লেখ করে বলেন, নিরপেক্ষতার নামে মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকারকে এক পাল্লায় মাপা যাবে না। গণমাধ্যমকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে– তারা নিরপেক্ষ হবে নাকি বস্তুনিষ্ঠ হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে জনগণের চেতনা। গণমাধ্যম যদি সত্যিকারের গণমানুষের জন্যই হয়, তবে জনগণের চেতনাকেই ধারণ করতে হবে। তিনি বলেন, গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনে সাংবাদিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি নেই। তবে দার্শনিক ঘাটতি আছে।

সভাপতির বক্তব্যে গোলাম সারওয়ার বলেন, গণমাধ্যমে করপোরেট বিনিয়োগ আর বিজ্ঞাপনের চাপ একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতা। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কামাল লোহানী বলেন, সাংবাদিকদের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিলে চলবে না, রাষ্ট্রকেও দায়িত্ব নিতে হবে। মুখে বললেই চেতনা ধারণ হয় না। তিনি পাকিস্তান আমলের তুলনায় এখন সাংবাদিক ইউনিয়নের দুর্বলতা ও বিভক্তির বিষয় উল্লেখ করে বলেন, কেন সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যার বিচারের আন্দোলন জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে মাছরাঙা টেলিভিশনের সামনে গিয়ে ঠেকেছে? কেন কোনো সাংবাদিক হত্যার বিচার হয় না?

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গণমাধ্যমের বহু কাজের মধ্যে অন্যতম হলো নতুন প্রজন্মের কাছে অতীতের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা। এ দেশের গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আরও কাজ করতে হবে।

অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশের জন্মের কারণে স্বভাবতই বাংলাদেশের গণমাধ্যমের হওয়ার কথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী, তা কি হয়েছে? আজও এ দেশে মুক্তিযুদ্ধ চেতনাবিরোধী প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র অনেকটাই চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।'

খন্দকার মুনীরুজ্জামান বলেন, 'গণমাধ্যমকে সরকারের বন্ধু নয়, জনগণের বন্ধু হতে হবে।'

সোহরাব হাসান বলেন, 'সরকারের প্রশাসন ও অন্যান্য যন্ত্রের চেয়ে গণমাধ্যম অনেক বেশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে। এ কাজে সরকারকে গণমাধ্যমের পাশে থাকতে হবে।'

মোজাম্মেল বাবু বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা থেকে রাষ্ট্র যদি নিজেই সরে যায়, গণমাধ্যম একা সেখানে কিছু করতে পারে না। বাজার অর্থনীতি সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে।'

নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, 'সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্যের মধ্যে গণমাধ্যম নানা সংবাদ ও অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেভাবে লালন করে তাতে হতাশার খুব বেশি কিছু নেই।'

স্বাগত বক্তব্যে পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর বলেন, 'গণমাধ্যমকে গণমানুষের কথা বলতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনে আরও নতুন নতুন উদ্যোগ নিতে হবে।'

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে পিআইবি'র প্রভাষক শুভ কর্মকার বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শহীদ হয়েছেন অনেক সাংবাদিক কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা করা সময়ের দাবি।

গণমাধ্যমে করপোরেট প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ, বিজ্ঞাপনের চাপসহ নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে এতে বলা হয়, গণমাধ্যমকে হতে হবে সমাজের ওয়াচডগ। এমনভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে হবে যেন মুক্তিযুদ্ধ চেতনাবিরোধীরা ইতিহাস বিকৃত করার সুযোগ না পায়। কিন্তু অধিকাংশ গণমাধ্যমেই দিবসভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রচার ও প্রকাশনা করে থাকে। আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাস পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে আরও নিয়মিত হতে হবে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের

পিআইবি আয়োজিত ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. মমতাজউদ্দিন আহমেদ

রাবি'তে কর্মরত সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক

জন্য তিন দিনব্যাপী (১১-১৩ই অক্টোবর,২০১৭) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১৩ই অক্টোবর শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাসস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রশিক্ষণে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র ৪০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

চাঁদপুরে সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত চাঁদপুরের বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১৮-২০ ডিসেম্বর ২০১৭) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ২০শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাসস-এর প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। প্রশিক্ষণ সমাপনে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবি'র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম। প্রশিক্ষণে চাঁদপুরের বিভিন্ন উপজেলায় গণমাধ্যমে কর্মরত ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের তিন দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ২১ অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে এই সমাপন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর আয়োজনে এই কর্মশালায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার্স ইউনিটির (রুরু) ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক বলেন, পৃথিবী সংবাদনির্ভর হয়ে যাচ্ছে। সংবাদ শুকনো, কঠিন আবার রসালোও হতে পারে।

খবরই দেশ চালাচ্ছে, রাষ্ট্র চালাচ্ছে। খবরের কাগজের দুটো দিক আছে। একটি দিক সমাজ, রাষ্ট্র তৈরি করতে পারে অন্য দিকটি ধ্বংস করতে পারে। অন্ধকারে থাকা ভালো কিন্তু বিষাক্ত আলোতে বসবাস করা ঠিক নয়।

হাসান আজিজুল হক বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ৩৪ কোটি হাত আছে। এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। বাংলাদেশের অনেক মানুষ কর্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও কাজ পাচ্ছে না। মানুষ সমান সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। কিন্তু অনেকেই কুসুমেই ঝরে যায়।

রাবি রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক হুসাইন মিঠুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক অধ্যাপক প্রভাষ কুমার কর্মকার, রাবি রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি কায়কোবাদ খান। সভাপতিত্ব করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে।

মির্জাগঞ্জে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৭-৯ই নভেম্বর) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ৯ই নভেম্বর প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবি'র পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) আনোয়ারা বেগম। প্রশিক্ষণে পটুয়াখালীর বিভিন্ন উপজেলার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ত্রিশালে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত ময়মনসিংহের ত্রিশালে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ২৪ নভেম্বর শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও একুশে টিভি'র সিইও মনজুরুল আহসান বুলবুল। পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ত্রিশালের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুজাফর রিপন। প্রশিক্ষণে ময়মনসিংহের ত্রিশালসহ পার্শ্ববর্তী উপজেলার ৪০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা না করলে কেউ মনে রাখবে না: পিআইবি মহাপরিচালক

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর বলেছেন, একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে এক মাস সময়ও লাগতে পারে। এটা সত্য, সে সুযোগ হয়তো আমরা দিই না। কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন না করলে সাংবাদিক হিসেবে মানুষ আপনাকে মনে রাখবে না। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন না করলে সাংবাদিক হিসেবে আপনার অপমৃত্যু হবে।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর

৬ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের জন্য পিআইবির অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সভাপতি কলিম সরওয়ারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শুকলাল দাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান আলী আর রাজী, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি রতন কান্তি দেবাশীষ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) যুগ্ম মহাসচিব তপন চক্রবর্তী, প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ প্রমুখ।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

পিআইবি আয়োজিত ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ১ নভেম্বর প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী। পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের নেতৃত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত। এ প্রশিক্ষণে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

শাবিতে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দিতে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের যৌথ সমন্বয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গত ২৬ নভেম্বর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র প্রদানের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুল আওয়াল বিশ্বাস, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবদুল্লাহ আল মনসুর। প্রশিক্ষণে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয়, স্থানীয় দৈনিক ও অনলাইনে কর্মরত সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

রংপুরে ফটো-সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে সনদপত্র বিতরণ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৩-৫ অক্টোবর) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গত ৫ অক্টোবর শেষ হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর

রংপুরে ফটো-সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

রংপুর জেলার ফটোসাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৬-২৮ নভেম্বর) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ হয়েছে। ২৮ নভেম্বর রংপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কাজী হাসান আহমেদ। বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩৫ জন ফটো-সাংবাদিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহীতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় রাজশাহীর বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১৭-১৯ অক্টোবর) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গত ১৯ অক্টোবর শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী-১ আসনের সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ, সভাপ্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।